মহম্মদ বিন তুঘলক

মহম্মদ বিন তুঘলক

শ্রীপারাবত

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

MAHAMMAD BIN TUGHLAK
A Bengali Histoical Novel
By Sreeparabat

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক ঃ
আরতি জানা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণগ্রন্থন ঃ
সুব্রতা ঘোষ
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক ঃ
স্বপনকুমার দে।
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ বিজন কর্মকার

পুত্রবধূ
শ্রীমতী কাবেরী গোস্বামী
কল্যাণীয়াসু —

লেখকের কয়েকটি উপন্যাস

মগধ যুগে যুগে (রাজগৃহ পর্ব)

মগধ যুগে যুগে (পাটলিপুত্র পর্ব)

আরাবল্লী থেকে আগ্রা

মমতাজ-দুহিতা জাঁহানারা

অযোধ্যার শেষ নবাব

মুর্শিদ কুলি খাঁ

রাজপুত নন্দিনী

চিতোরগড়

রাণাদিল

কিতাগড়

মিশর-সম্রাজ্ঞী হতসেপশুত

সিংহদ্বার

মেবার-বহ্নি পদ্মিনী

রাজমহিষী

রণস্থল মাড়োয়ার

বাহাদুর শাহ

নাদির শাহ

তুতানখামেনের রানী

রাজরাজেশ্বরী

রাজাবাদশা (ছোটদের)

রাত মোহানার রহস্য (কিশোর)

পঞ্চালিকা (সংগ্রহ)

ময়নামতী

মহাপ্রেম

তুমি কত ভাল, আবার কী নিষ্ঠুর!

কথাটা দৈববাণীর মত আজও ধ্বনিত হয় মাঝে মাঝে। সে জানে যতদিন বেঁচে থাকবে অমন হবে। কখনো কখনো সে যেন বাক্যটা আরও সংক্ষেপে অন্তরীক্ষ থেকে ভেসে আসতে শোনে-- নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর। এ কিন্তু নারী কণ্ঠ নয়, গম্ভীর। সেদিনের সেই ক্ষীণকণ্ঠী সুন্দরী বালিকার হৃদয়-মথিত কাতরোক্তি অদৃশ্য এই কণ্ঠস্বরে। আদৌ মর্মস্পর্শী শোনায় না। মনে হয় বিধাতা তাকে ধমক দিচ্ছেন, সাবধান করছেন।

লায়লার হাত ধরে জউনা নামে যে বালকটি খেয়ালের বশে পশ্চিমের টিলাটির দিকে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল, আজও অবিকৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি এবং বহু বছর পরেও দূরের আরাবল্লীর শাখার মত থাকবে। কিন্তু বালক জউনা বা ফকরুদ্দিন জউনার কত পরিবর্তন ক্রমাগত হয়ে চলেছে। পরে সে পিতার দেওয়া উপাধিতে হয়েছে উলাঘ খাঁ। তারও পরে মসনদে বসে কখনো ইচ্ছা হয়েছে সবাই তাকে ডাকুক আবুল মুজাহিদ বা জিল্লে-ই-হক বলে। তবে উপাধি হ'ল মহম্মদ-বিন-তুঘলক । আল্লাহ্ চিরকাল অদৃশ্য। কিন্তু লায়লা? আজ সে কোথায়? কোথায় হারিয়ে গিয়েছে? হয়ত বেঁচে আছে আজও, হয়ত নেই। কিন্তু সে বড় বেশি বেঁচে রয়েছে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মনের মধ্যে। তাকে কি জীবনের প্রথম নারী রূপে ধরা যায়? বোধহয় না। তার দেহ মনে তখনও নারীত্বের জোয়ার আসেনি। তবু নারীর উপাদানেই তো গঠিত ছিল সে। কোমল নম্র সংবেদনশীল। ওই বয়সেই আশ্চর্য রকমের রূপসী।

টিলার পাশে অসমতল প্রান্তরের ধারে ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে ছুটে ছুটে সে লায়লার জন্য অতি কষ্টে একটি সুদৃশ্য প্রজাপতি ধরে দিয়েছিল। লায়লা প্রথমে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেও অতটুকু ওজন বিহীন পতঙ্গটির হালকা পাখার ছটফটানি দেখে কাতর হয়ে পড়েছিল। বলেছিল-- ইস্, লাগছে ওর। ছেড়ে দাও।

জউনা বলেছিল-- না, তোমার জন্য নিয়ে যাব।

-- ওর কষ্ট হচ্ছে যে।

-- জানি। আমারও কষ্ট হচ্ছে। তাই ধরার ইচ্ছা ছিল না।

-- তবে ধরলে যে!

-- তুমি বললে যে। কিন্তু কেন ছটফট করবে? তোমাকে দিতে চাই, তবু? লায়লা ওর মুখের দিকে চেয়ে লাল হয়ে হেসে উঠেছিল।

-- হাসলে যে?

-- তুমি একটা পাগল।

-- না, আমি ওর বেয়াদপি সহ্য করতে পারছি না। চুপচাপ থাকলে ভাল করত ও।

প্রজাপতি সেই সময় একটু বেশি অস্থির হয়ে ওঠে। জউনা সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে দুহাতে পিষে ফেলে ওটিকে।

লায়লা স্তম্ভিত। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতি প্রিয় সঙ্গীটির মুখের দিকে। কী যেন খুঁজে নিতে চেষ্টা করে ওই মুখে ওই চোখে।

দুজনা কিছুক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে একটাও কথা বলতে পারে না। ফেরার পথে লায়লা একসময় দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে ওঠে-- তুমি এত ভাল, আবার এত নিষ্ঠুর।

বেহালায় ছড় দিয়ে তীব্র করুণ সুর তুললে যেমন মর্মে গিয়ে বেঁধে, লায়লার কথা কয়টি তেমনি গিয়ে বিঁধেছিল জউনার হৃদয়ে সেই বয়সেই। তখন থেকে বিঁধেই রইল।

অথচ সেই সময়ে তার পিতা, পরবর্তীকালের সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক পরাক্রমশালী ভারতসম্রাট সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দরবারে সবেমাত্র সুনাম অর্জন করতে শুরু করেছেন। সুলতান তার পিতার ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন এবং প্রাসাদের অদূরে একটি কুঠীতে বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন। জউনা প্রাসাদের বা আশেপাশের আমীর ওমরাহের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে খেলার সাথী রূপে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে। লায়লা ওদের একজন। সে হ'ল সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর আরজ-ই-মুমালিকের একমাত্র কন্যা।

হয়ত একটা সম্পর্ক গড়েও উঠত ধীরে ধীরে। কিন্তু সেই সময় লায়লার পিতাকে সোনার গাঁও-এ একটি বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালেন সুলতান। সাধারণত উজিরেরা এভাবে যায় না। তবে প্রয়োজনে সব কিছুই হয়। বিশেষত হাতের কাছে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে।

বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে ক্রমাগত বর্ষণেস্ফীত খরস্রোতা একটি নদী অতিক্রম করার সময় তাঁর জলযানটি গভীর রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অনেককে সঙ্গে নিয়ে নিমজ্জিত হ'ল। আশেপাশে অন্য কোন নৌকো ছিল না। তাই

রক্ষা করা যায়নি তাকে। দাড়ি মাঝিদেরও নয়। ভয়ানক সংবাদ এসে পৌঁছোল দিল্লীতে। অনেকের সঙ্গে জউনা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল লায়লাদের গৃহে। সে কেঁদেছিল, খুব কেঁদেছিল। শেষে লায়লাই নিজের চোখ মুছতে মুছতে কাছে এসে তার গায়ে হাত রেখে বলেছিল-- যারা বড় হয়ে যুদ্ধ করে, তারা অত কাঁদে না।

এরপর একদিন সে লায়লাকে আর দেখতে পায়না। তাদের বাড়ি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করায় সদুত্তর মেলে না। পিতাকে পাওয়া কঠিন। খেলার সাথীরা অত গা করল না। তবু অনেকদিন ঘুরঘুর করল লায়লাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে। সিপাহী সান্ত্রীরা তাকে হটিয়ে দিয়ে বলে ওরা মুলুকে চলে গিয়েছে। মুলুক কোথায়? কেউ জানে না। জানার আগ্রহও নেই। খেলার সাথীরা নিস্পৃহ। যেন তারা অনেকগুলো বুদ্‌বুদ্ পাশাপাশি ভাসছিল এতদিন, একটা পুট্ করে ফেটে মিলিয়ে গিয়েছে।

সে জানে ওদের মধ্যে ওসমান নামে একটি ছেলে তাকে পছন্দ করে না কোনদিন। কারণ লায়লা ওসমানের সঙ্গে মিশতে চাইত না। সেই ওসমান একদিন ওকে বলে-- লায়লা কোথায় আছে আমি জানি। নিয়ে যেতে পারি।

জউনা আগ্রহী হয়ে ওঠে। ওসমান বলে--দূরে নয়। ওই টিলা পার হয়ে একটি গ্রামে। যাবি?

জউনা সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

ওরা চলতে চলতে অনেক দূর এগিয়ে যায়। শেষে সেই নদী, যে নদী বাঁক নিয়ে তাদের শহরের দিকে গিয়েছে। কিন্তু এই জায়গাটা বেশ নির্জন, আর স্রোতটা অনেক বেশি।

ওসমান বলে-- লায়লার বাবা আমীর ছিল। জানিস সে কথা?

-- জানব না কেন?

-- আর তোর বাবা?

— জানি না।

-- সবাই বলে তোর বাপ-ঠাকুরদা ক্রীতদাস। তুরস্ক থেকে তোর ঠাকুরদা এসেছিল। এখানে বিয়ে করে এক জাঠ মেয়েমানুষকে। তবে তোর বাবা সেই মেয়ে মানুষের ছেলে নয়। কিন্তু তুই। তুই এদেশের মেয়ের ছেলে। তুই কারাউনা।

জউনা বুঝতে পারে তার সারা শরীরে এবং মাথার মধ্যে কেমন যেন হয়ে উঠছে। ওসমানকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। বয়সে এবং দেখতে তার চেয়ে বড় হলেও চেষ্টা করলে কাবু করতে পারবে। কিন্তু তার আগেই আচমকা তাকে ধাক্কা দিয়ে নদীর স্রোতে ফেলে দেয় ওসমান। হেসে উঠে চেঁচিয়ে বলে-- ক্রীতদাসেরা এইভাবে মরে।

স্রোতের টানে জউনা ভাসতে ভাসতে চলে। সে একবার ডুব দেওয়ায় ওসমান

ভাবে মরার আগে হাবুডুবু খাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে নদীর পার থেকে ওপর দিকে ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে যায়। সে জানে না, জউনা খুব ভাল সাঁতার জানে। শুধু সাঁতার নয়, সে অসি চালনা শিখেছে, অশ্বচালনা শিখেছে। তার পিতা গিয়াসউদ্দিন তার জন্য এইটুকু সময় ব্যয় করেন। নিজেই তাকে নিয়ে যান অনেক দূরে, লোকালয়ের বাইরে। জউনা লক্ষ্য করেছে শেখানোর সময় পিতার চোখেমুখে তারিফ ফুটে ওঠে। বুঝতে পারে সে ভালই শিখছে। তার অন্য তিন ভাইরা বয়সে তখনো ছোট। তারাও নিশ্চয় শিখবে। পিতা শিক্ষা দেওয়ার সময় মাঝে মাঝে বলেন— এর ওপর নির্ভর করবে তোমার জীবন, তোমার জীবিকা। জউনা মনে মনে অনুভব করে পিতার কথার যাথার্থ্য। ভাসতে ভাসতে অনেক কথাই তার মনে জাগে। নিশ্চিন্তে ভেসে চলেছে, কারণ জানে ডুববে না সে। সামনে যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে সেখানে ডাঙায় উঠলে ওসমানের চেয়ে আগে বাড়ি পৌঁছে যাবে। সে এখন ওসমানকে কিছু বলবে না। প্রতিশোধ নেবে সময় মত। তবে মাকে বলে রাখবে। মাকে বললে, পিতার কানে কথাটা পৌঁছবে। পিতা আমীর না হলেও একেবারে কম নন। বরাত খুললে কিছুদিনের মধ্যে আরও উচ্চপদে আসীন হবেন। মাকে একদিন বলছিলেন সেকথা। তখন আর তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা দিতে হবে না।

ওসমানের কথা ভুলবে না জউনা। প্রথমত লায়লাকে নিয়ে ছলনা, তার ওপর তার প্রাণনাশের চেষ্টা। দেখতে বড়সড় হলে কি হবে, আদৌ চালাক চতুর নয় ওসমান। গায়ে জোর আছে বটে, কিন্তু অন্য কোন পারদর্শিতা নেই। অসিযুদ্ধ বা বর্শানিক্ষেপের কথা এখনো বোধহয় কল্পনাও করতে পারে না।

অথচ জউনা? শুধু অস্ত্রশিক্ষাই নয়, অন্য বিষয়েও শিক্ষা নিতে হয় তাকে। মৌলবী আসেন প্রতিদিন। ফারসি ভাষা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্তে এসেছে। শিক্ষক নিজের মুখে সেকথা বলেন। তাছাড়া দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা সব বিষয়েই তার প্রবণতা রয়েছে। এই বয়সেই দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসা করে অনেককে নিরাময় করে তুলেছে। পিতা গিয়াসউদ্দিন সব খবরই রাখেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন। তবে পুত্রের সামনে কখনো প্রকাশ করেন না সেকথা। এমন কি মৌলবীদের বলে দিয়েছেন জউনার যেন কখনো ধারণা না হয় যে সে অন্য সবার মত সাধারণ নয়। মৌলবীরা গিয়াসউদ্দিনের ব্যক্তিত্বকে সমীহ করে চলে। তাই তারা তাঁকে অমান্য করে না।

বাঁকের মুখে নদীর পাড়ে ডাঙায় উঠে পড়ে জউনা। শীতের সময় হলে জমে যেত। কিন্তু তখনও শীত পড়েনি। এ বরং ভালই হ'ল। কতদিন নদীতে সাঁতার দেয়নি। পিতা এক বছর আগে তাকে নদীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলাদা আকর্ষণ আছে এই সন্তরণে। তলাও এ স্রোত থাকে না। স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিতে অন্য শিহরণ।

গায়ের কামিজ খুলে নিংড়ে নিয়ে পরার সময় দেখতে পায় ওসমান ওই পথেই আসছে। বোধহয় দেখতে চায় তার দেহটা ভাসছে কিনা। হ্যাঁ, নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি একটি ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়ে জউনা। ভেবে নেয় কি করবে। আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে ওসমানকে সাময়িকভাবে কাবু করতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ নেই। ওসমান তাকে যা করতে চেয়েছিল সেটাই করা উচিত। কিন্তু এভাবে নয়। এমন অরক্ষিত অবস্থায় নয়। তাছাড়া তেমন মেজাজও নেই। মনে ক্রোধ না থাকলে কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। এখন তার মনে ক্রোধ নেই। সদ্য নদীর জল থেকে উঠে খুব ভাল লাগছে। নিজেকে সতেজ মনে হচ্ছে। প্রতিশোধের অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে।

ওসমান একটু এগিয়ে গেলে সে পেছনে পেছনে গিয়ে তার পিঠে আলতো হাত রেখে বলে-- কোথায় গিয়েছিলি?

ভূত দেখার চেয়েও বেশি চমকে উঠে ওসমান। অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে— আমি না, আমি না।

-- তুই তো দৈবাৎ আমাকে ফেলে দিয়েছিলি। তাই না? ইচ্ছে করে নয়।

-- হ্যাঁ। বিশ্বাস কর--

— দিন যখন আসবে, তুইও বিশ্বাস করবি তো সেদিন?

-- কোন্ দিন?

-- সেকথা বলতে পারছি না এখনই।

কিছুক্ষণ পূর্বে ওসমানের একটি মাত্র ধাক্কা খেয়ে, নদীর জলে পড়ে গিয়ে আগের চেয়ে দ্বিগুণ পরিণত হয়ে উঠেছে জউনা। তার ভেতরের শিশুটি উধাও হয়ে গিয়েছে। নদী থেকে উঠে এই অল্প বয়সেই ভবিষ্যতের অভিসন্ধি সম্বন্ধে ছক কাটতে পারছে। সে বুঝতে পারে ওসমান তার পাশে পাশে চলতে অস্বস্তি অনুভব করছে। বুঝে বেশ মজা লাগে।

লায়লা আর ফিরে আসেনি। কিন্তু জউনার বয়স বাড়তে থাকে। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণের পূর্বেই সে তার তীক্ষ্ণ ও পরিণত বুদ্ধি দ্বারা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অনুভব করতে পারে। পরিমণ্ডল আদৌ সুস্থির নয়। পিতা তার গৃহশিক্ষকরূপে একজনকে অনেক আগে রেখেছিলেন, নাম তার কুতলঘ খাঁ। বয়স তার বেশি নয়, অথচ যথেষ্ট জ্ঞানী। তবে তার জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করে না জউনা। সে অনেক কিছু জানতে চায়, দেখতে চায়, শিখতে চায়। সে সুফী সম্প্রদায় সম্বন্ধে শৈশব থেকে কৌতুহলী। অথচ

কুতলঘ খাঁ তাকে সেই বিষয়ে কিছু জানাতে পারে না। বরং বলতে হয় জানাতে চায় না। সে একজন একনিষ্ঠ মুসলমান। সুফীদের বিতৃষ্ণার চোখে দেখে। তাদের কথা বার্তা, প্রথা পদ্ধতি ইত্যাদি যতটুকু জানে তাতে তাদের তরলমতি বলে বিশ্বাস করে। অথচ তাদের দর্শন তাদের ধ্যানধারণার প্রতি জউনার প্রবল আকর্ষণ। সে সুফীদের কাছে যায়, গিয়ে বসে তাদের কথা মন দিয়ে শোনে। তাদের কবিতা, তাদের গান তাকে মুগ্ধ করে। পিতা তাকে সাবধান করে দিয়েছেন কয়েকবার। তবু সে এড়াতে পারে না। তাই বলে সে পিতার অবাধ্য সন্তান কখনো নয়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সে নানারকম অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বচালনা ইত্যাদিতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এই বয়সেই সে অনেকের সমীহ্ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য তার পিতা মনে মনে তার জন্য আনন্দিত। তাই পুত্রের অন্যান্য খেয়ালখুশীর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চান না তিনি। তবে তাঁর অসন্তুষ্টির কথা সন্তর্পণে জানিয়ে দেন। দর্শন পড়তে পড়তে ইউনানী আর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠে সে। সঙ্গে সঙ্গে কিতাব সংগ্রহ করতে শুরু করে। তারপর গভীর অধ্যয়নে রত হয়। চিকিৎসকদের নিকটে গিয়ে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুধাবন করে। তারপর অতি দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিয়মিত ওষুধ বিতরণ শুরু করে। ওষুধে কাজ হতে থাকে। আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সে, যখন রোগীরা রাজধানীতে চিকিৎসক জউনার অনুসন্ধান করে। তারপর ওই বয়সের হাকিম দেখে অবাক হয়ে যায়।

কিন্তু শত হলেও এসব তো প্রধান নয়। সে রাজকর্মচারীর সন্তান। সেই পরিবেশে তার জন্ম এবং শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠা। রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যা তার শিরা উপশিরায়। দর্শন কবিতা চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি অন্য সব কিছু তার মনের খোরাক যোগালেও রাজনীতি তার মাতৃ দুগ্ধের মত। রাজনীতি তার অন্ন-জল।

সে শুনেছে কীভাবে জালালউদ্দিন খিলজী সামান্য ক্রীতদাস হয়েও বুদ্ধি আর কৌশলে দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন। সে একথাও শুনেছে, আলাউদ্দিন খিলজী একাধারে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। হ্যাঁ, মায়ের মুখে শুনেছে জউনা। পিতৃব্য এবং পত্নীর পিতা হয়েও নিস্তার পাননি তিনি। রাজনীতি এমনই জিনিস। মসনদ হ'ল রাজনীতি আর ক্ষমতার প্রতিভূ। তাই তাকে ঘিরে নিরন্তর ঘূর্ণাবর্ত। তাকে ঘিরে অসির ঝনঝনানি, আর্তনাদ আর রক্তপাত। কত হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায় তার যাদুতে। কারণ একবার সেটিতে উপবিষ্ট হলে অসীম ক্ষমতার আস্বাদন লাভ।

মা শুনিয়েছেন তাকে জালালউদ্দিন খিলজীর হত্যা কাহিনী। কখনো এসব নিয়ে তিনি মুখ খোলেননি। মনে হ'ত রাজনীতির কিছুই বোঝেন না তিনি। পরে কবে থেকে যেন এক আধটা কথা বলতে শুরু করেছিলেন। শেষে দু'একটা ইতিবৃত্ত। সে অবাক

হয়ে যেত প্রথম প্রথম। মা আবার এত সব জানে নাকি ? তারপর আর একটু বয়স হলে বুঝল, শুধু জানা নয় মা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এ বিষয়ে। পুত্রদের স্বাভাবিকভাবে মানুষ করে তোলার জন্য অমন না জানার ভান করে থাকতেন। হ্যাঁ, মা বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন জালাল-উদ্দিনের হত্যা কাহিনী। একাধারে জামাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁর স্নেহ যথেষ্ট থাকলেও তিনিও একই পথে ক্ষমতা দখল করেছিলেন একদিন। এককালের পরাক্রান্ত বলবন বংশকে তিনি নিজেও বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। বলবন বংশের শেষ সুলতান তাঁর হস্তে নিহত হয়েছিলেন। সুতরাং আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁর যতই স্নেহ থাকুক না কেন, নিজের নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন না কখনো। তবু একবার পাপ শুরু হলে তার শেষ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় কেউ বলতে পারে না। এই পাপের আবর্তে পড়ে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার বহু প্রমাণ জ্বলজ্বল করছে। পিতৃব্যের স্নেহছায়ায় কিছুদিন থাকার পরই আলাউদ্দিনের মনের মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সা জাগ্রত হ'ল। মসনদ না পেলে মনে শান্তি নেই। রাতে নিদ্রা নেই। শুভ্র পালঙ্কে সুন্দরী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তারই পিতাকে খুনের চিন্তায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করতে লাগলেন। তারপর একদিন ছটফট করতে করতে প্রাসাদ থেকে বাইরে আসতে তার কনিষ্ঠভ্রাতা ইলমাস বেগের মুখোমুখি।

ইলমাস মুকচি হেসে বলে-- দেখে মনে হচ্ছে ভাই-এর আমার শান্তি নেই মনে।

-- একথা কেন মনে হ'ল?

-- সারা মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ। দুশ্চিন্তায় বোধহয় হজমেরও গোলমাল হয়েছে।

-- তুই বল, আর কতদিন এভাবে চলবে? শুধু হুকুম তামিল করে যাব? আমি জানি, তুই আমার ভাই হয়েও আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। তাই তোকে মনের কথা বললাম।

-- ঠিকই করেছ। তাছাড়া তুমি ভাল ভাবে জান মসনদ দখলের দৌড়ে আমি নেই। সেই যোগ্যতাই আমার নেই। সেটা আমার চেয়ে কেউ ভাল জানে না। শক্তিও নেই। দাপটও নেই। তবে দুষ্টুবুদ্ধি যে একেবারে নেই একথা হলফ করে বলতে পারি না। বংশটা তো জান। যতই মসনদ মসনদ কর না কেন খানদান রক্ত এক ফোঁটাও নেই খিলজী বংশে।

-- ঠিক বলেছিস।

-- সুতরাং জালালউদ্দিন খিলজীর জন্য তোমার বিবেক জাগ্রত হওয়ার কোন কারণ নেই।

-- আমি জানি। আমি মনস্থির করেছি।

— বেশ। তোমার সৈন্যদল নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে শিবির স্থাপন কর একদিন। তাদের শিক্ষা-শিবির হবে সেটি। সৈন্যদের কখনো বসিয়ে রেখে খাওয়াতে নেই। তাতে তাদের দুষ্টবুদ্ধি প্রশ্রয় পায় আর দেহেও চর্বি লাগে।

-- আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ শিক্ষা-শিবির কেন?

— কেন আবার? রাজধানী থেকে কিছুটা দূরে বলে তোমাকেও ছাউনিতে থাকতে হবে দিবারাত্র। সেখানে তো আর একা একা রাত কাটাতে পারবে না। তাই সঙ্গে যাবেন জালালউদ্দিনের কন্যা।

— তারপর?

— তারপরের ব্যবস্থা আমি করব। শুধু তুমি আমাকে খবর দেবে কবে তোমার শিবিরের মধ্যে দেহরক্ষীহীন নিরস্ত্র সুলতানকে পেতে চাও।

আলাউদ্দিন লাফিয়ে ওঠে– বলছিস কি ? এ কি সম্ভব?

-- খুব সম্ভব। আমি দুর্বল আর আমার চোখে মুখে মায়া মাখানো বলে সুলতানের আমার প্রতি বড় স্নেহ। তাঁর আর একটি কন্যা থাকলে কখনই আমাকে জামাতা নির্বাচিত করতেন না। কিন্তু আমার সরল চাহনি আর মিষ্টি মুখের জন্য তাঁর হৃদয়ে আমার জন্য একটা কোমল স্থান রয়েছে। তবু তুমি হলে আমার সহোদর ভাই। তুমি মসনদে বসলে আমি নিশ্চয় আশা করতে পারি মোটামুটি ধনদৌলত নিয়ে সুখে দিন কাটাতে পারব।

— নিশ্চয়। কত ধনদৌলত চাই!

মুচকি হেসে ইলমাস বলে-- সেকথা পরে হবে। আজ চলি।

-- কোথায়?

— সুলতান ডেকে পাঠিয়েছেন। একজন নাম করা বৈদ্য এসেছে কাশ্মীর থেকে। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সালসার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে ডেকেছেন। সব কিছুর আগে হ'ল স্বাস্থ্য। তাই না ভাই?

আলাউদ্দিন সেই কথার জবাব না দিয়ে বলে-- আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করে জানাব।

— ঠিক আছে।

এর পরের অংশটুকু জউনার মা অর্থাৎ বেগম মাখদুমা-ই-জাহান যখন বলছিলেন তখন প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত ঘটল অদূরে। দুহাত দিয়ে দুকান ঢেকে চোখ বুঁজলেন মা। তারপর ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি। চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যেন। যমুনার জলস্ফীতি হতে পারে। ক'দিন ধরে এভাবে চলছে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত।

মা বলেন-- আশ্চর্য! সেদিনও এমন বৃষ্টি পড়ছিল সারাদিন ধরে। তখন বর্ষাকাল।

আলাউদ্দিন একাকী শিবিরে বসে অপেক্ষা করছেন তো করছেনই। ইলমাস কথা দিয়েছে আজ সেই শুভদিন। কিন্তু কখন? ইলমাস বলেছিল, যে কোন সময়। সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করতে হবে। আলাউদ্দিন তাই বসে রয়েছে। তার অসিটি লুকোনো রয়েছে তাঁবুর গায়ে বিশেষভাবে তৈরি একটি কোষের ভেতরে। ঠিক পাশের তাঁবুতে জালালউদ্দিনের রূপসী কন্যা বাঁদী পরিবৃত হয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষারতা।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত সুলতান জালালউদ্দিন খিলজী একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় এসে প্রবেশ করলেন জামাতা আলাউদ্দিনের শিবিরে। সঙ্গে তাঁর ইলমাস বেগ। প্রবেশ করেই সুলতান বুঝলেন, জীবনের চরমতম এবং সর্বশেষ ভুলটি তিনি করে ফেলেছেন। এটা বুঝতে কোন ইঙ্গিত বা চিহ্নের প্রয়োজন হয়নি। বহুযুদ্ধের কৌশলী সেনানায়ক তাঁর সহজাত বৃত্তিতে ধরে ফেলেন ভ্রাতৃদ্বয়ের ষড়যন্ত্র। কিন্তু খুবই বিলম্বে। তবু তিনি অবিচল দাঁড়িয়ে একবার ইলমাসের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলাউদ্দিনকে বলেন— তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই আলাউদ্দিন। আমার পরবর্তী সুলতান তুমি। এ পথে একবার গেলে তার শেষ নেই।

আলাউদ্দিন হেসে বলেন— জানেন যখন, তখন শুরু করেছিলেন কেন?

— আত্মীয়কে আমি হত্যা করিনি। তাছাড়া আমার সামনে অন্য কোন পথ ছিল না। আর তোমার একটাই পথ সম্মুখে প্রসারিত। নির্বিঘ্ন মসনদের পথ।

— কবে? আপনার মৃত্যুর পর? বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া এরপর আমাদের দুই ভাইকে জীবিত রাখবেন?

— সেই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমার আপন বলতে আর কেউ নেই।

আলাউদ্দিন তড়িৎপদে তাঁবুর গোপন স্থান থেকে অসিটি টেনে বের করে আনেন।

জালালউদ্দিন খালি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর ওপর। এমন অবস্থা হয়, অসি আর একটু হলে আলাউদ্দিনের হস্তচ্যুত হতো। কিন্তু হ'ল না। জালালউদ্দিনের স্কন্ধচ্যুত শির ছিটকে কিছুটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে তাঁবুর একটি খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। পাশের তাঁবুতে তাঁর কন্যা তখনো পিতৃহন্তার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে।

ইলমাস বেগ চোখ বন্ধ করে বলে— আমার কাজ শেষ। এসব আমি দেখতে পারি না। মাথা ঘোরে, বমি পায়। আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে লাভ নেই। এখনো তোমার অনেক কাজ বাকী। আমীর ওমরাহদের তাঁবে আনতে হবে। তখন এই অধমের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

—ঠিক আছে। আমি কাঁচা নই। তুই এখন যেতে পারিস।

মা রাজনীতির এমন আরও নেপথ্য কাহিনী শুনিয়েছেন পুত্র জউনাকে। সে বুঝতে পারে তার পিতা তার মাকে সব বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু জানান। তার মা স্থির ধীর এবং সহিষ্ণু নারী। তিনি আদৌ প্রগলভা নন যে কোন কিছু প্রকাশ করে দেবেন। পিতা সেকথা জানেন।

আলাউদ্দিন খিলজীর জীবন সম্বন্ধেও মা তাকে অনেক কিছু বলেন। শৈশব থেকে সে আলাউদ্দিন খিলজীকে দেখেছে। দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সাধারণ প্রজার মতসেও জানত না সুলতানদের ভেতরের খবর। আজকাল যৌবন তাকে স্পর্শ করতে চলেছে বলে মা তাকে যেন বড় বেশী তাড়াতাড়ি সব কিছু বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তবে মায়ের কাছে চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর কথা জানতে পারলেও সাধারণভাবে দেশের এবং প্রাসাদের অবস্থা জানতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় না।

মা বলেন, আলাউদ্দিন পিতৃব্যকে হত্যা করে মসনদ দখল করলেন বটে, কিন্তু স্থায়ী কিছু করে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না। অথচ রাজ্যের পরিধি অনেক বাড়িয়েছেন তিনি। রাজস্ব এবং প্রশাসন বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছেন। তবু বুঝতে পারা যায় তিনি নিজের ব্যর্থতার ফলভোগ করতে করতে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বোধহয় অনুশোচনার তীব্র জ্বালাও অনুভব করেন অন্তরে। জীবনের শেষ প্রান্তে না এসেও তাঁর এই পরিণতির জন্য তিনি নিজেই দায়ী।

মা বলেন, বীর এবং সাহসী যোদ্ধা, বুদ্ধিমান প্রশাসক হলেও সুলতানের মানসিকতা তাঁকে নীচের দিকে টেনে রাখল। যে উদার মন, দূরদৃষ্টি এবং আভিজাত্য একটা সাম্রাজ্যের পত্তনকে দৃঢ়মূল করে তোলে, আলাউদ্দিনের মধ্যে তার প্রচণ্ড অভাব বরাবরই। পিতৃব্য জালালউদ্দিন যে সমস্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এনে রাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন, আলাউদ্দিন এসে তাদের একে একে বিদায় করেন। পরিবর্তে উচ্চপদসমূহে এনে বসান পরিশ্রমবিমুখ ইন্দ্রিয় পরায়ণ ক্রীতদাস গোষ্ঠীর লোকদের। তাদের সঙ্গেই উঠতে বসতে তাঁর সুখ তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। সেই সঙ্গে বহু খোজাও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়। তাই প্রশাসনে বারবার নানারকম গলদ দেখা দিতে লাগল। তবু যতদিন যৌবন ছিল, আলাউদ্দিন তাঁর অদম্য কর্মক্ষমতায় সবরকম বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা কমতে থাকে। ইতিমধ্যে তাঁর পুত্রেরা বড় হয়ে ওঠে। পুত্রদের যোগ্য করে তুলতে হলে যে সমস্ত প্রণালী রয়েছে, তার কোন কিছুতে তিনি মন দিলেন না। এইসব অযোগ্য পুত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাদের প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী করে দিলেন কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া। রাজনীতি, রাজ্যশাসন কোন বিষয়ে তাদের ধারণা নেই। পুত্রেরা যখন বিপুল ক্ষমতা পেয়ে তাদের মনের মত সহচরদের নিয়ে নানারকম কুকর্মে লিপ্ত,

তখন সুলতান আলাউদ্দিন তাঁর দরবারের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দস্তখত নিয়ে সহসা জ্যেষ্ঠপুত্র খিজর খাঁকে তাঁর পরবর্তী সুলতান রূপে ঘোষণা করলেন। খিজরখাঁও সুলতানীর উত্তরাধিকারীত্ব পেয়ে স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে উঠল। সে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত নির্দশন স্থাপন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। রাজধানীর মানুষেরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাদের দিনের শান্তি, রাতের নিদ্রা টুটতে বসে।

আলাউদ্দিন চূড়ান্ত বুদ্ধি ভ্রংশতার পরিচয় দেন ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে অযাচিতভাবে মাথায় তুলে। মালিক ক্রীতদাসদের মধ্যে বেশ একটু চটপটে এবং চাটুকারিতায় ওস্তাদ। তাতে মাথা ঘুরে যায় সুলতানের। ফলে নিজের কবর নিজে খুঁড়তে শুরু করেন তিনি। প্রথমে মালিক কাফুর হল মালিক নায়েব বা নায়েব মালিক। তারপর কয়েক বছর যেতে না যেতে সে হল সিপাহশালার। তাতেও সুলতান তৃপ্ত হলেন না। তাঁর মনে হতে লাগল কাফুরকে আরও কিছু পাইয়ে দিতে হবে। এখনো তাকে তার যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি একদিন তাকে প্রধান উজির করে দিলেন। ফলে কাফুরের মনে হতে হাগল যে সে সর্বেসর্বা। শত হলেও সামান্য একজন ক্রীতদাস এত দ্রুত এত ক্ষমতার অধিকারী হলে মাথা তার ঘুর্রবেই। সেই সঙ্গে তার মনে শয়তানী বুদ্ধিও উঁকি দিতে লাগল। সে জানে আলাউদ্দিনের পুত্র খিজর খাঁ হ'ল ভবিষ্যৎ সুলতান এবং তার জবরদস্ত পৃষ্টিপোষক হলেন তার মামা আল্‌প্ খাঁ। এই আল্‌প্ খাঁ খিজর খাঁয়ের শ্বশুরও বটে। সুতরাং তাকে অপসারিত করতে পারলে পথের সবচেয়ে বড় কাঁটা দূর হয়। তাই সুলতানের মন ভাঙাতে শুরু করল কাফুর এবং কিছুদিনের মধ্যে কৃতকার্য হ'ল। আলাউদ্দিন তখন মালিক কাফুর ছাড়া কাউকে দেখতে পান না। তাঁর জীবনটা তখন কাফুরময়। তার চক্রান্তে আল্‌প্ খাঁ কারারুদ্ধ হন এবং অন্যান্য সমস্ত আমীর ওমরাহের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁকে ফাঁসিতে লটকানো হ'ল। কাফুর শ্মশ্রুতে হাত বুলিয়ে মুচকি হেসে ভাবে, এবার খিজর খাঁয়ের পালা।

জউনা মায়ের মুখে এইসব ইতিবৃত্ত শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, যে মানুষটা নিজের ক্ষমতায় মসনদ দখল করে এতদিন দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করল, যে মানুষটার অদম্য বাহিনীকে আশেপাশের কোন শক্তি রুখতে না পেরে বশ্যতা স্বীকার করল সেই মানুষটা অসহায়ের মত এখন একজন শয়তানের হাতের পুতুলে পর্যবসিত হয় কি করে? তাহলে কি বুঝতে হবে আগের সব কিছু ঘটেছে দৈবাৎ—আলাউদ্দিনের ভাগ্যগুণে? কিন্তু তাই বা হবে কি করে। সুলতান যে যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রশাসনের সংস্কারের মধ্যে, পাওয়া যায় তাঁর রাজস্ব আদায়ের নিয়ম কানুনের মধ্যে। মানুষের কি সত্যই একসময় বুদ্ধিভ্রংশ হয়?

এরপর সুলতান সত্যই একদিন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তাঁর প্রিয়তম পুত্র খিজর খাঁকে কাফুরের প্ররোচনায় কয়েদ খানায় পাঠালেন। সম্ভবত কাফুর তাঁর মনে ভয়

ধরিয়ে দিয়েছিল যে পুত্র তাঁকে হত্যা করে যতশীঘ্র সম্ভব মসনদ দখল করতে চায়। তাঁর এই ভয় খুব স্বাভাবিক। কারণ তাঁর পিতৃব্য জালালউদ্দিন একই কারণে তাঁর হস্তে নিহত হয়েছিলেন। তবে কাফুর কার্যসিদ্ধ করতে পারল না। বাধা এল নানা দিক থেকে। খিজর খাঁ প্রাণে বেঁচে গেল। তাকে নির্বাসিত করা হ'ল।

মায়ের কাছে এতসব শোনার পর আর কিছু শোনার প্রয়োজন হয়নি তার। এরপর নিজেই সে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করল। যৌবনে পদার্পণ করে বহুক্ষেত্রে পিতার যোগ্য সহযোগী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজধানী এবং সাম্রাজ্যের বহু স্থানে পিতার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় সবাই পায় যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র রূপে। তার পিতা একজন অসাধারণ সমর বিশারদ। আলাউদ্দিন এতসব ব্যক্তির উত্থান পতনের মধ্যেও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আসনটি টলে যেতে দেননি। মালিক কাফুরও এই একটি বিষয়ে সুলতানের কান ভাঙাতে পারেনি। চেষ্টার কসুর অবশ্য করেনি সে। বলতে ছাড়েনি যে গিয়াসউদ্দুনের পিতা মালিক তুঘলককে বলবন্ তুরস্ক থেকে ক্রীতদাস হিসাবে সঙ্গে এনেছিলেন। বলতে ছাড়েনি শোনা যায় মালিক তুঘলক নিজের একজন স্বদেশী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একজন ভারতীয় জাঠ রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পদোন্নতি অপ্রতিহত গতিতে হয়ে চলেছে। আলাউদ্দিন খিলজী সম্ভবত গিয়াসউদ্দিনের আচারে ব্যবহারে চোখে মুখে অকৃত্রিম বিশ্বস্ততার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই একবার কাফুরের ঘ্যানঘ্যানানি শুনে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন— অত ক্রীতদাস ক্রীতদাস বলো না তো? তুমি নিজে কি? মাথায় চড়ে ভাব তুমি একেবারে খানদান তাই না? আমি কি? কিছু বলার আগে ভেবে চিন্তে কথা বলবে, যাতে নিজের গায়ে পাঁক না ছিটকায়। কাফুর এর পরে আর একটা কথাও বলেনি। ভয় হয়েছিল, কুলে এসে যদি তরী ডোবে?

খিজর খাঁয়ের নির্বাসনের পর থেকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কুজ্ঝটিকায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়। আলাউদ্দিনের এতদিনের ব্যক্তিত্বের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ায় যে যার মত যা খুশী করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অনেকের লোলুপ দৃষ্টি মসনদের দিকে। কিন্তু যোগ্যতা কোথায়? চারদিক টগবগ করে ফুটতে থাকে যেন।

জউনা একদিন সাহস করে পিতাকে বলে— এমন বেশিদিন চললে বাইরে থেকে শত্রুরা এসে হামলা করবে।

— ঠিক বলেছ। কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছি না। কিছু একটা করা দরকার।

— আপনি নিজে চেষ্টা করুন না। আপনার চেয়ে যোগ্য কাউকে তো দেখি না।

— না, এখনই নয়। মসনদে বসতে হলে একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকা দরকার।

আমাকে অনেকে পছন্দ করলেও সবাই নয়। আমি ভাবছি কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ এখনো এত নীরব কেন।

— আপনাকে আমি যোগ্যতম বলে মনে করি।

— তুমি বুদ্ধিমান, কিন্তু এখনো পরিণত নও। তিনি থাকতে আমি কেন? চল আমরা বরং তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

জউনা অনন্যোপায় হয়ে পিতার সঙ্গে কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহের বাসভবনের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রহরারত সিপাহী গিয়াসউদ্দিনকে দেখে কুর্ণিশ করে পাশে সরে দাঁড়ায়।

যমুনার তীরে গাছপালার ছায়ায় ঢাকা কুতুবউদ্দিনের বাসগৃহের আশেপাশে একটা শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। এখান দিয়ে যতবার গিয়েছে জউনা ততবারই মনে হয়েছে এমন একটা অট্টালিকা তার নিজের থাকলে বেশ হ'ত। কিন্তু অমন কত ইচ্ছা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যায়। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ইচ্ছা।

কুতুবউদ্দিন গৃহে ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে সাদর অভ্যর্থনা জানান। জউনা এবং তার পিতা যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে গৃহস্বামীর অনুরোধে আসন গ্রহণ করে।

কুতুব বলেন— আপনাদের দু'জনার কথা আমার বড় বেশি মনে হচ্ছিল ক'দিন ধরে। আপনার এই পুত্রের জন্য গর্বিত হওয়া উচিত। আপনি এর শৈশবে যখন গোপনে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিতেন তখন থেকে আমি জানি। আমার চোখ এড়াতে পারেননি।

একথা শুনে গিয়াসউদ্দিন রীতিমত আশ্চর্যান্বিত হন। মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অভ্রান্ত ছিল না।

সামান্য হেসে গিয়াসউদ্দিন বলেন— আপনার তুলনা হয় না।

— ওকথা থাক। আমি ভাবছিলাম এভাবে চলতে দেওয়া উচিত নয় আর।

— সেকথা ভেবে আজ আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী আমরা দু'জনা।

— হ্যাঁ। সুলতান মৃত্যু পথযাত্রী। তাঁর দেহের রোগের চেয়েও মনের রোগ বেশি। তিনি মনে হয় সব সময় বিভীষিকা দেখেন। স্নায়ু তাঁর বিধ্বস্ত। তিনি থেকেও নেই। অথচ তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

গিয়াসউদ্দিন বলেন— বেশ তো, তিনি এইভাবে যতদিন বাঁচেন বাঁচুন। কিন্তু কার্যকরী সুলতান হোন আপনি। মসনদের ওপর আপনার হক আছে। আপনি একজন হকদার বলা যায়। এই অরাজকতা দূর করে আপনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন। যেসব মতলববাজ চারদিকে ঘুরঘুর করছে আপনি তাদের হত্যা করুন কিংবা বিতাড়িত করুন। আমি আপনার সঙ্গে আছি। আরও অনেক আমীর ওমরাহকে পাব। ইতিমধ্যে

অনেকের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে এই প্রসঙ্গে।

— বেশ, তবে চলুন কালই একবার সুলতান আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে আসি। অন্তত পাঁচ ছয়জনকে যোগাড় করতে হবে। দলে ভারি হলে সুলতান অবহেলা করতে পারবেন না।

— কাল সকালে তাহলে। ইতিমধ্যে জউনা গিয়ে সবাইকে খবর দিক।

— কাদের খবর দেবেন? তারা বিশ্বস্ত হবে তো?

— হ্যাঁ। খবর দেওয়া হবে বরহাম আইবাকে, তাছাড়া মালিক বারহানউদ্দিন, কাজী কামালউদ্দিন, কাজী সামাউদ্দিন, মালিক তাজউদ্দিন জাফরকে। আপনার কি মনে হয়?

— এরা আপনার বিশ্বস্ত জানি। বেশ খবর দিন। আমিও দেখি কাকে কাকে বলা যায়। তাহলে কথা রইল, কাল দ্বিপ্রহরের আগে।

কিন্তু সুলতানের সঙ্গে আর দেখা করা হয়ে ওঠেনি। তার আগেই তাঁর ডাক এল। কুতুবউদ্দিনের গৃহে যখন গিয়াসউদ্দিন আলোচনারত তখন সুলতানের সর্বাঙ্গ শীতল হতে থাকে। তাঁর চক্ষুদ্বয় নিস্পন্দ হয়ে আসছিল। তিনি তখন ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে সুশীতল অথচ সর্বচিন্তাহর শান্তিময় মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করছিলেন।

আবার জউনার মনে উদয় হয়, কুতুবউদ্দিন কেন? তার পিতা নয় কেন? গ্রহণযোগ্যতা? কে ঠিক করবে, দু'জনার মধ্যে কার গ্রহণযোগ্যতা বেশি? পিতাকে কথাটা আর একবার বললে কেমন হয়? শৈশবে সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্রদের দেখে তার মনে ঈর্ষা জাগত। সে দেখত তারা কত সুখে কত জাঁকজমকের মধ্যে দিন কাটাত। তাদের আজ্ঞাবহ বান্দারা সব সময় তটস্থ হয়ে থাকত আশেপাশে। তাদের চলার পথে হঠাৎ এসে গেলে পথিক সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকত। অথচ সে যখন তার তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেত কেউ লক্ষ্যও করত না। খুব পরিচিত কোন সিপাহীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভদ্রতা করে কখনো সখনো বলত, বেড়াতে চললে বুঝি? আলাউদ্দিনের পুত্রদের আড়ম্বর দেখে তারও মনের নিভৃত কোনে সুলতানজাদা হওয়ার ইচ্ছা জাগত। সবাই তাকে যখন অবহেলা করত পথে ঘাটে, তখন ক্রোধে তার ভেতরটা জ্বলে উঠত। কারণ সে মনে মনে ভালভাবে জানত সুলতানের এইসব পুত্রেরা কোন বিষয়েই তার চেয়ে উঁচুতে নয়। ওরা কিতাবের ধারে [illegible] চায় না। ওরা অস্ত্রবিদ্যায় নিপুন নয়। এমনকি অশ্বচালনাতেও ওরা সুপটু নয়। তার প্রমাণ শৈশবে একদিন হাতে নাতে পেয়েছিল। সেদিন পিতাকে অনেক অনুরোধ উপ[illegible] করে সে একটি অশ্ব নিয়েছিল। পাঠ্য বিষয় ছাড়া অন্য সব শিক্ষাই

সে পেয়েছে লোকালয়ের বাইরে। বহুদিনের ইচ্ছা ছিল রাজধানীর রাজপথে একদিন অশ্বচালনা করবে। পিতা নিষেধ করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন পুত্রের সুনিপুণ চালনা যদি কোন আমীর বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর নজরে পড়ে যায় তাহলে সেকথা আলোচিত হবেই। তাহলে সুলতানের রোষ না হলেও তাঁর পুত্রদের কিংবা অন্য কোন আমীরের হিংসা জাগতে পারে মনে। তাই এড়িয়ে গিয়েছেন বরাবর। কিন্তু সেদিন পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে তিনি মানা করতে পারেননি। নিজের সাদা রঙ-এর তুর্কী অশ্বটি তাকে দিয়ে বলেছিলেন, রাজধানীর ভেতরে যেন জোরে না ছোটায়। জউনা আনন্দে আত্মহারা হয়ে অশ্বটি নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। আর ঠিক সেইদিনই সুলতানের এক পুত্র বেরিয়েছিল একটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব নিয়ে। তার অশ্বচালনা দেখতে পথের দুই পাশে লোকের ভিড় জমেছিল। একই রাস্তায় সুলতানজাদা একবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে বহু দূরে, আবার ফিরে আসছে মোটামুটি জোরের সঙ্গে। লোকে বলাবলি করে ঘোড়াটা ঘাড় কাৎ করে থাকে কেন? তার জন্যে জোরে ছুটতে পারছে না। একজন বলে— ঘোড়াটা কত বড় দ্যাখ আগে। অতটুকু ছেলে সামলাতে পারছে না। তবু তো চালাচ্ছে। আমাদের ছেলেরা হলে পারত? সুলতানের ছেলে বলে কথা।

জউনা এতসব কিছু জানত না। সে জানত না সুলতানের পুত্র অশ্ব ছোটাচ্ছে রাজপথে। সে তার শ্বেতশুভ্র অশ্বটির পৃষ্ঠে চাপতেই পিতার সাবধান বাণী বিস্মৃত হয়। মনের সুখে অশ্ব চালায়। একবার সে নিমেষের তরে দেখতে পায় কৃষ্ণবর্ণের একটি সুন্দর অশ্বের পৃষ্ঠে বসে এক কিশোর তার দিকে চেয়ে রয়েছে। কিছু ঠাহর করার আগেই সে অনেক দূর এগিয়ে যায়। সে লক্ষ্য করেছে অনেক লোক রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বুঝতে পারেনি। ছুটতে ছুটতে সে পশ্চিম দিকে চলে যায় অনেক দূরে। আরও দূর থেকে আরাবল্লীর একটি প্রশাখা তাকে হাতছানি দিতে চায়। এদিকে এলেই ওসমানের কথা মনে পড়ে যায়। কয়েকদিন আগে ওসমানকে দেখেছে সে। সুলতানের পুত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করছিল। তাকে দেখে এড়িয়ে গেল। যা খুশি করুক। জউনা জানে ওসমানের শেষ পরিণতি নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। সে কিছু ভুলে যায় না।

নদীর কাছে এসে শহরের দিকে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না তার। সে জানে না তার অশ্বচালনার ভূয়সী প্রশংসা করছে পথচারীরা। তাদের মনে হয়েছে অশ্বারোহী আর অশ্ব যেন পৃথক কেউ নয়। বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা যায়নি অশ্ব আর তার আরোহীকে। সুলতানজাদার নৈপুণ্য যে তার তুলনায় কিছুই নয় একথাও অনেকে আচমকা বলে ফেলেছে। তাই নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেই অলোচনা সুলতানজাদার দেহরক্ষীদের কেউ কেউ শুনে ফেলে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট তার কানে

পৌঁছে দিয়েছে। সে ক্রোধান্বিত হয়। জউনার সঙ্গে তার কখনো কোন কথা না হলেও গিয়াসউদ্দিনের পুত্র বলে তাকে চিনতে পেরেছিল। তবে সুলতানের পুত্র হলেও জউনার মত সে মেজাজী নয়। ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয় না জউনার মত। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কিছুদূর। তারপর ফাঁকায় এসে শহরের বাইরের দিকে ঘোড়া ছোটায়।

দূর থেকে জউনা লক্ষ্য করে সেই অতিসুন্দর অশ্বটিকে নিয়ে আশ্বারোহী তারই দিকে এগিয়ে আসছে। আরও নিকটে এলে সে চিনতে পারে সুলতানের পুত্রকে। তার আশঙ্কা হয় তাকে ওইভাবে রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে দেখে সুলতানপুত্র চটে গিয়েছে। ভেবেছে তকে দেখেও না দেখার ভান করেছে। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এটা জউনার কারসাজী। সে বুঝতে পারে পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এইসব জটিলতা সৃষ্টির ভয়ে তার সবরকমের সমরশিক্ষা অন্তরালে দিয়ে এসেছেন। এবারে সুলতানের পুত্র যদি তার বেয়াদপির কথা সুলতানকে বলে তাহলে পিতাকে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। এখন তিনি সদ্য উচ্চপদ পেয়েছেন এবং সবাই তাঁকে আমীর হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছে।

সুলতান-পুত্র তার অশ্বটিকে জউনার অশ্বটির পাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। বয়সে সে জউনার চেয়ে অন্তত তিন বছরের বড়। সেই তুলনায় বাড়বাড়ন্ত।

পিতার মুখখানা মনে ভাসে জউনার। সে আলতো অভিবাদন জানিয়ে বলে— আপনার এই অশ্বের মত অশ্ব হিন্দুস্থানে আর আছে কিনা সন্দেহ।

— তোমার টা?

— এটা আমার পিতার। তবু আপনার অশ্ব মনে হয় বেশি ভাল। ওটির পৃষ্ঠে বসতে হলে সৌভাগ্যের প্রয়োজন।

সুলতান-পুত্র ভাবে, তার এই অশ্বটিকে সামলানো গিয়াসউদ্দিনের পুত্রের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। রাজপথে নিয়ে গিয়ে পাল্লা দিলে ঘাড় বেঁকিয়ে জ্বালাতন করবে।

সে জউনাকে বলে— এখনই তোমার সেই সৌভাগ্য হতে পারে।

— কেমন করে?

— অশ্ব পাল্টাও। তোমারটা আমি নিচ্ছি। আমারটা তুমি নাও। তারপর আমরা ছুটব শহরের পথে।

— দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

— ঘটবে কেন? সামলাতে হবে। তবু যদি ঘটে যায়, ঘটুক। দু'চারজন মানুষ অশ্বের পায়ে লেগে ছিন্নভিন্ন হলে হোক। আমোদটা তো কম হবে না।

জউনা মনে মনে তাকে তারিফ না করে পারে না। একেই বলে সুলতানের পুত্র।

এর জাত আলাদা। বেপরোয়া একটা ভাব। আর তার শুধু মনে ছুটছিল পিতার কথা। এইখানেই প্রভেদ।

সে বলে ওঠে— রাজী।

ওরা অশ্ব পরিবর্তন করে।

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বটির সওয়ার হয়েই আরামে জউনার চোখ দুটি বুজে আসে। নিজেকে মনে হতে থাকে সুলতান পুত্র। তবে পিতার অশ্বটিও কম যায় না। সুলতান-পুত্রকে চমৎকার মানিয়েছে ওটিতে।

— তোমার এই সাদা ঘোড়াটা আমি আগে ছুটিয়ে দেব। একটু পরে তুমি ছুটবে। সোজা শহরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সিরিতে পুরোনো কেল্লার পাশে থামবে। আমি সেখানে অপেক্ষা করব।

— ঠিক আছে।

সূর্য ডুবতে তখনও অনেক বাকি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই সময়ে বড় বড় রাজপথে লোকজনের ভিড় স্বভাবত একটু বেশি হয়। সুলতানের পুত্রের অশ্বখুরে কারও দেহ ছিন্নভিন্ন হলে দোষের না হতে পারে। কিন্তু তার অশ্বে অঘটন কিছু ঘটে গেলে পিতার ভবিষ্যৎ অতটা উজ্জ্বল নাও থাকতে পারে, একথা জউনা পরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে এই বয়সেই বুঝতে পারে। কিংবা আলাউদ্দিনের পুত্রের দোষটা তার সাদা ঘোড়ার ওপর বর্তাতে পারে। বেতরিবত ওই অশ্ব নষ্টের গোড়া। সব কিছুই হতে পারে। তবু পেছিয়ে যাবে না জউনা। কারণ অশ্বটিকে চালনা করার অদম্য স্পৃহা তাকে অশান্ত করে তুলেছে। অশ্বটিও যেন তাকে ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। এটিকে দ্রুত গতিতে অত লোকজনের মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারলে সে বুঝতে পারবে অশ্ব চালনার শেষটুকু সে জেনে ফেলেছে। তারপর শুধু অভ্যাস বজায় রাখতে হবে।

সুলতানজাদা হাত উচিয়ে ইশারা করে শহরের দিকে রওনা হয়। জউনা এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে সেই দিকে। সে লক্ষ্য করে সুলতানজাদা ঘোড়ায় বসে ঠিক স্বচ্ছন্দ নয়। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। যেভাবে বসলে ঘোড়া আরাম পায় তার বসাটা ঠিক সেরকম নয়। একটু অন্য ধরনের। নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারছে না অশ্বের দেহের সঙ্গে। মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে জউনা। ওইভাবেই সুলতানজাদা তার পিতার শ্বেত অশ্ব নিয়ে একটি বড় বটগাছের আড়ালে চলে যায়। তখন সে নিজে সেই একান্ত প্রার্থিত কৃষ্ণবর্ণের অশ্বটিকে পা দিয়ে একটু খোঁচা দেয়। অশ্বটি চনমন করে ওঠে। তারপর সামান্য ইঙ্গিতে সেটি ছুটতে থাকে। সে যখন শহরের মাঝখানে এসে পড়ে তখন সবাই দূরে সরে যায়। তারা যেন দেখতে পায় ক্ষণপ্রভাব ঝিলিক। চিনতে পারে অশ্বটিকে। একটু আগে তারা অবাক হয়ে দেখেছে সুলতানের পুত্র অশ্ব পরিবর্তন করে কোনরকমে ছোটাতে ছোটাতে সিরির দিকে চলে গিয়েছে। আর তার

সেই ঘাড় বাঁকানো অশ্ব কত সাবলীলভাবে ছুটে গেল একই পথে। পথচারীরা সার কথা বুঝে গেল।

তাই কুতুবউদ্দিন কেন? গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নয় কেন? বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেক আমীর ওমরাহের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। কারণ সুলতান অনেক ক্ষেত্রে তার ওপরেও একাজ ওকাজের ভার দিয়েছেন। সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে অনেকের সঙ্গে। তাতে সে স্পষ্ট বুঝেছে, এদের অধিকাংশ অপদার্থ। সবাই আলাউদ্দিনের পেয়ারের লোক। কোন বিষয়েই তাদের সম্যক জ্ঞান নেই। একমাত্র মালিক কাফুর যুদ্ধবিদ্যা কিছুটা আয়ত্ত করেছে বলে তার মনে হয়। রাজনীতিব কিছুই বোঝে না সে। অথচ সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। অন্য যারা আছে তারা সবাই একই ধরনের। কুতুবউদ্দিন অবশ্য প্রকৃতই উপযুক্ত। এমনকি আলাউদ্দিনেব চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু তার পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কম কিসে? কথাটা পিতার কাছে গিয়ে উচ্চারণ করবে কি করে? আবার শুনতে হবে যে তার বুদ্ধি অপরিণত। কুতুবউদ্দিনকে তিনি বড় বেশি শ্রদ্ধা করেন। তাছাড়া নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা তাঁর স্বভাব নয়। যদিও তিনিও তো ক্রীতদাসের পুত্র। মালিক তুঘলককে গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্রীতদাস রূপে নিয়ে এসেছিলেন তুরস্ক থেকে। একথা গোপন করাব কোন চেষ্টা কবেন না তাব পিতা। সত্যকে স্বীকার করায় সঙ্কোচ কিসের?

তবু আলাউদ্দিনের মৃত্যুর দিনেই সুযোগ বুঝে কথাটা বলে ফেলে জউনা। স্তব্ধ হয়ে যান গিয়াসউদ্দিন। বলেন— আর একবার বলতো কথাটা। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

জউনা বরাবরের জেদি। কোনরকম বাধা কিংবা বাঁকা কথা শুনলে তাব বোখ চেপে যায়। সে উত্তপ্ত হয়ে কাটা কাটা স্বরে বলে— আমি বলছি, কুতুবউদ্দিনকে সরিয়ে দিয়ে আপনি মসনদে বসার চেষ্টা করুন। এ সুযোগ আর পাবেন না। আপনি মসনদে বসলে দেশে শৃঙ্খলা ফিরবে, শান্তি ফিরবে।

— আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, তুমি আমার পুত্র। আমার মনটা ভেঙে গিয়েছে।

— এখন অমন মনে হচ্ছে বটে, পরে যখন আমার কথার যুক্তি খুঁজে পাবেন তখন এমন অবস্থা থাকবে না মনের। হয়ত আফশোষ হবে তখন।

— তুমি এখন যেতে পার।

জউনা রেগে গিয়ে পিতার কক্ষ থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়। তার মনে হতে থাকে কুতুব-উদ্দিন সুলতান হলেও স্থায়ী সমাধান হবে না। কুতুবউদ্দিন যোগ্য হতে পরেন, তবে তাঁর ক্ষমতার চেয়ে পিতার কর্মদক্ষতা অনেক বেশি। পিতার প্রশাসন এবং রাজত্ব

বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে দিনের পর দিন সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে, মন দিয়ে ভেবেছে, তারপর এই সিদ্ধান্তে এসেছে।

মরহুম আলাউদ্দিনের লাশ গোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে আগুন জ্বলে উঠল। প্রাসাদের ভেতরে এবং রাজপথে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হ'ল। কে যে কার পক্ষে লড়াই করছে বোঝার উপায় নেই। এমন কি যে অসি হস্তে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে-ও জানে না যাকে আঘাত করতে যাচ্ছে সে তার শত্রু পক্ষের না মিত্র। অদ্ভুত পরিস্থিতি। এর মধ্যে মালিক কাফুর কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে সরে রইল। সে রাতের অন্ধকারে গিয়াসুদ্দিনের গৃহে এসে উপস্থিত। গিয়াসউদ্দিন তখন বাইরে ছিলেন। তবে জউনা কয়েক মুহূর্ত আগে ফিরেছে। তার অসি রক্তাক্ত। এ রক্ত আত্মরক্ষার্থে। যাদের সে এতদিন মিত্র বলে ভাবত তাদেরই একজন তাকে হত্যা কবার জন্য প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিল। সুতরাং জউনা প্রত্যাঘাত করেছিল। আর তার অভিধানে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। সেই দণ্ড স্বহস্তে দিয়ে সে গৃহে ফিরেছে কিছু খেয়ে নিতে। রাজপথের দোকানপাট সব বন্ধ। জনমনিষ্যি নেই কোথাও। অন্ধকার নামতে এক চিলতে আলোও চোখে পড়ে না কারও বাসগৃহ থেকে।

কাফুর বলে-- আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করব।

কাফুর সম্বন্ধে রাজধানীব প্রতিটি মানুষ ওয়াকিবহাল। প্রীতির চোখে কেউ দেখে না। তার জন্যই আজ আলাউদ্দিনেব পুত্র দেশছাড়া। সে দেশে থাকলে তার যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক এভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ত না। কারণ তাকে বহুদিন পূর্ব থেকে আলাউদ্দিন উত্তরাধিকারী রূপে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাই এই অসময়ে কাফুরের আবির্ভাবে সন্দেহ জাগে জউনার মনে। ইচ্ছা হয় তার রক্তে অসিটা আর একটু রাঙিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

-- উনি বাড়িতে নেই।

— তাহলে আপনাকে বলি। আপনাকে আমি অল্প বয়স থেকে দেখে আসছি। তরুণ হলেও আপনার যোগ্যতার কথা আমার অজানা নয়।

— আমার গুণাগুণ না গেয়ে যা বলার চটপট বলে ফেলুন। কারণ আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। কোন মতলবে এসেছেন জানা নেই। বাইরে দলবল অপেক্ষা করছে হয়ত।

— না না। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একা।

— বলুন।

-- আমি অনেক অ-কাজ কু-কাজ করেছি অস্বীকার করছি না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

— কোন বিষয়ে?

— মসনদ দখল করে সুলতান হওয়ার হিম্মৎ আমার নেই। সেই প্রলোভন এককালে ছিল। তারই বশবর্তী হয়ে সুলতানের শ্যালক আল্প্ খাঁয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছি। সুলতানজাদা আমার প্ররোচনায় দেশছাড়া। কিন্তু শেষে দেখলাম আমি ভীতু। যুদ্ধে ভয় পাই না। মৃত্যুকেও না। কিন্তু এতবড় একটা দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি আপনার পিতার কাছে এসেছি। আমি আমার সমস্ত শক্তি আর দলবল নিয়ে তাঁকে মদত দেব। কসম খেয়ে বলছি।

জউনা বেশ অবাক হয় কথাটা শুনে। মালিক কাফুরের আজকের কথার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। তার চোখমুখের প্রকাশভঙ্গিতেও কোন কপটতার ছাপ নেই।

সে কাফুরকে বাজিয়ে দেখার জন্য বলে— কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ কি দোষ করলেন?

— তাঁকে যদি আপনার পিতা সাহায্য করেন, আমি তাতে রাজি। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু চাই নিরাপত্তা। সবাই আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আছে। আমি আপনাদের বিশ্বস্ত থাকব, সব কিছু করব। শুধু আমার প্রাণ যেন না যায়। আর আমাকে যেন রাস্তায় বের করে না দেওয়া হয়।

— আপনি এখন যান। আচ্ছা ওসমানকে চেনেন?

— কোন ওসমান? মহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দিনের ছেলে?

— ঠিক।

— চিনি।

— তার খবর রাখেন?

— হ্যাঁ। সে তো মহম্মদ মইজউদ্দিনের সঙ্গে ভিড়েছে। কুতুবউদ্দিন মুবারককে হঠাতে চায়। আপনার পিতার নাম শুনলে ক্ষেপে ওঠে। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না, এমন সব কথা বলে।

— যদি নিরাপত্তা পেতে চান তাহলে তার দিকে কড়া নজর রাখবেন। আমাকে মাঝে মাঝে জানাবেন।

— তাহলে আমি নিশ্চিন্ত তো?

— হ্যাঁ।

ওসমানের কথা উঠলে আজও সুলতান আলাউদ্দিনের অরজ্-উ-মুমালিকের রূপসী কন্যার কথা মনে পড়ে যায়। সেই সরল নিষ্পাপ বালিকার মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তাকে মনে হয় আগের মতই সমবয়সী, সমব্যথী। লায়লা কল্পনায় তার সমান বড় হয়ে ওঠে কিংবা সে নিজে লায়লার মত ছোট হয়ে যায়। কোনটা ঠিক, বুঝতে পারে না।

দুদিন পরে চকবাজারে একটা তামাকের দোকানের সামনে পিতা গিয়াসউদ্দিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে জউনা এগিয়ে যায়। তার পিতার কোন নেশা নেই। খাদ্যের তালিকাও অতি সাধারণ। খুব সংযত মানুষ। তিনি কেন তামাকের দোকানের সামনে? পিতার সম্মুখে কিছু লোক বসে রয়েছে। সে লক্ষ্য করে তারা প্রত্যেকে তামাক টেনে চলেছে।

— আপনি এখানে কি করছেন?

— শুনলাম তামাকের মধ্যে বিষ মিশিয়ে মুবারক শাহকে হত্যার চক্রান্ত হয়েছিল। তাই এই দশজনকে বসিয়ে দিয়েছি। দোকানের সব তামাক থেকে নিয়ে এদের দিয়ে টানাচ্ছি।

বুঝতে পারে জউনা ওরা সব শত্রুপক্ষের লোক। ওদের অবস্থা বেশ সঙ্গীণ। যতই তামাকে অভ্যস্ত হোক না কেন, কত আর টানবে? চোখে জল আসতে বাধ্য। আসছেও। কাশতে কাশতে কারও দম আঁটকে আসছে। তবু নিষ্কৃতি নেই। তাছাড়া মৃত্যু ভয় আছে। কোন তামাকের পাত্রে বিষ মেশানো রয়েছে আর কার ভাগ্যে পড়বে সেটা জানে না কেউ। যদি সত্যিই বিষ থাকে তাহলে তো হয়ে গেল।

এক সময় দেখা গেল একটা টান দিয়েই একজন ঢলে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। দোকানীকে ওই তামাকের পাত্র নিয়ে আসতে বলেন গিয়াসউদ্দিন। দোকানী কাঁপতে কাঁপতে সেটি নিয়ে আসে।

— এটা কি খুব দামী?

— হ্যাঁ হুজুর। সবচেয়ে দামী। খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়।

— তুমি তাহলে এর থেকে নিয়ে এক ছিলিম খাও।

দোকানী আর্তনাদ করে উঠে বলে— না, না, মেহেরবান, আমাকে হুকুম করবেন না।

— কেন?

— আমি ওসবের কিছু জানি না।

গিয়াসউদ্দিনের মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। তিনি কিছু বলার আগেই জউনার অসি দোকানীর শিরচ্ছেদ করে।

— এ কি করলে? খবরটা নিতে দিলে না?

— সামান্য বিষয় নিয়ে কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই এখন। আমরা বিচার করতে বসিনি।

— তামাকটায় সত্যি বিষ আছে কিনা দেখতে হবে তো।

— আর একজনের ওপর পরীক্ষা করুন।

— কিন্তু সূত্র পাব কোথায়?

— সূত্র বের করার দরকার নেই। শত্রুপক্ষকে জানা আছে। তাদের খতম করলে চলবে।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বোধহয় জীবনে এই প্রথম পুত্রের যুক্তির মধ্যে সারবত্তা কিছু পেলেন। এই প্রথম তিনি তার কর্মের বিরুদ্ধে আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না।

শুধু বললেন— বাকীরা?

— ওদের অস্ত্র কোথায়?

— কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

— ওরা আটকে থাক এখানে।

— ঠিক। যদি কিছু খবর বের করা যায়। তুমি বরং অনেক ক'জন মুর্দাফরাশকে এক জায়গায় এনে রাখার ব্যবস্থা কর। লাশ সরাতে কাজে লাগবে।

— আমি যাচ্ছি।

সেই সময় দেখা গেল মালিক কাফুর দলবল নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। জউনাদের দেখে এগিয়ে এসে মৃতদেহ আর বন্দীদের দেখে বলে— ঠিক আছে। আমি এখানে থাকছি।

তারপর সে গিয়াসউদ্দিনকে বলে— ওসমানকে দেখলাম কয়েকজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোককে নিয়ে যাচ্ছে মসজিদের পাশের ওই ভাঙা কুঠিতে । সঙ্গে তার অনেক লোক। স্ত্রীলোকদের বোরখা খুব মূল্যবান। আমার সঙ্গে বেশি লোক ছিল না বলে দূর থেকে দেখে লোক যোগাড় করতে এসেছি। আমার ভাল মনে হ'ল না। নারীরা পর্দানশীন পরিবারের। এই বিপদের মধ্যেও মুখ ঢেকে কেঁদে চলেছে যাতে কেউ তাদের চিনতে না পারে। সবাই সুন্দরী। হাত আর পা দেখলে বোঝা যায়।

গিয়াসউদ্দিন হুংকার দিয়ে পুত্রকে বলেন— ওদের উদ্ধার করগে। যদি মরতে হয়, তবু। আমি এখানে থাকছি।

— চল কাফুর।

কাফুর বলে— ওরা অন্তত পঞ্চাশ জন রয়েছে।

— রমনী কতজন?

— দশ বারোজন হবে।

জউনা একবার দলের লোক গুণে নেয়। উনত্রিশ। বলে— এতেই হবে। চল।

মালিক কাফুর একটু অবাক হয়ে থমকে যায়। তারপর জউনার রক্তবর্ন মুখের দিকে চেয়ে দ্বিধাভাব কাটিয়ে উঠে তাকে অনুসরণ করে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নমাজ ধ্বনি ভেসে আসছিল সামনের মসজিদ থেকে। মোল্লা তার কর্তব্য করে চলেছে। তবে নমাজ পড়ার জন্য কে আসবে কে জানে? চারদিকে অনিশ্চয়তা। সবাই সন্ত্রস্ত।

জউনার লক্ষ্য মসজিদের অনতি দূরে ওই ভাঙা বাড়ি। কবে কে নির্মাণ করেছিল জানা নেই। কোন হিন্দু রাজা হবে। কারণ পাশেই দেবালয়ের মত একটি স্থান রয়েছে। সেটি পরিত্যক্ত। দুটি নিমগাছ বড় হয়ে উঠেছে অট্টালিকার দু'পাশ দিয়ে। কয়েকটি বাবলা গাছ হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়ে অপেক্ষা করছে। কার জন্য? হয়ত ভ্রমরের জন্য। আগামী কাল আবার সূর্যোদয় হবে।

জউনা হঠাৎ প্রশ্ন করে— আচ্ছা কাফুর, বাবলার ফল দেখেছ কখনো?

— হ্যাঁ দেখেছি।

জউনা তীক্ষ্ণস্বরে আবার প্রশ্ন করে— দেখেছ?

-- না বোধ হয়। ঠিক মনে করতে পারছি না।

— তোমার আত্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই। কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিতে নিতে চাটুকারে পর্যবসিত হয়েছ।

কাফুর ভাবে, লোকটা পাগল নাকি? রাগে জ্বলতে জ্বলতে এসে হঠাৎ ফুলের কথা বলে কেন? এর পিতা এমন নন। খাঁটি বাস্তবকে ভালভাবে বুঝতে পারেন। তবে একথা ঠিক এক মুহূর্তের জন্যও জউনা তার পায়ের গতি কমায়নি।

তারা ওসমানের একটু পরেই পৌঁছে যায়। ভেতরে হৈ হট্টগোল চলছে। মাঝে মাঝে নারীর ভয়ার্ত আর্তনাদ।

জউনা বলে— মালিক কাফুর আজ তোমার পরীক্ষা। আজ যদি তুমি সফল হও তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ নিরাপদ। অবশ্য কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করলে মৃত্যু।

কাফুর বলে— আমি ভেতরে যাচ্ছি।

— হ্যাঁ, অন্তত তিনজনকে খতম করবে। তাহলে হিসাবে মিলবে। দেখবে আসলে ওরা ভীতু। সবার আগে রমণীদের কাছে গিয়ে তাদের ইজ্জত বাঁচাতে হবে। তার পরে অন্য সবার সঙ্গে মোলাকাত। আমিও যাচ্ছি। ওসমানকে মেরোনা তোমরা। ওকে আমার জন্য রেখে দিও।

— ঠিক আছে।

জউনা বলে— তোমরা সবাই একসঙ্গে হুংকার দিয়ে ওঠো। যাতে ওরা ঘাবড়ে গিয়ে ভাবে আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি।

সবাই চিৎকার করে উঠেই সবেগে ছুটে যায় বাড়ির ভেতরে। পুরাতন বাড়ি। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে বেলাশেষের আধো অন্ধকার। ওদের চিৎকারে ভেতরের হট্টগোল থেমে যায়। নারীদের আর্তনাদও স্তব্ধ। তারপর ওসমানের দল বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা প্রবল বাধা পায়। সংখ্যায় বেশি হলেও তারা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তরবারি ঘোরানোরও জায়গা নেই। অথচ জউনার লোকেরা যথেচ্ছভাবে

বল্লম ছুঁড়ছে। অসিও চালাচ্ছে মওকা বুঝে। বিপক্ষ দল ভীত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলে। নারীদের কথা তারা ভুলে যায়। নারীরা সেই সময় একটি কক্ষের মধ্যে জড়াজড়ি করে বসে থাকে। তাদের অনেকের বোরখা সরে গিয়েছে। ওড়না ছিঁড়ে দিয়েছে বর্বরের দল। তবু হঠাৎ তাদের ছেড়ে দিয়েছে বলে আশার আলো ফুটে ওঠে তাদের চোখে।

সেই সময় জউনা সেই কক্ষে প্রবেশ করে বলে— ভয় পাবেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

ওদের একজন জউনাকে চিনতে পারে। ফিস্‌ফিস করে এ-কান ও-কান হতে হতে সবাই জেনে যায় তার পরিচয়।

কক্ষ থেকে কাফুর চিৎকার করে বলে— ওসমান এখানে রয়েছে। পালাতে চেষ্টা করছে। খতম করে দেব?

— কক্ষনো না। আমি যাচ্ছি।

জউনা দ্রুত গিয়ে পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করে। সে দেখে ওসমানের হাত শোণিতাক্ত। অপরের শোণিত, না তার নিজের বুঝতে পারা যায় না। তবে তার হাতের অসি দ্বিখণ্ডিত। অর্থাৎ অন্য কারও সঙ্গে লড়তে গিয়ে এই অবস্থা। জউনার মন খারাপ হয়ে গেল। যেভাবে প্রতিশোধ নিলে মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে সেভাবে নেওয়া হ'ল না।

— কেমন বুঝছিস ওসমান?

— আমি অস্ত্রহীন। আমাকে অস্ত্র দে।

— বিশ্বাস কর, তোকে দৈবাৎ কেটে ফেলব আজ। একদিন দৈবাৎ আমাকে নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলি মনে নেই? ভেবেছিলি আমি সাঁতার জানি না। সেদিনই বলেছিলাম, তোকেও একদিন দৈবাৎ ওভাবে শেষ করে দেব।

— আমার হাত শূন্য। আমি অস্ত্রহীন।

জউনা কালক্ষেপ না করে এক নিমেষে তাকে হত্যা করে পেছনে না তাকিয়ে রমণীদের কক্ষে চলে যায়।

কাফুর সেখানে গিয়ে বলে— এমন নির্বিকার ভাবে মারলেন?

— যাদের পছন্দ করি না তাদের ওভাবে মারতে আমার খারাপ লাগে না। ওরা মানুষ নয়। আমার বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে তাকে আর মানুষ বলে ভাবি না আমি। এমন কি স্বয়ং সুলতান হলেও নয়। সুফী সন্ত হলেও নয়।

কাফুর ভাবে, ভাগ্যিস এ সুলতান হবে না কখনো। সুলতান হওয়ার দুর্লভ ভাগ্য যদি এর কখনো হ'ত তাহলে সবাইকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত।

অবশেষে সবার সমবেত প্রচেষ্টায় কুতুব-উদ্দিন মুবারক শাহ্ আলাউদ্দিন খিলজীর পরে সুলতান হলেন। যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তা কিছুটা প্রশমিত হ'ল। অস্ত্রের ঝনঝনানিও স্তিমিত হ'ল। দিন কাটতে লাগল। সূর্য ডুবল আর উঠল প্রতিদিনই। মাসও কেটে যায়। বছর কাটে।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক পুত্রকে ডেকে একদিন বলেন— কবরের শান্তি কাকে বলে জান?

— শুনেছি।

— এখন সেই শান্তি বিরাজ করছে।

— এ কথার অর্থ?

— আপাততঃ কেউ বুঝতে পারছে না কি করবে। এই এক বছর কুতুবউদ্দিন সুলতান হয়েছেন। চেষ্টারও কসুর করেননি দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু কি অনুভব করতে পারছ?

— না, আমিও সেই কথা ভাবি।

— বুঝতে পারি, সবাই একটা কিছুর অপেক্ষা করছে। কেউ নিশ্চিন্তে নেই। কী একটা যেন ঘটতে চলেছে। কিন্তু কি ঘটবে অনুমান করতে পারছে না। তাই সবার মনে একটা অস্বস্তি। প্রকৃত শান্তি বিরাজ করলে এমন হ'ত না।

— আমরা কি করতে পারি?

— অপেক্ষা। হ্যাঁ অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই।

— কতদিন?

— যতদিন কিছু একটা না ঘটে। কিছু ঘটার আয়োজন দেখলেই প্রস্তুত হতে পারি। সুলতান অনেক চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। তাঁকে অযোগ্য বলব না। কিন্তু এই সময়ে তাঁর চেয়েও যোগ্যতর কারও প্রয়োজন ছিল।

— সেকথা আমি আগেই বলেছিলাম।

— কি বলেছিলে?

— আপনি সেই সময়ে সুলতান হতে পারতেন।

— দেখ, তুমি আমার পুত্র। তোমাকে এই বেলা একটা কথা বলে রাখি। তোমার অনেক গুণ আছে। সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। কোন কোন বিষয়ে তুমি রীতিমত প্রতিভাবান। কিন্তু একটা গলদ তোমার জীবনকে নিরর্থক করে দিতে পারে। তুমি ধৈর্য ধরতে পার না। সব কিছুই তুমি সঙ্গে সঙ্গে পেতে চাও। এই দোষ যে কতখানি সর্বনাশ ঘটাতে পারে তোমার ধারণা নেই। একটু সহিষ্ণু হও।

— হয়ত আপনি যথার্থ কথা বলেছেন। তবে অতিরিক্ত ধৈর্য আর স্থবিরতার মধ্যে

এক এক সময় আমি পার্থক্য হারিয়ে ফেলি। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন বছর দেড়েক আগে আলাউদ্দিন খিলজীর শেষ সময়ে যেমন একটা অনিশ্চয়তার ভাব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল, এখনও আবার ঠিক তেমনি একটা অশুভ ছায়া সব কিছু গ্রাস করতে আসছে।

-- আমি জানি এবং প্রস্তুত আমি। আমি জানি যদি এবারে তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে নেতৃত্ব দিতে হবে আমাকে। এবারে কেউ বাধা হতে পারবে না। সেবারে পারত।

জউনা ভাবে, পিতার সঙ্গে অযথা এভাবে বাক্যবিনিময়ের কোন অর্থ হয় না। দুজনার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। দুজনার দর্শনও ভিন্ন।

গিয়াসউদ্দিন পুত্রের পিঠে হাত রেখে বলেন-- প্রতীক্ষা করতে জানা এক ধরনের প্রতিভা।

জউনা হেসে ফেলে।

-- এখন হাসলেও পরে বুঝবে। আর একটা কথা। বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ। ফলভোগ করতে হয়। আলাউদ্দিনকে চোখের সামনে ভুগতে দেখেছ। যে তোমার ওপর আস্থা রাখে, তার সেই আস্থায় আঘাত হানতে নেই। তাকে হত্যা করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

-- আমারও ধারণা তাই। জালালউদ্দিনকে আলাউদ্দিন যেভাবে হত্যা করেছিলেন বলে শুনেছি আমি তাকে সমর্থন করতে পারি না। তবে সেই সময়ে কোন পরিস্থিতিতে অমন করতে হয়েছিল আমার জানা নেই।

-- যে পরিস্থিতিতেই হোক না কেন।

-- মসনদ বিষম বস্তু। অনেক বাঁধাধরা নীতি নিষ্ঠার বিচ্যুতি ঘটে থাকে।

-- তাহলে সে মানুষ কিসে?

-- সেই জন্যেই তো মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করে। বেহেশত-এ তাদের বাস নয়।

গিয়াসউদ্দিন পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলেন। যেন নতুন কাউকে দেখছেন তিনি। এতদিন যাকে পক্ষপুটে রেখে বড় করে তুললেন, দেখলেন সে কোকিল শাবক। কিন্তু তিনি মনুষ্যেতর জীব নন, তাই ঠুকরে বাসা থেকে ফেলে দিতে পারেন না।

তিনি মনের চাপা দুঃখ এবং হতাশাকে প্রকাশ না করে বলেন-- যার যেমন অভিরুচি ভাবতে পারে। নিজস্ব মতে অন্যের হস্তক্ষেপ কেউ পছন্দ করে না। আমিও তোমাকে আর কিছু বলব না। তবে মুখ্যত আমি সুলতানের সিপাহ্ শালারের পদে আছি বলে তোমাকে বলছি খুসরব খাঁয়ের দিকে নজর রেখ। ওই লোকটা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। এক ধরনের প্রতিভা রয়েছে ওর যা মানুষকে হাউই-এর মত অনেকটা উঁচুতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

-- আমি ওকে পছন্দ করি না। তেমন কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

-- অত ছোট করে দেখনা ওকে।

-- আপনার আজ্ঞা পালন করব। খুসরব খাঁকে আমি সব সময় চোখে চোখে রাখব।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের প্রথমা স্ত্রী তুরস্কের মেয়ে। পিতা মালিক তুঘলকের সঙ্গে যখন গিয়াসউদ্দিন দেশ ছাড়েন তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর পরিবারও একই সঙ্গে তুরস্ক ছেড়ে হিন্দুস্থানের দিকে পাড়ি দেয়। চলতে চলতে এদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তারপর একদিন উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের স্ত্রীর পরিবারের একটি বিষয়ে খুঁতখুঁতানি থেকেই যায়। তারা বুঝতে পারে না "তুঘলক" কথাটা কোথা থেকে এল। তাদের মধ্যে একজন বলে, তুরস্কেব একটা উপজাতির অমন নাম সে শুনেছে। "উপজাতি" কথাটা অবমাননাকর। শুনে মালিক তুঘলক অত্যন্ত বিরক্ত হন। বলেন, তাঁরা কোনদিনই উপজাতি ছিলেন না। তাঁরা পাহাড় পর্বত কিংবা বনে জঙ্গলে বা মরুভূমিতে চরে বেড়াতেন না। রীতিমত বংশপরম্পরায় ঘর সংসার করে এসেছেন। হঠাৎ "তুঘলক" কথাটার মধ্যে এমন দুর্গন্ধ ওঁরা খুঁজে পেলেন কি করে? তাও আবার বিবাহের পবে। এতে কি ওদের জীবন সুখের হবে? নাকি মান বাড়বে? তুর্কী ঘোড়ার মত দুরন্ত যৌবন তখন গিয়াসউদ্দিনের দেহ-মনে শিরা-উপশিরায়। যতবার তিনি পত্নীর কাছে যেতে চেয়েছেন ততবার ওই অল্প বয়সী বালিকাটি অস্বস্তি অনুভব করেছে। দু-এক বছর পরেই বালিকার দেহের দুকুল ছাপিয়ে যৌবন এল। তখন পত্নীর কাছে গেলে নব যৌবনার হাবভাব দেখলে মনে হত তাঁর সর্বাঙ্গ যেন পূর্তিগন্ধময়। জীবনের প্রথম নারীকে যখন সমগ্র দেহ-মন-যৌবন দিয়ে পেতে চাইছেন তখন তার কাছ থেকে পাচ্ছেন এক প্রচ্ছন্ন অনাদর। বারবার এমন হতে থাকে। যে নারীকে অতি প্রিয় এবং আপন বলে মনে হয় তার গা স্পর্শ করা মাত্র সে যদি নিঃসাড় আর শীতল হয়ে যায় তাহলে অপমানে মনে বিক্ষোভ দেখা দেয়। গিয়াসউদ্দিনের তাই হল। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে এক জাঠ কিশোরীর সঙ্গে দেখা। এই কিশোরী আবার ভিন্ন প্রকৃতির। গিয়াসউদ্দিনকে দেখেই সে বিমুগ্ধ। তার রূপ গুণ তেজস্বীতা, সব কিছু কিশোরীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। গিয়াসউদ্দিনের স্পর্শে সে প্রথমে শিহরিত হয়, তারপর জাগরিত হয় এবং শেষে সজীব হয়। ফলে তিনি বাঁধা পড়েন তার কাছে। পরে সেই তুর্কী রমণী নিজের ভ্রম বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু বড়ই দেরিতে। তাই সান্ত্বনা রূপে পেয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিনের চতুর্থ বা শেষ পুত্র সন্তানকে তাঁর গর্ভে। কিন্তু সে তো শুধু নিয়মরক্ষা। হয়ত শেষ জীবনের অবলম্বন বা বৈচিত্র্য

ভিক্ষা করেছিলেন স্বামীর কাছে।

কিন্তু এসব হ'ল অতীতের কাহিনী। এখন তুঘলক পদবীটিকে আর অমর্যাদাকর বলে মনে করে না কেউ। সম্মানের সঙ্গেই গৃহীত হয়। গিয়াসউদ্দিনের পুত্রেরাও নিজেদের তুঘলক পরিচয়ে গর্ব অনুভব করে। "কারাউনা" কথাটাও উচ্চারণ করে না কেউ তাদের সম্বন্ধে।

গিয়াসউদ্দিন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন যে পুরুষের বীরত্ব সাহসিকতা আর অন্য সমস্ত গুণই আসল পরিচয়। বংশ সম্বন্ধে যদি অমর্যাদাকর কিছু থেকেও থাকে তাও ঢাকা পড়ে যায়। কিংবা বলা যেতে পারে বানের জলের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর পিতা মালিক তুঘলক বলবনের সময়ে সুনাম করেছিলেন। তিনি নিজে সেই সুনাম বজায় রেখে আরও বৃদ্ধি করেছেন। জউনাও নিশ্চয় আরও অনেক ধাপ এগিয়ে দেবে। তার প্রকৃতির মধ্যে নানা ধরনের বৈপরীত্য থাকলেও সে যে প্রতিভাবান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তুঘলক বংশের তিন পুরুষের মধ্যে সে সবচেয়ে প্রতিভাবান একথা মনে মনে মেনে নিয়েছেন গিয়াসউদ্দিন। অন্য তিন পুত্রেরা এমনিতে ভাল। তবে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন গুণের উন্মেষ দেখা যায়নি। তারা আমীর হতে পারে, কর্মচারী রূপে সুনাম অর্জন করতে পারে, কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা তাদের ততটা নেই। ব্যক্তিত্বের ছটাও সেভাবে প্রকাশ পায় না।

জউনা পিতার নির্দেশ অনুযায়ী খুসরব খাঁয়ের প্রতি নজর রেখেছিল বটে, কিন্তু তাকে থামিয়ে রাখতে পারল না। গিয়াসউদ্দিনের অনুমান সর্বাংশে সঠিক। খুসরব খাঁ এমন এক পদ্ধতিতে নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেলল যা অবিশ্বাস্য। সহজ পথ কখনোই নয়। কেউ তাকে পছন্দ করে না, অথচ সামনে প্রতিবাদ করতে পারল না। অন্যায় বুঝেও তাকে সমর্থন করে বসে অনেকে। তার ভাবে ভঙ্গিতে চলনে-বলনে কথাবার্তায় এমন এক চমৎকারিতা রয়েছে যে তাকে অস্বীকার করা দুরূহ হয়ে পড়ে। জউনা মনে মনে মেনে নেয় যে খুসরব খাঁয়ের এই চটক তার মধ্যে নেই। লোক খুসরবের কথায় সম্মোহিত হলেও বুঝতে পারে তার চিন্তায় এবং কাজে কোন গভীরতা নেই। তবু খুসরব ঠেলে উঠল। তার উত্থানে সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহও অসহায় বোধ করতে থাকেন। তিনি লক্ষ্য করেন আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর আগের বছর গুলি যেমন হয়ে উঠেছিল, এখনো দেশ সেই একই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আলাউদ্দিনের মত তিনি অসুস্থ নন, অথচ প্রতিরোধ করতে পারছেন না। তিনি দেখলেন তাঁর প্রিয় এবং বিশ্বস্ত আমীর ওমরাহেরা একে একে পদবী আর প্রচুর অর্থের লোভে খুসরব খাঁয়ের দিকে ঢলে পড়ছে।

শেষে অনন্যোপায় হয়ে গিয়াসউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন তিনি। জউনাও পিতার

সঙ্গী হয়ে সুলতানের কাছে গেল।

-- গিয়াসুদ্দিন আমার মনে হচ্ছে এই অরাজকতা আমি সামাল দিতে পারব না।

গিয়াসুদ্দিন সত্যটা মেনে নিয়ে নীরব থাকেন।

-- চুপ করে থাকবেন না। আমি পরামর্শের জন্য আপনাকে ডেকেছি।

-- আমি নিজেই দিশেহারা সুলতান। আপনাকে কি আর বলব। অর্থ আর উচ্চপদ যে এভাবে মানুষকে আদর্শচ্যুত করে আমি ভাবতে পারিনি। অথচ এরা সবাই মনে মনে বুঝছে যে খুসরব খাঁ প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবে না। তবু অলীক আশার পেছনে ছুটছে।

-- কি করা উচিত আমার?

-- অপেক্ষা করতে হবে। আমি চেষ্টা করে দেখছি এদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি কিনা। খুসরবের একটা দোষ রয়েছে। সেই দোষকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। সে ধর্মে বিশ্বাস করে না। ইসলাম ধর্মের আচার নিষ্ঠার তোয়াক্কা করে না। আল্লাহকে মানে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

-- বলছেন কি গিয়াসউদ্দিন?

-- হ্যাঁ। আমি অনেকদিন থেকে এর ওপর নজর রাখছি। এই জউনাই নজর রেখেছে। খুসরব খাঁ কখনো ভুলেও নমাজ পড়ে না। কোনদিন রোজা পালন করেনি। দিব্যি খেয়ে দেয়ে রমজান মাসটা কাটায় প্রতি বছর। ও যদি কখনো মসনদে বসে তবে ইসলামের ঘোর দুর্দিন। মুসলমান সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

-- আমি আর ভাবতে পারি না।

ভাবতে আর হয়নি বেশিদিন, সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ কে। জামাদি-উস্-সানির রাত্রে খুসরব খাঁয়ের চক্রান্তে তিনি নিহত হলেন। আর খুসরবকে মসনদ থেকে হটাতে আবির্ভাব ঘটল অপর এক স্বঘোষিত নায়কের। নাম তার গাজি মালিক।

জউনার হাত নিশপিশ করতে থাকে। তার মাথায় আগুন জ্বলে। এভাবে চুপচাপ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা যায় না। পিতা এখনো যেন ভেবে চলেছেন। আর কি ভাবার সময় আছে? তাহলে সুলতানের মত তার পিতার আয়ুও ফুরিয়ে যাবে। কারণ এখন আব তিনি সাধারণ কেউ নন। তাঁর পেছনে অনেকের সমর্থন রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করতে শুরু করেছে অনেক বিচক্ষণ আর অভিজ্ঞ ওমরাহ আর সাধারণ নাগরিকেরা। সবার ধারণা হয়েছে পাবলে একমাত্র গিয়াসউদ্দিন তুঘলক পারবেন। কারণ তাঁর ক্ষমতার লোভ নেই। তিনি কৌশলী বীর এবং সবার ওপর নীতিবান।

পিতা অবশেষে পুত্রকে ডেকে বলেন-- এবারে কাজে নামতে হবে। সময় এসে গিয়েছে। তোমাকে বারো তেরো জনের নাম বলব। তাঁদের সঙ্গে প্রতিদিন যোগাযোগ

রেখে চলবে। আর একটা কাজ করতে হবে। যতশীঘ্র সম্ভব খুসরবের সঙ্গে গাজি মালিকের যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে হবে। মসনদ দখল করে ও আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

-- মসজিদে হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করছে।

গিয়াসউদ্দিন চমকে উঠে বলেন-- তাই নাকি ?

-- হ্যাঁ। সে কোরান ত্যাগ করেছে। সবাইকে বলছে কোরান পাঠের কোন মূল্য নেই।

-- তুমি তাড়াতাড়ি কর। যদিও আমার বয়স হয়েছে, তবু এবারে আমি আর নিষ্ক্রিয় থাকব না। আমি এখন কারও কাছে দায়বদ্ধ নই। এখন একজন অনধিকারী কাফের জোর করে মসনদ দখল করেছে। তাকে হটাতে হবে।

-- আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর পরে আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম, বোধহয় ভুলে গিয়েছেন।

-- না, ভুলিনি। কিন্তু খুসরব খাঁয়ের আগে আর একজন খুসরব হতে চাইনি আমি। সব কিছুরই একটা প্রথা প্রকরণ রয়েছে। নইলে শেষ পর্যন্ত পস্তাতে হয়। খুসরবের ভবিষ্যৎ কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পাবে। হুমকি দিয়ে আর ধাপ্পা দিয়ে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষকে অল্প কিছুদিনের জন্য তাঁবে বাখা যায়। কিন্তু সবাইকে দীর্ঘদিন কখনো রাখা যায় না।

খুসরব খাঁ সুলতান হয়ে আরও অনেক কিছু করতে শুরু করল যা কল্পনা করা যায় না। নারী নির্যাতন বাড়ল। পথেঘাটে তাদের চলাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আর পুরুষদের জীবনের কোন মূল্য রইল না। সামান্য একটু সন্দেহ হলে তাকে কোতল করা শুরু হ'ল।

গিয়াসউদ্দিন দুই মাসের মধ্যে আরও অনেককে পেয়ে গেলেন নিজের পক্ষে। যারা এল তাদের কাছে আপাত লাভের চেয়ে স্থায়ী শান্তি অনেক বেশি কাম্য। তারা প্রত্যেকে তাদের লোকজন সংগ্রহ করে ফেলল। সবাই পরামর্শ করে প্রথমে ঠিক করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার করতে হবে। গাজি মালিককে আরও একটু উস্‌কে দিতে হবে যাতে উভয় পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ে। তবে একথা ঠিক গাজি মালিক খুসরবের মত মারাত্মক নয়। তাব ভেতরে সদ্‌গুণের অভাব নেই। তবু আপাতত ঘুঁটি হিসাবে তাকে বাড়িয়ে দিতে হবে।

খণ্ডযুদ্ধ অনেক হ'ল, তবে ফয়সালা হল না। একবার গাজি সুবিধা করে তো [illegible] খুসরব। আসলে খুসরবকে বেশি পারদর্শী বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু অবিরত এই যুদ্ধবি[illegible] দেশের প্রতিটি মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এদিকে এতদিনে

মালিক ওমরাহ মিলে গিয়াসউদ্দিনের হাতে খুসরবকে দমন করার ভার তুলে দিল। এই প্রথম গিয়াসউদ্দিন স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলেন। এই দিনটির জন্য এ যাবৎকাল অপেক্ষা করে ছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছাই ছিল কোনরকম বিবাদ বিসংবাদ বা সংঘাতের মাধ্যমে না গিয়ে যখন ক্ষমতা আপনা থেকে তাঁর করায়ত্ত হবে তখনই শুধু তিনি কাজে নামবেন। সেই দিন অবশেষে এল।

তিনি তাঁর সেনাদলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে রাজধানীর বিশেষ বিশেষ স্থানে গোপনে নিয়োগ করলেন। কেউ বুঝতেও পারল না এরা সুলতানের লোক নয়। সুলতানের সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চারের জন্য অতর্কিতে তাদের ওপর হানা দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল। তারপর এক মধ্যরাত্রে তিনি কাজ শুরু করলেন। চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে আক্রমণ চলল। সুলতান পক্ষ অপ্রস্তুত। তবু অস্ত্রের ঝনঝনানি চলল প্রহরের পর প্রহর। শেষে সুলতানের লোকজন দেখল আর উপায় নেই। অস্ত্র চালনাব চেয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠল। হারেমের রক্ষীরাও বাকি রইল না।

খুসরব খাঁ তার নিজের ভবিষ্যৎ এতদিন পবে দেখতে পেল। রাত শেয হয়ে আসছিল তখন। প্রাসাদের হৈ হট্টগোল স্তিমিত হয়ে আসছে। অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে। তবে হারেমের রমণীদের ওপর কোনরকম অত্যাচার হয়নি। গিয়াসউদ্দিনের কড়া নির্দেশ ছিল। আর সেই নির্দেশ ছিল বলেই খুসরব খাঁ সেই মুহূর্তে প্রাণে বেঁচে গেল। কারণ সে তখন হারেমে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। সে হারেমের পেছনের একটা খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে একজন ভিস্তিওলা আপন মনে বারবার জল এনে একটি বৃহৎ পাত্র ভর্তি করছে। সে জানে না প্রাসাদের ভেতরে সারারাত কি ঘটেছে। তার জীবনের সব দিনই সমান। বেশি দুঃখ আর অল্প দুঃখ। পেট ভরে খাওয়া আর আধ-পেটা খাওয়া।

বাইরে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া। পাখিরা তখনো জেগে ওঠেনি। সামনে প্রাসাদ সংলগ্ন বিশাল উদ্যান। গিয়াসউদ্দিন বলবনের সৃষ্ট এই উদ্যান। ভিস্তিওলা খুসরবকে দেখে চিনতে পারেনি। কারণ খুসরবের পরনে সাধারণ পোষাক। তাকে পালাতে হবে। কয়েকজন বেগম আকুল হয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল চলে আসার সময়। কয়েকজন হাঁটু জাপটে ধরেছিল। সে তাদের লাথি মেরে, ঘুষি মেরে সরিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। একটুও সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না তার। গিয়াসউদ্দিনের লোকেবা যখন হারেমে ঢুকেছিল সে তখন একটি পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। গিয়াসউদ্দিনের লোকেরা রমণীদের দেখে পর্দা উঠিয়ে খোঁজার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারা স্ত্রীলোকদের শান্ত হয়ে বসে থাকতে বলে। ভয়ে আগে থাকতেই একটি ঘরে এসে জড়ো হয়েছিল হারেমের সব রমণী।

এত ভোরে ভিস্তিওলাকে দেখে খুসরব খাঁ অবাক হয়েছিল। জীবনে বোধহয় প্রথম তার বোধগম্য হয় অনেক মানুষ নীরবে তার নিজের কাজ করে যায় পৃথিবীতে। সে ভাবে, ভিস্তিওলা সেজে সবার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে।

খুসরব ভিস্তিওলাকে বলে-- ভিস্তিটা আমাকে দে।

-- কেন? আমার ভিস্তি তোমাকে দেব কেন?

-- আমি বলছি, দে। দিবি না?

-- হায় আল্লাহ্, তুমি দেখছি সুলতান খুসরবের মত বাজে কথা বল। অনেক কষ্টে এটা খরিদ করেছি। তাই এই কাজটা পেয়েছি। তোমাকে দিলে খাব কি?

-- সুলতান খুসরবকে তুই দেখেছিস?

-- না। তবে লোকে বলে তার কথাবার্তা বে-আক্কেলে।

খুসরব খাঁ তার হাতে একটি সুবর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে বলে— এই নে। এবারে দে।

ভিস্তিওলা নির্বাক হয়ে হাতের মুদ্রার দিকে চেয়ে থাকে। এটা দিয়ে যে কতগুলো ভিস্তি কেনা যাবে সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু লোকটা কে? তার ভিস্তি নিয়ে লোকটা ছুটতে ছুটতে দূরের বাগিচার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটু পরেই একদল লোক বেশ ব্যস্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের দেখে সে মুদ্রাটা ভয়ে লুকিয়ে ফেলে।

-- এই। এখানে কি করছিস?

-- আমি ভিস্তিওলা।

-- ভিস্তিওলা তো ভিস্তি কই?

-- নিয়ে গেল।

-- কে?

-- চিনি না।

-- দিয়ে দিলি?

ভিস্তিওলা একটু ভেবে বলে-- জোর করে নিয়ে গেল কি করব?

-- বেশ করেছে। বোকা কোথাকার। খুসরবকে দেখেছিস?

-- কোন খুসরব?

-- খুসরব আবার ক'টা আছে? সুলতান খুসরব খাঁ।

-- ও বাবা। সুলতান? কোনদিন দেখিনি তাঁকে। সুলতান কুতুবউদ্দিনকে চিনতাম। তাঁর আমলে এই কাজ পেয়েছিলাম।

-- এখান দিয়ে কেউ যায়নি?

— একজন গিয়েছে।

-- সুলতান?

— নাঃ । সাধারণ লোক হবে। সুলতানের সঙ্গে কোনদিনই আমার দেখা হবে না। আমি যখন কাজ সেরে চলে যাই তখন কাকের ঘুম ভাঙে।

— আচ্ছা যে লোকটা এখান দিয়ে গিয়েছে তার গালে কি বড় কাটা দাগ আছে? তাহলে সুলতান।

ভিস্তিওলার সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে হাতের মুঠোর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার অস্তিত্বটা টিপে টিপে অনুভব করতে থাকে। এতখানি উপকার যে করেছে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার মত দুষমনী সে করতে পারবে না। কে কবে সুলতান হ'ল, কবে চলে গেল তাতে তার কিছু এসে যায় না। তারমত গরীবদের উপকার কেউ করে না। ভিস্তি ভর্তি করে বারবার জল এনে পাত্র পূর্ণ করা কিংবা কোন স্থান ধুয়ে দিতে দিতে একদিন সে গোরস্থানের দিকে পাড়ি দেবে। তখন তার পুত্র তার গোর-এ মাটি দিয়ে তারই ভিস্তি কাঁধে তুলে নিয়ে কাজ শুরু করবে। এই হ'ল তাদের বাঁধাধরা কিসমত। এই হ'ল তাদের নসীব।

সে বলে— আমি দেখতে পাইনি। আলো ফোটেনি, দেখব কি করে?

ওরা হৈ হৈ করতে করতে সুলতান যেদিকে গিয়েছে সেদিকে চলে গেল।

স্বর্ণমুদ্রাটি নিয়ে ভিস্তিওলা ভাবে, কোথায় যাবে? এটি নিয়ে দোকানে গেলে সবাই বলবে চুরি করে এনেছে। কেড়ে নিতে পারে। মারধোর করতে পারে তাকে। সে থমকে দাঁড়ায় একটু। মালিক সামসউদ্দিনের কাছে গেলে কেমন হয়? তিনি তাকে চেনেন। একটা উপায় বাৎলে দিতে পারেন। তার কথা বিশ্বাসও করবেন। কিন্তু তিনি কোন দলের সে জানে না। যদি শোনেন সুলতান খুসরবকে দেখেও ধরিয়ে দেয়নি, তাহলে ক্রুদ্ধ হতে পারেন সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এই সুলতানের প্রতি কেউ সদয় নয়। তার মত অনেকে সুলতানকে স্বচক্ষে না দেখেও বিরূপ ধারণা পোষণ করে।

তাই সে লোকগুলোর পেছনে পেছনে চলে। যদি ভিস্তিটা ফিরে পাওয়া যায়। কিছুদুর চলার পর সে দেখতে পায় সুলতানকে। তার হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হওয়ার অবস্থা। সে দেখে যারা সুলতানকে খুঁজতে এসেছে তাদের দিকে পেছন ফিরে তিনি ভিস্তি দিয়ে একটি গাছে জল সিঞ্চনে ব্যস্ত।

লোকগুলো চলে গেলে ভিস্তিওলা সুলতানের কাছে গিয়ে বলে— সুলতান, ওরা আপনাকে খুন করতে এসেছে। পালিয়ে যান।

খুসরব তার দিকে ফিরে চায়। ভিস্তিওলা এবারে সুলতানের মুখের সেই কাটা দাগ দেখে ভাল করে। সে আরও লক্ষ্য করে, সুলতানের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার এতটুকু তাগিদ নেই। শান্ত ভাব। খুসরব বগলের নিচে থেকে ভিস্তি বের করে আসল

মালিকের হাতে দিয়ে একটু হাসে।

-- পালান সুলতান, ওরা এখনই আবার ফিরে আসবে।

-- তুমি আমাকে চেনো?

-- আগে চিনতাম না। এখন চিনি। ওরাই চিনিয়ে দিয়েছে।

-- কোথায় পালাব? দিল্লী বড়ই ছোট জায়গা। আমার মুখ সবার জানা। এই এতবড় দেশেও আমার লুকিয়ে থাকার উপায় নেই।

হাত বাড়িয়ে মোহরটা ফেরৎ দিতে চেয়ে ভিস্তিওলা বলে --এটা নিন। আমার ভিস্তি তো পেয়ে গেলাম।

-- না। ওটা তোমার কাছে রাখ। তুমি অন্তত আমাকে মনে রাখবে। তুমি আমাকে বাঁচাতে চেয়েছ। একমাত্র তুমিই।

-- আমি চলি। আপনি ওই দক্ষিণের পথ দিয়ে যান। ওদিকটা কম লোকে যায়।

খুসরব খাঁ সেই দিকেই যায়। কিন্তু আজ সেদিকও নির্জন নয়। অনেককে খোঁজাখুঁজি করতে দেখা যায়। সে একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকোয়। ভাবে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি অস্ত্রও সঙ্গে আনেনি সে। আনার সুযোগ হয়নি তার। মোতি বেগমের পালঙ্কের পাশে এতক্ষণ গড়াগড়ি খাচ্ছে সেটি। বেগমদের ভালবাসার বিশ্বাসী নয় সে। মুহূর্তে ওদের মন পালটায়। যতক্ষণ ক্ষমতা ততক্ষণ বশ।

-- এই।

এতক্ষণে নজরে পড়েছে একজনের। তবু বসে থাকে খুসরব।

-- এই শুনতে পাচ্ছিস না?

খুসরব বাইরে এসে বলে-- শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু শুনে কি করব। আমার আদমিকে তো পাইনি। তাই জিরিয়ে নিচ্ছি। তোমরা আসার অনেক আগেই আমি এখানে এসেছি।

-- ও।

লোকটা চলে যায়। প্রথম ফাঁড়া কাটল খুসরব খাঁয়ের।

দ্বিতীয় জন এসে বলে-- এই, ওখানে কি করছিস? এদিকে আয়।

খুসরব বলে-- যে কাজ করতে এসেছ কর। ঝামেলা করো না। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারবে?

-- দেখি দেখি? চাঁদ মুখখানা একবার দেখি?

খুসরব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে-- দেখ।

লোকটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকতে শুরু করে সবাইকে। ধরা পড়ে যায় সুলতান খুসরব খাঁ।

শহরের বাজারে শত শত মানুষের সামনে সেইদিনই দ্বিপ্রহরে খুসরবকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দারুণ-কষ্ট দিয়ে মারা হয়। আর সেই হত্যাকাণ্ডের তদারকিতে থাকে গিয়াসউদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র জউনা।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হলেন। জউনা লক্ষ্য করে সুলতান হয়েও তার পিতার মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন নেই। আগের মত ধীর স্থির। তিনি প্রথম দিনেই তাঁর সহকর্মী ও পুরুষ আত্মীয়দের দরবারে ডাকেন।

-- বসুন বসুন। আজ প্রথম দিন। তাই বলে আনন্দের দিন ঠিক বলতে পারি না। বরং বলা যেতে পারে ভবিষ্যৎ যাতে আনন্দের হয় তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দিন। আপনারা সবাই নিজের নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন বলে খুসরব খাঁয়ের মত মারাত্মক লোকের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পেরেছি আমরা। আজ সুলতান হয়ে আমার প্রথম কর্তব্য হ'ল আপনাদের যথাযথ সম্মান জানাতে প্রত্যেককে উপাধি বিতরণ এবং কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কারণ আগের যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ মৃত, অনেকে আত্মগোপন করেছেন, বাকিরা ঘরে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে থেকেও অনেকে অবশ্য আমার অধীনে কাজ পাবেন। আপনাদের সর্বপ্রথম বলে রাখি আমি সুলতানদের অধীনে কাজ করে আজ বৃদ্ধ। বেশিদিন সময় পাব না। তাই নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রধান বিষয়ের ওপর জোর দেব যাতে মূল কাঠামো দৃঢ় হয়। আমাদের দেশে সব সময় বিদ্রোহ লেগে থাকে। তাই সমর বাহিনীর ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে। তার পরেই স্থান হবে রাজস্ব সংস্কারের। দেশে বারবার দুর্ভিক্ষ হয়, এটা ঠিক নয়। তাই ভূমি সংস্কারও করতে হবে কিছু কিছু। খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। যা হোক, সেসব প্রথম দিকেই হবে না। তার আগে স্থির করা যাক কে কোন দিকটার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

সবাই নড়েচড়ে বসে। একটা গুঞ্জন ওঠে দরবার কক্ষে। নতুন সুলতানের প্রথম ভাষণে তারা আকৃষ্ট হয়। এভাবে সবাইকে ডেকে আলাউদ্দিন বা কুতুবউদ্দিন কখনো কিছু বলেননি। তখন দরবার বসত নিয়ম মাফিক। গিয়াসউদ্দিনের কথা শুনে প্রত্যেকের মনে হচ্ছে তাদের সবার একটা গুরুত্ব রয়েছে।

প্রথমেই বহরাম আইবাকে ডেকে তিনি বলেন-- আজ থেকে তোমার উপাধি হ'ল কিচলু খাঁ। কিন্তু তোমাকে একটু দূরে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে যেতে হবে। তুমি হলে মুলতানের শাসনকর্তা।

গিয়াসউদ্দিনের হুকুম একজন নবিস সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে নেয়। পরে হুকুমনামা হয়ে প্রকাশিত হবে। কিচলু খাঁয়ের খুব আনন্দ। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়।

এইভাবে নিজের পালিত পুত্রের উপাধি দিলেন তাতার মালিক। এক ভ্রাতুষ্পুত্র হ'ল মালিক আলাউদ্দিন। অপর ভাইপো হ'ল সেনাবাহিনীর উজির। উপাধি হ'ল মালিক বাহাউদ্দিন। জামাতা মালিক সাদির ওপর ভার পড়ল রাজস্বের অর্থাৎ দিওয়ান-ই-বিসারত। মালিক বারহাউদ্দিনকে করা হ'ল দিল্লীর কোতোয়াল। উপাধি হ'ল আলিম-উল-মুল্‌ক।

মালিক কাফুর উস্‌খুস্‌ করছিল। তার ওপর এখনো বিশেষভাবে কোন কাজের ভার দেওয়া হয়নি। সে ভাবে, আলাউদ্দিনের সর্বনাশ করার কথা নতুন সুলতানের মনে জেগে উঠেছে নিশ্চয়। তাকে তাই আপাতত এইভাবেই থাকতে হবে। কিন্তু বহুদিন পূর্ববর্তী সুলতানের পাশাপাশি থাকার জন্য সবার কাছে অপরিসীম গুরুত্ব পেয়ে পেয়ে সহসা মূল্যহীন হয়ে পড়লে খুব খারাপ লাগে। সে চারদিকে চেয়ে ভাবতে থাকে, এদের মধ্যে অনেকে দুবেলা এসে তোষামোদ করত তাকে যাতে সুলতানের নজরে পড়ে। তাদের মধ্যে একজন তো পাশেই বসে রয়েছে। অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছে যে জীবনে যেন তাকে আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু সে জানে না মালিক কাফুরের মস্তিষ্কে যা রয়েছে তা অনেকের মধ্যে নেই। সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে বলে— খোদাবন্দ, আপনি সবাইকে উপাধি আর পদবী বিতরণ করে খুশি করলেন। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে যে আপনার নিজের পুত্রেরাই অবহেলিত রইলেন। আজ সর্বাগ্রে তাঁদের উপাধি বিতরণ করলে আমরা সবাই সবচেয়ে বেশী আনন্দবোধ করতাম।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বুঝতে পারেন, মালিক কাফুর কেন আলাউদ্দিনকে ওভাবে বশীভূত করে ফেলতে পেরেছিল। মনে মনে তার তারিফ না করে পারেন না। পুত্রদের উপাধি না দিলে অনেকের কাছে এই দরবার অর্থহীন হয়ে পড়বে। জউনা ভাবে, লোকটা ধুরন্ধর। তাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না দেখে এভাবে নিজের প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। তবে তার কাছে ওসব কথার মারপ্যাঁচ কাজ দেবে না।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন মালিক কাফুরের উক্তির গুরুত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করেই বলেন— আমার কাছে পুত্রেরা প্রধান নয়। তারা আমার সবচেয়ে প্রিয় বটে, কিন্তু তাই বলে তাদের অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে নষ্ট করতে পারি না। রাজত্ব করতে হলে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হয়। পুত্রদের উপাধি না দিয়েই কি আমি আজকের দরবার শেষ করতাম নাকি? আপনারা কি বলেন?

সবাই মুচকি হেসে মালিক কাফুরের দিকে চায়। কাফুর বুঝতে পারে এই সুলতান অন্য চিজ। উল্টে তাকেই উপহাসের পাত্র করে তুললেন।

গিয়াসউদ্দিন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জউনাকে ডাকেন। জউনা সুলতানের সামনে গিয়ে দণ্ডায়মান হয়।

-- আপনারা জানেন, এ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। এর পরিচয় আপনারা কতটা পেয়েছেন আমার জানা নেই। নিজের পুত্র বলে বলছি না, এ অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে-- আমরা জানি সুলতান।

-- আমি একে আজ প্রথম দিনেই আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্দিষ্ট করে রাখতে চাই আপনাদের সবার সামনে।

সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

গিয়াসউদ্দিন বলেন-- আমার জ্যেষ্ঠপুত্র মালিক ফকরুদ্দিন জউনার উপাধি আজ থেকে উলাঘ খাঁ। পছন্দ হয়েছে আপনাদের?

-- চমৎকার। জবাব নেই।

বাকি চারপুত্রের উপাধি দেওয়া হ'ল যথাক্রমে বাহরাম খাঁ, জাফর খাঁ, মহমুদ খাঁ ও নাসরৎ খাঁ।

একসময় দরবার শেষ হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ায়। তিনি অন্দরের দিকে পুত্রদের নিয়ে প্রবেশ করলে বাকীরা আলোচনা করতে করতে সামনের রাজপথে গিয়ে নামে। তারপর নিজের নিজের আলয়ের দিকে রওনা হয়। তাদের সবার মনে একই ধরনের অনুভূতি-- যেন নতুন যুগের সূচনা হ'ল আজ থেকে। তারা যেন এতদিন অভিশপ্ত জীবন যাপন করছিল। আলাউদ্দিনের কথা তারা বিস্মৃত হয়েছে বহুদিন। কুতুব্‌উদ্দিনের কথাও আবছা হয়ে আসতে শুরু করেছে। এমন কি যে খুসরবের শোণিত এখনো বাজারের শাণ বাঁধানো চাতালে পড়ে রয়েছে-- সূর্যকিরণ এখনো যাকে হয়ত সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক করে তুলতে পারেনি তার কথাও মনের মধ্যে উঁকি দেয় না একবারও। সবার দৃষ্টি এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে, যে ভবিষ্যৎ তাদের নিরাপত্তা ও উন্নতির পথের ইঙ্গিত দেয়।

অন্দরের দিকে যেতে গিয়ে গিয়াসউদ্দিনের এবং তাঁর অন্য পুত্রদের নজরে কিছু না পড়লেও জউনার দৃষ্টি এড়ায় নি যে তাদের আসতে দেখে একটি নারী মূর্তি দ্রুত সয়ে গেল আড়ালে। জউনা একটু হাসে। সে অনেক আগে থেকেই মূর্তিটিকে লক্ষ্য করেছে। পর্দার আড়ালে বরাবর থেকে দরবারের প্রতিটি আলোচ্য বিষয় শুনেছে সে। খুব স্বাভাবিক। নারী না হলে সে-ও এসে বসত সবার মধ্যে।

ভেতরে গেলে বেগমসাহেবা তাদের আপ্যায়ন করেন।

জউনা হেসে প্রশ্ন করে-- মা, আজ তুমি নিজের হাতে শরবত দিচ্ছ কেন? আজ তো তোমার হাজার বাঁদী থাকবে। তোমার হুকুমে তারা তটস্থ হয়ে থাকবে।

গিয়াসউদ্দিনের মুখে হাসি ফোটে। তিনি বলেন-- যতই বেগমসাহেবা হোন তোমাদের মা, আমাদের কয়জনের ভার আর কারও ওপর ছেড়ে দেবেন না। কি বল,

ঠিক বলিনি?

কথাটা বলার পরই তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। সে আজকের মত দিনেও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না।

গিয়াসউদ্দিনের প্রথমা স্ত্রীর জন্য একটু কষ্ট হয়। শত হলেও তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের জননী যে পুত্র আজ থেকে পরিচিত হ'ল নাসরৎ খাঁ রূপে।

নাসরৎ সেই সময়ে বলে-- আমি একটু আসি।

বেগমসাহেবা বলেন-- না, তুমি বসো। আমি তোমার মাকে ডেকে আনছি। সত্যি, এ খুব অন্যায়।

একটু পরে তিনি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। গিয়াসউদ্দিন তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে খুব শান্ত স্বরে বলেন-- এতদিনে বোধহয় আমাদের পরিবারের অকিঞ্চিৎকরতা কিছুটা ঢাকা দিতে পেরেছি।

অনুতপ্ত নারীর আঁখিদ্বয়ে অশ্রু ছাপিয়ে ওঠে। নাসরৎ তার মায়ের হাত ধরে একটি আসনে বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুত্রেরাও তাঁকে ঘিরে ধরে।

জাফর বলে-- আমাদের দুই মায়ের কেউই ছোট কিংবা বড় নয়। অন্তত আমার কাছে নয়।

মহমুদ খাঁ বলে ওঠে-- আমার কাছেও নয়।

নাসরৎ-এর গর্ভধারিনী বলেন-- কিন্তু আমি তার যোগ্য নই। আমি তোমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম এতদিন।

-- আজ থেকে নতুন দিনের সূচনা হ'ল।

গিয়াসউদ্দিনের খুব কষ্ট হয়। ভাবেন, এই দিনটা কত বছর আগে আসতে পারত। তাহলে মনের মধ্যে একটা বোঝা এতদিন বয়ে বেড়াতে হ'ত না। সেই বোঝা কি এই অসময়ে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব? বোধহয় না। একটা উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে সাময়িকভাবে সবার দৃষ্টিভঙ্গীর হয়ত পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি প্রসঙ্গ পালটে হঠাৎ বলেন-- কিন্তু সে গেল কোথায়? সবাই আছে অথচ সে নেই।

একমাত্র জউনা বুঝতে পারে কার কথা বলছেন পিতা। সে হেসে বলে-- সে এতক্ষণ ধরে দরবারের পাশে পর্দার আড়ালে বসেছিল। আমাদের ভেতরে আসতে দেখে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

-- কার কথা বলছি বলতো?

-- আপনার একমাত্র আদরের কন্যা খুদাবন্দজাদার।

-- সে পর্দার আড়ালে বসেছিল?

-- হ্যাঁ। সব শুনেছে আগাগোড়া।

সেই সময় খুদাবন্দজাদা নিজেই সামনে এসে বলে-- হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। কিন্তু

আমার উপাধি কোথায়?

সবাই হেসে ওঠে।

-- হাসির কি ঘটল? আমার কোন উপাধি কি প্রাপ্য নয়? কেন মেয়ে বলে?

সুলতান তাকে শান্ত করে বলেন-- নিশ্চয় প্রাপ্য। কিন্তু তোমার পুত্র নাবালক। উপাধি দেব তাকে। তোমার এত সুন্দর নাম থাকতে নতুন উপাধি কেন আবার? তবু তোমার তেমন সাধ থাকলে নিজেই ঠিক কর কোন্ উপাধি পছন্দ তোমার।

খুদাবন্দজাদা ফাঁদে পড়ে যায়। সে আর কিছু বলতে পারে না।

গিয়াসউদ্দিন মনে মনে হাসেন। এভাবে তাঁকে ছোট বড় সব সমস্যার সমাধান করতে হবে অল্পসময়ের মধ্যে। বয়স তাঁর যথেষ্ট হয়েছে। নিজে ব্যাভিচারী নন, অন্যের ব্যাভিচারিতা সহ্য করতে পারেন না। স্বল্পাহারী। জীবনের বাকি দিনগুলো যাতে নীরোগ অবস্থায় থাকেন, সেই চেষ্টা তাঁর। পাঁচ বছরও বাঁচতে পারেন, আবার পনেরো বিশ বছরও বেঁচে যেতে পারেন। তার বেশি কখনোই নয়। বিশ বছর বেঁচে থাকার কথা ভাবা একটু বেশি বেশি হয়ে যায়। যে ক'দিনই বাঁচুন অথর্ব না হয়ে যান। অক্ষম হয়ে পড়তে বড় ভয়। ছুটন্ত ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে যেভাবে মরে সেভাবে মরার সুখ আছে। এক মুহূর্ত আগেও জানা যায় না, দিন শেষ হয়ে আসছে। শৈশবে সুলতান জালালউদ্দিন খিলজীর একটা পাটকেল রঙের অশ্বকে ছুটন্ত অবস্থায় ওইভাবে পড়ে মরতে দেখেছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন ঠিক করেছেন অল্প কিছুদিনের মধ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভেবে নিতে হবে চার পাঁচ বছরের বেশি তিনি সময় পাবেন না। সাধারণভাবে মানুষের আয়ু তার চেয়ে বেশি হয় না।

দিনের বেলায় কাজের ফাঁকে জ্যেষ্ঠ পুত্র জউনার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেলেন তিনি। তার ওপর তাঁর ভরসা রয়েছে। জউনার অজ্ঞাতে তার দিকে চাইলেও মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যান। লজ্জিত হন। বুঝতে পারেন জউনা এটা পছন্দ করে না। কিন্তু কি করবেন, বৃদ্ধ হলে সব মানুষই বোধহয় তার পরবর্তী বংশধরের দিকে ওভাবে তাকায়। কারণ ওরাই ভবিষ্যতের দিকে বংশের ধারা বয়ে নিয়ে যাবে। বংশকে আরও উন্নত করে তুলবে এই আকাঙ্খাই থাকে বৃদ্ধ পিতাদের। জউনা অসন্তুষ্ট হলে কি হবে? সে নিজে বৃদ্ধ হোক, সেও ওভাবে অলক্ষ্যে চেয়ে তাকাবে তার উত্তরাধিকারীর দিকে। বেগম সাহেবা বলছিলেন, মনে হচ্ছে জউনার বৃদ্ধ বয়সে চেয়ে চেয়ে দেখার বস্তু নববধূর মধ্যে এসে গিয়েছে। আর আট নয় মাস পরে তিনি নিজেও নাতির মুখ দেখবেন সম্ভবত। মেয়েও হতে পারে অবশ্য। হোক ক্ষতি নেই। সময় পড়ে রয়েছে। জউনার বেগম বেশ সুন্দরী। না হলে উপায় ছিল না। ও অসুন্দর একেবারে পছন্দ করে না শৈশব থেকে। সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার কোলে চেপে বসত। অসুন্দরদের

ছায়া মাড়াত না। সেটাই নিশ্চয় থেকে যায় যৌবনে। তখন তো আর কোলে চাপতে পারে না। তবে সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল নয়, তাকে অসংযমী বলে মনে হয় না আপাতদৃষ্টিতে। তাহলে তো অনেক খবরই পাওয়া যেত এতদিনে। মারাত্মক কিছু করলে কি চাপা থাকত?

প্রতিদিন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে সেই বিশেষ স্থানটিতে। অথচ সেটি মসজিদ বা দরগা নয়। তবু কিসের আকর্ষণ? বিশেষ এক ব্যক্তি থাকেন সেখানে। তাঁকে কোন পরিচয়ে পরিচিত করা যেতে পারে? সুফী? না সন্ত্? কিংবা ফকির বা দরবেশ? তেমন একজন কেউ হবেন।

জউনা বা উলাঘ খাঁ এই ধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশতে খুব ভালবাসে। সে শহরে ঘোরে, আবার গ্রামেও যায়। নির্জন পাহাড়ে কিংবা গঞ্জে যেখানেই ফকির কিংবা সাধুর সাক্ষাৎ মিলবে সে তার সঙ্গে কথা বলবেই। এমনকি এমনও হয়েছে দু'একদিন কাটিয়ে দিয়েছে তাঁদের সান্নিধ্যে। ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে। এঁদের মধ্যে মুসলমান যেমন আছেন, তেমনি হিন্দুও রয়েছেন। এই ধরনের সতত বিচরণশীল ফকির কিংবা সাধুরা যে ধর্মেরই হোন না কেন তাঁদের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। সেই মিলটা হ'ল তাঁদের উদারতা। ধর্মকে তাঁরা কঠিন কঠোর নিগড় বলে ভাবেন না। সেই দিক দিয়ে তারা গোঁড়া নন। উলাঘের এটা খুব ভাল লাগে। সে আরও কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছে যাঁদের দার্শনিক বলে খ্যাতি রয়েছে। কেউ কেউ আবার কবিতা লেখেন। এঁদের সঙ্গে মিশতে মিশতে উলাঘের মনোভাব আর পাঁচজনের মত থাকে না। সে ধর্মের মধ্যে গোড়ামি দেখলে বিরক্ত হয়। এমনকি ধর্মের অনেক কিছু বিষয়ে তার বিশ্বাস টলে যাওয়ার উপক্রম হয়। তবে সেই মনোভাব সে ব্যক্ত করে না। সে জানে গোঁড়া মুসলমান সঙ্গীত পছন্দ করে না। নৃত্যগীত তাদের চক্ষুশূল। কিন্তু সে আকর্ষণ অনুভব করে।

দিল্লীর যে স্থানে অনেক ভক্তের সমাবেশ হয় প্রতিদিন, উলাঘ খাঁ সেখানেও যায়। কারণ সেখানে যিনি থাকেন তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং বিখ্যাত। তিনি হলেন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া। আমীর ওমরাহ্ কবি পর্যটক থেকে শুরু করে দীণতম ব্যক্তি সবাই তাঁর কাছে যায়। তাঁর মুখের কথা শুনে তাদের মন ভরে যায়। অনেক উপকারও পায় তারা। তিনি যে সাধারণ মানুষ নন, তার বহু প্রমাণ অহরহ মেলে। এত দেখেও উলাঘ খাঁ কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে দু'দণ্ড বসেনি। কারণ কোনসময় তাঁকে নির্জনে একা পাওয়া যায় না। যেখানে এত মানুষের সমাগম সেখানে সে আকর্ষণ-অনুভব করে না। সে জানে যে যত উঁচু দূরের ফকির হোন না কেন, এঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলা যাবে না। যখন ইনি কিছু বলবেন তখন ভিড়ের মধ্যে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে শুনতে হবে।

সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করলে হয়ত তিনি উত্তর দেবেন। কিন্তু কি লাভ তাতে ? নিজের জ্ঞানস্পৃহা তাতে মিটবে না। নিজের গোপন কথা সবার কাছে প্রকাশ করা মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। তাই উলাঘ খাঁ সেদিকে যায় না।

কিন্তু শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া তো অন্য কেউ নন, তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়াই। বিদেশ থেকে অবধি অনেক ভক্ত আসে তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এহেন একজন সাধকের নিকট একদিন নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ফরমান গেল যে এতদিন তিনি পদচ্যুত ও নিহত লুণ্ঠনকারী সুলতান খুসরব খাঁয়ের কাছ থেকে যত মোহর এবং সামগ্রী দান অথবা উপহার হিসাবে পেয়েছেন সমস্ত কিছু অনতিবিলম্বে প্রত্যার্পণ করতে হবে। ফরমান পেয়ে ভক্তকুলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এ কি করলেন সুলতান! এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে ? তিনি সজ্ঞানে এমন কাজ করলেন? নাকি কারও প্ররোচনায় এমন কাজ হ'ল? সুলতানকে তো সাচ্চা মুসলমান বলেই জানে লোকে। সমস্ত রাজধানীতে একই আলোচনা-- সুলতান ফরমান পাঠিয়েছেন আউলিয়াকে। এটা কি ভাল হ'ল? যাঁকে পাঠানো হল তিনি কি এই জগতের মানুষ? তাঁকে কে কি দিয়েছে তিনি নিজে কি খোঁজ রাখেন তার? তাঁর সম্বল তো শুধু ঈশ্বর চিন্তা। না না, এটা ঠিক হল না। সুলতান মস্ত ভুল করলেন।

দু'দিন পরে জানা গেল, অনেক ভেবে চিন্তে স্থির মস্তিষ্কে সুলতান এই হুকুমনামা জারি করেছেন। তিনি দেখেছেন খুসরব খাঁ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেপরোয়াভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অকাতরে অর্থ এবং অনেক কিছু বিলিয়ে দিয়ে রাজকোষ নিঃশেষ করে ফেলেছে। অর্থাভাবে কোন কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। বাইরে থেকে মোঙ্গলরা বারবার হুমকি দিচ্ছে। যে কোন দিন সত্যই হানা দিতে পারে। ওদিকে বঙ্গে সোনার গাঁ ও লক্ষণাবতীতে বিদ্রোহের অগ্নি ধূমায়িত। ওরা কোনদিনই দিল্লীর প্রতাপ মানতে চায় না। এদিকে তেলেঙ্গানায় সেই পুরোনো বিদ্রোহ। সৈন্য কোথায়? তাদের গড়তে হলে অর্থের প্রয়োজন। খুসরব খাঁ শেষ করে দিয়ে গিয়েছে সব। তাই সমস্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য এই আদেশ। অনেকে দিল। কিন্তু নিজামুদ্দিনের বৈভব তো তাঁর মনে। বাইরের বৈভব নিয়ে তিনি নিজে নাড়াচাড়া করেন না। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে কিছুই ফেরৎ গেল না। গিয়াসউদ্দিন চটে গেলেন। প্রশাসন কার্যে কোনরকম গাফিলতি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। প্রশাসনকে সুষ্টুভাবে চালাতে তিনি কাউকে রেয়াত করেন না। যা অন্যায় তা অন্যায়। সেখানে সাধুসন্ত বা হিন্দু মুসলমান বলে কোন কথা নেই। সুলতান কুতুব্উদ্দিন মুবারক শাহের

হত্যা-ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত ছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেককে কঠোরতম শাস্তি তিনি দিয়েছেন।

কনিষ্ঠপুত্র নাসরৎ খাঁ এসে তার গর্ভধারিনীকে এই সংবাদ দিল। শুনে তিনি চমকে ওঠেন। নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে বিদেশীরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করে। তাদের মধ্যে পারস্য ও তুরস্কের বহু মানুষ রয়েছে। স্বামীর অমঙ্গলের আশঙ্কায় এতদিনে সত্যই তুর্কী বেগম বিচলিত হলেন। তাঁকে সাবধান করা প্রয়োজন। কিন্তু স্বামীর সাক্ষাৎ তিনি তত সহজে পান না যতটা পান তাঁর সপত্নী। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করলে সবই পাওয়া যায়। এই বয়সে তো তাঁর অন্য কোন চাহিদা নেই। শুধু যাঁকে এককালে অবহেলা করেছেন তাঁর মঙ্গলাকাঙ্খা।

গিয়াসউদ্দিন তাঁর প্রথম পত্নীর আবির্ভাবে বিস্মিত হন। বলেন— হঠাৎ?

— কথা ছিল।

— এক সময় আমার অফুরন্ত কথা ছিল। বলা হয়নি। কথা গুলো ফুরিয়ে যায়নি। শুকিয়ে গিয়েছে।

— জানি। আফশোষে আমার চোখের জল ঝরে ঝরে ফুরিয়ে গিয়েছে। শুকিয়ে যায়নি।

— বল।

— শুনলাম, নিজামউদ্দিন—

— হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ। এ বিষয়ে শেষ কথা বলা হয়ে গিয়েছে।

— কিন্তু তোমার অমঙ্গল হবে। তুমি জান না—

— আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। কী আর অমঙ্গল হবে?

— তোমার অমঙ্গল বলতে শুধু কি নিজের কথা ভাব? তোমার সন্তানেরা, তাদের কিছু হতে পারে।

— তাহলে বুঝতে হবে তিনি আমাদের মত পার্থিব জীব। প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে ছাড়েন না।

— ভুল বুঝছো। তিনি কিছু করবেন না। কিন্তু তাঁর অসংখ্য ভক্ত রয়েছে, যাদের সবাই সজ্জন নয়। তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারে। অনেকে ভীষণ রকমের গোঁড়া।

— তুমি যা বলছ, আমি নিজেও সেকথা ভেবেছি। কিন্তু উপায় নেই। এভাবে অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে আমি পারব না। কপালে যা থাকে তাই হবে। এভাবে চলা আমার স্বভাবে নেই। নিরাপত্তার জন্য অর্থের প্রয়োজন।

— এই একটা অনুরোধই করেছিলাম তোমাকে সারা জীবন।

— তাহলে শুনে রাখ, সেই প্রথম যখন তোমাকে পেয়ে ভেবেছিলাম পৃথিবীতে

আর কাউকে চাই না, শুধু তুমি আমার কাছে থাকলেই হবে, তখনও এই অনুরোধ করলে রাখতে পারতাম না। জানি তুমি আমার এবং আমার পুত্রদের মঙ্গল চাও। কিন্তু উপায় নেই। বরং তুমি অন্য কোন অনুরোধ কর।

বিষণ্ণ হেসে তুর্কী বেগম বলেন — অন্য অনুরোধ? কি অনুরোধ? লাভ?

তিনি স্থান ত্যাগ করেন। গিয়াসউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে তেলেঙ্গানা বরাবরের সমস্যা দিল্লীর সুলতানদের কাছে। এই অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা কম বলে বোধহয় বারবার বিদ্রোহ হয়। অবশ্য সেটা একমাত্র কারণ না হতে পারে। যে অঞ্চলে অনেক মুসলমান রয়েছে সেখানেও আকছাড় বিদ্রোহ হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে তেলেঙ্গানায় এক বিশেষ ব্যক্তির জন্য আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। সেই ব্যক্তি হ'ল সেখানকার অধিপতি রায় লুদ্দার দেও। সুলতান আলাউদ্দিনের সময় একবার তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। আলাউদ্দিন সেবারে তাঁর পেয়ারের মালিক কাফুরকে পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে। সেই কাফুর এখন আবার নতুন সুলতানের আজ্ঞাবহ এবং বশংবদ। সেবারে আলাউদ্দিনের আদেশ ছিল লুদ্দারকে ধ্বংস না করলেও চলবে। সে যদি সন্তোষজনক শর্তে সম্মত হয় তাহলে আর বেশীদূর অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ ছিল। ওখানে অনর্থক বিশাল বাহিনী আটকে রেখে লাভ নেই। কারণ যখন তখন সীমান্তে তো বহিঃশত্রুর আক্রমণ লেগেই আছে। তেমন হলে অসুবিধা দেখা দেবে। মালিক কাফুর তেলেঙ্গানার রাজধানী ওয়ারঙ্গল অবরোধ করে রাজা লুদ্দারকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেছিল। আর সেই সন্ধির ফলে সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে কাফুর এবং তার নিজের দলের লোকজনও সম্পদশালী হয়ে ফিরেছিল। দিল্লীতে ফিরেই সে প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকা নির্মান করেছিল। তাছাড়া জমিজিরাৎও করেছিল অনেক। আলাউদ্দিনের চোখের সামনে সব ঘটলেও তিনি তো তখন কাফুর বলতে অজ্ঞান। তবে অন্য অনেকের চোখ টাটিয়েছিল। ফলে পরবর্তীকালে কাফুর অতি সহজেই বশ মেনেছিল। কারণ সে জানত জমানা পাল্টালে তাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য পরাক্রমশালীর নিকট আশ্রয় নিতে হবে। বিশেষ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের নিকট তার কোন কুকীর্তিই অজানা নয়। সুতরাং বেঁচে থাকতে হলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাস্তববাদী মানুষ। কোনরকম আবেগকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। তিনি ঠিক করে ফেলেন, কাফুর যেমনই হোক তেলেঙ্গানা বিষয়ে অভিজ্ঞ। লুদ্দারকে বশীভূত করেছিল সে প্রায় এগারো বছর আগে। এইবারও তাকে পাঠাতে হবে। তবে স্বাধীন ভাবে নয়, জ্যেষ্ঠপুত্র উলাঘ খাঁয়ের অধীনে। এই সুযোগে ভবিষ্যৎ সুলতানের যুদ্ধ সম্বন্ধে হাতেখড়ি হয়ে যাবে।

মালিক ছাড়াও আরও অভিজ্ঞ এবং কর্মতৎপর যুদ্ধবিশারদ পাঠানো হ'ল উলাঘের সঙ্গে। এদের মধ্যে মালিক তমর, মালিক তিগির, মালিক মল আফগান রয়েছেন। আর উলাঘ খাঁ তার সঙ্গে সঙ্গীরূপে কোন কবি সাহিত্যিক বা দার্শনিক গোছেরে না পেলে অস্বস্তি অনুভব করে। তার মনে হয় সবই রয়েছে অথচ কিছুই নেই। লবন বিহীন খাদ্যবস্তু যেন। তাই কবি উবেইদ এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার এক ভক্ত সাদউদ্দিন মনতিক্‌কে সঙ্গে নিল। শুধু যুদ্ধ আর রক্ত — অন্য কিছু নেই — ভাবতেও পারে না সে।

যাত্রার আগের রাতে দীর্ঘক্ষণ পিতার সঙ্গে আলোচনা করার পর নিজের বেগমের কথা মনে পড়ে যায় উলাঘ খাঁয়ের। নতুন সর্বাধিনায়ক হওয়ার উৎসাহে এতক্ষণ নিজের বেগমের কথা একবারও মনে পড়েনি। যদিও তার উৎসাহের ছিটেফোঁটাও বাইরে প্রকাশ পায়নি। অমন দীর্ঘক্ষণ ধীর গম্ভীরভাবে সবকিছু যেভাবে সে আলোচনা করছিল তাতে স্বয়ং সুলতানও কম অবাক হন নি। ভাবছিলেন, রাত পোহালেই তো যাত্রা শুরু, তবু নিজের বেগমের কাছে যাচ্ছে না কেন ছেলেটা? এই বয়সে তিনি নিজে অমন নির্বিকার থাকতে পারতেন না। এরপর তো দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। যুগ পাল্‌টে যাচ্ছে। স্ত্রী পুত্র সন্তান সন্ততির ওপর টান বোধহয় কমতে শুরু করেছে। এখন বোধহয় সবাই বাইরের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি বেশী মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এভাবে চলতে থাকলে সৃষ্টিশীল পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকলে হয়। যা কিছু স্বভাব বিরুদ্ধ তাই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

বেগমের কথা মনে পড়ে গেলেও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায়নি তার মধ্যে। পিতাকে নিয়ম মাফিক অভিবাদন জানায় সে — একজন সেনাধ্যক্ষ সুলতানকে যেভাবে অভিবাদন জানায়, ঠিক সেইভাবে। তারপর নিজের কক্ষের দিকে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে বেগম অকাতরে ঘুমোচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। হয়ত অনেকক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে ধৈর্য ধরে জেগে বসে ছিল। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীর তো ভাল নেই।

বেগম বুঝতে পারে উলাঘ কখন ঢুকল। সে ঘুমের ভান করে থাকে। উলাঘকে কখনও সে প্রেমে পাগল হতে দেখেনি। অন্য পুরুষ সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। কতই বা বয়স তার। তেমন কোন বিবাহিত সখীও তার ছিল না কখনো যার কাছ থেকে বিবাহিত জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনবে। স্বামীকে দেখে সে ভাবে সবাই বুঝি এইরকম হয়। মেয়েদের মত ওরা মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করে না। কিন্তু বাইরের অনেক ঘটনার কথা শুনে পুরুষদের প্রতি তার অন্য রকমের ধারণা ছিল। উলাঘের বেগম হয়ে সেই ধারণা যেন পাল্টাতে বসেছে। সখী না থাকলেও হারেমের দাসী-বাঁদীরা রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে অশ্লীলভাবে নানা আলোচনা করে, যা তার কানে

আসে। তার অধিকাংশই নারীদের প্রতি পুরুষদের লালসার কথা। তখন ভাবে এসব বোধহয় গল্পকথা। নিজেদের খেদ মেটাতে উল্টোকথা বলে। লায়লা-মজনুর কাহিনী কত শুনেছে। লায়লা অমন হতে পারে এই বিশ্বাস তার পুরোমাত্রায় আছে। কিন্তু মজনু? বোধহয় নয়। গল্পকে আকর্ষণীয় করার জন্য মজনুকে অমন প্রেম-পাগল করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষেরা সত্যই অমন হলে কি ভালই না হতো।

মাঝে কয়েকদিন মুখে জল উঠেছিল খুব। বমিও হয়েছিল এক আধদিন। তারপর অরুচি। সবাই বলছে, এমন হয়। মা হওয়ার বিনিময়ে এসব কিছুই নয়। ওদের কথায় মনে হয় মা হওয়া যেন কত গর্বের। তার তেমন কিছুই মনে হয় না। সে শুধু উলাঘকে পেতে চায়, আরও নিবিড়ভাবে পেতে চায়। কিন্তু তা তো হবে না। কালই সে আবার দূরে চলে যাচ্ছে। কতদিনের জন্য কে জানে। এতক্ষণে তার কাছে এসেছে। তার কথা মনে পড়েছে। উলাঘ ঝুঁকে পড়ে তার মুখের ওপর। বুঝতে পারে মৃদু আলোয় সে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার নিঃশ্বাস গালে এসে পড়ছে। খুব ভাল লাগছে, বেশ গরম গরম। অবশেষে উলাঘ তাকে চুম্বন করে, সে আর পারে না। দুবাহু তুলে উলাঘের গলা জড়িয়ে ধরে।

— ও, তুমি জেগে ছিলে?

— তুমি এত দেরি করলে কেন ?

— অনেক কাজ। আমার সঙ্গে কতবড় ফৌজ কাল রওনা হবে জান ?

— শুনেছি, তাতে আমার কি? আমাকে তো একা একা থাকতে হবে। কতদিন কে জানে?

— দেখো কিছুদিনের মধ্যেই ওই ওয়ারঙ্গলের রাজাকে খতম করে দিয়ে ফিরে আসব। ফিরে এসে কি দেখব ?

— কি আবার!

— দেখব তোমার কোলে একটি শিশু।

— যাও।

— কত আনন্দ হবে তখন। আমি জানি পুত্র হবে। তার নামও দিয়েছেন এক ফকির। তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন সেই নাম রাখলে আমাদের পুত্রের অনেক খ্যাতি হবে।

— কি নাম ?

— এখন নয়, ফিরে আসি আগে।

কথাটা শুনেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে বেগমের। ভাবে, যুদ্ধে যাচ্ছে স্বামী। সেখানে মানুষের জীবন কত অনিশ্চিত । তার কান্না পায়। তবু সংযত থাকে।

— কি হ'ল, চুপ করে আছ কেন?

— তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে?

— ও, তাই তো!

উলাঘ খাঁ বেগমের পাশে শুয়ে পড়ে তাকে বুকে টেনে নেয়।

বেগম বলে — নামটা বলো। আমি কাউকে বলব না।

— ঠিক ?

— ঠিক।

— নামটা যেন ফকিরের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। আমারও খুব ভাল লেগে গেল। তারপর থেকে হাজার বার ওই নাম মনে মনে আওড়েছি। অনেক সময় সুর করে করে গুন্ গুন্ করেছি। আমি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সুলতান হ'ব। আর আমি সুলতান হলে সে-ও হবে।

— কিন্তু নামটা কি ?

— ফিরোজ।

— বাঃ, সুন্দর।

— বলেছিলাম না ? আর সুলতান হলে কি নাম হবে?

— কি নাম হবে ?

— একবার ভাবলাম ফিরোজ সুলতানী। তারপর ভাবলাম, নাঃ সুলতান শাহ্-ই ভাল। তবু পছন্দ হ'ল না। বড্ড ছোট বলে মনে হতে লাগল। একটা গালভরা নাম দিতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে দিলাম, আবুল মুজাফ্ফর ফিরোজ শাহ আস-সুলতানি। ভাল না? আমি বেঁচে থাকি আর না থাকি, তোমার ওপর ভার রইল এই নামটা যেন রাখা হয় ও সুলতান হলে।

— বেগম কেঁদে ওঠে।

— ও হো, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আর বলব না। তবু তোমাকেই তো সব কথা বলে রাখতে হবে। সুলতান আর সুলতানের পুত্রদের জীবন বড় অনিশ্চয়তায় ভরা, একথা অস্বীকার করা যায় না।

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা শুরু। অনেক জায়গা থেকে সৈন্যদল সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল চন্দেরী, বুদাউন আর মালব। তাই বাহিনী বেশ বড় সড় হয়েছে। আগে থেকে জানা ছিল বলে শহরবাসীরা অনেকে রাজপথে দেখতে এসেছে। কোথায় কোন্ রাজ্য দখল করতে চলেছে এরা সেই খবর অনেকে জানেনা। দখল করলেই বা কি আর না করলেই বা কি। হাতির পাঁচ পা দেখবে না কেউ। তবে এত লোক শহরের আশেপাশে এসে থাকায় দোকানপাটের বিক্রিবাটা ভাল চলছিল। এইটুকু লাভ। তাছাড়া এতলোককে একসঙ্গে মোটামুটি ভাবে পা মিলিয়ে চলতে

দেখতে ভালই লাগে। এক এক দলের হাতে এক এক ধরণের অস্ত্র। এত লোকের জন্য প্রচুর রসদ লাগে। তাই সঙ্গে ঘোড়া গরু আর মোষের গাড়ি চলেছে পরপর। তাছাড়া অশ্বারোহী রয়েছে। হাতি দেখা গেল না। কেউ কেউ সেই প্রশ্ন উত্থাপন করলে নিজেদের যারা বিজ্ঞ বলে ভাবে, তারা বলল দেবগিরি থেকে হয়ত নেওয়া হবে।

দেবগিরি থেকে হাতি নেওয়া হোক বা না হোক আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করা হ'ল। তারপর মূল অভিযান শুরু হ'ল তেলেঙ্গানার রাজধানী ওয়ারঙ্গলের দিকে।

রাই লুদ্দার দেও-এর রাজধানী খুব সুরক্ষিত। এক কথায় বলা যায় দূর্গ নগরী। নগরী পর পর দুইটি প্রাকারে বেষ্টিত। বাইরের প্রাকার প্রস্তর নির্মিত। ভেতরে প্রবেশ করতে হলে সেই প্রস্তর প্রাকারের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তারপর সেটি অতিক্রম করে কিছুটা পথ। গিয়ে আবার একটি প্রাচীর। সেটি মৃত্তিকা নির্মিত। নামেই মৃত্তিকা, আসলে যথেষ্ট শক্ত। বিশেষ ধরণের মাটি দিয়ে তৈরী।

উলাঘ খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শহরের নিকটে পৌঁছে শিবির স্থাপন করতে বলে। তারপর মালিক কাফুরকে ডেকে পাঠায়। কাফুরের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে এলে তাকে এগারো বছর আগে যেভাবে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল সেইভাবে সৈন্যদের সাজাতে বলে। মালিক কাফুর আনন্দে আত্মহারা হয়। এতদিনে তার গুরুত্বকে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন সুলতান জাদা। সেও তার কৃতিত্ব দেখাতে পিছপা হবে না। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেড় দিনে শহরটিকে ঘিরে ফেলল সে। তখন উলাঘ খাঁ অন্যান্য সেনানায়কদের নিয়ে সেটি পরিদর্শন করার সময় লক্ষ্য করল, মালিক কাফুর প্রায় নির্ভুল কাজ করেছে। মনে মনে তার তারিফ না করে পারে না। তবু অন্যান্য সেনানায়কদের সামনে সে কয়েকটি জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করে দিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করল। কাফুরকে একেবারে প্রথম থেকে মাথায় চড়তে দেওয়া যায় না। তাই প্রথমেই সবার সামনে একটু দাবিয়ে দিল। সেনাপতিরাও বুঝল, উলাঘ খাঁ চোখ বুজে সব কিছু মেনে নেওয়ার পাত্র নয়। নিজের মতামত প্রকাশ করতে জানে এবং সেই সময় কারণ দেখিয়ে প্রমাণ করে যে পরিবর্তনটা করা হয়েছে ভালোর জন্য। মালিক কাফুর সেই পরিবর্তনে বাধা না দিয়ে মেনে নেয়। কারণ পরিবর্তনগুলো সত্যিই যথেষ্ট কার্যকরী। সে বুঝে উঠতে পারে না উলাঘ খাঁ এই বিষয়ে কোথায় শিক্ষা পেল। স্বয়ং সুলতানের কাছে যে সে শিক্ষা পেয়েছে একথা কে-ই বা জানে। দিনের পর দিন শহরের উপকণ্ঠে তার ঘাম-ঝরা পরিশ্রম বিফলে যাওয়ার জন্য নয়। সুলতান অনেক দিন বলেছেন, ধর এটা শত্রুদের শহর, এটাকে অবরোধ করতে হবে। কি করবে তখন তুমি? এলাকা ঘুরে ঘুরে খুঁটিনাটি সব বলে বুঝিয়েছেন। কোথায় কিভাবে সৈন্য সমাবেশ করতে হবে নিজের হাতে শিখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, পেছন থেকে যাতে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকে সেদিকে সব চেয়ে বেশী নজর রাখতে

হবে। সেই সব দিনের শিক্ষা দু একজনের চোখে পড়ে গেলেও সবটুকু নয়। তাছাড়া উলাঘের বাউন্ডুলে স্বভাব সবার চোখে বড় বেশী প্রকট ছিল। তারা দেখত পথে-ঘাটে, সাধু-সন্তদের আশেপাশে সে ঘুরঘুর করছে। অনেক সময় হিন্দু সাধুদের গাঁজার আড্ডাতেও তাকে দেখা যেত। বসে বসে তাদের কথাবার্তা শুনছে। তাই সেই সময় তার অন্য একটা দিক সবার অগোচরে থেকে গিয়েছে। ধরা পড়ল যখন কুতুব্উদ্দিন শাহ্ তার পিতাকে দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও সুলতানের অশ্বশালার আমীর-ই-বাইল নিযুক্ত করলেন। একজন মানুষের বহুমুখী তৎপরতা না থাকলে এই অল্প বয়সে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ পদে কখনো বৃত হতে পারে না। সেই দিনই প্রথম আমীর, মালিক, সিপাহী, শহরবাসী সবার দৃষ্টি খুলল। তারা উলাঘ খাঁকে চিনতে পারল।

দিল্লী থেকে এত দূরে এত বড় সৈন্য বাহিনীকে নিয়ে দিনের পর দিন বলতে গেলে বসে থাকলে রক্তক্ষয় হয় না বটে, তবে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। দিন যত যায়, এই অসুবিধাগুলো তত জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। প্রথমতঃ ফৌজের লোকেরা নিষ্কর্ম্মা হয়ে পড়ে। ঘোরো ফেরো খানা পাকাও আর নিদ যাও। ফলে তাগড়া মানুষগুলোর মস্তিষ্কে নানারকম দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। আশে পাশের গ্রামের যুবতীদের দিকে নজর পড়ে। এই ধরণের নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করে। উলাঘ খাঁ প্রথম থেকেই ঠিক করে, এই সব দুষ্কর্ম একেবারে বন্ধ করা না গেলেও যতটা সম্ভব আয়ত্তে রাখতে হবে। তাই সে ঘোষণা করে দেয় বাহিনীর যারা যে সব কসরত জানে তার প্রদর্শন হবে প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে। কৃতিত্ব দেখাতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। সেই সঙ্গে গ্রাম-গঞ্জ থেকে তুলে আনা লোকেদের সুশৃঙ্খল করে তুলতে কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হয়। ওদের অনেকে বর্শা দিয়ে শূকর শিকার করেছে, কেউ কেউ টাঙ্গি দিয়ে ভালুক শিকার করেছে। বাঘের সঙ্গেও মোলাকাত করেছে দা-কুঠার দিয়ে। তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ অনেকে। কিন্তু সবরকম অস্ত্রের সমন্বয়ে সু-শৃঙ্খল একটা সৈন্যদল গড়ে তোলার সময় তো পাওয়া যায় নি। কোথাও অভিযানের সময় সেই সুযোগ সুবিধা সাধারণত মেলে না। ফল অনেক সময় বড়ই বিপরীত হয়। এখানে সুযোগ মিলেছে এদের একটা পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসার। তাই কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা। এদের মতিভ্রম তাতে কম হবে। সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না কখনো। দেশে ফেলে আসা আওরতদের মুখ আর ক'দিন মনে থাকে? প্রতিটি শিরা উপশিরা প্রথমে একটু চঞ্চল হয়। একটা তিড়বিড়ে ভাব। সেই সময় বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একটু ভাবনা চিন্তা বিবেকের পরামর্শে অপরাধবোধ একটু একটু খোঁচা দেয়। তারপরই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ। তখন ওদের শাসন করা নিরাপদ নয়। তার চেয়ে মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখার চেষ্টা করা শ্রেয়। এদের আর দোষ কি ? যে সব মালিক,

আমীররা রয়েছে তারাই ছুঁকছুঁক শুরু করেছে। তারা তো আর রাস্তার ধারের মেয়েদের হাত ধরে টানতে পারে না। তাই অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দূরে। কেউ ফেরে গভীর রাতে, কেউ ফেরে ভোর রাতে। পরদিন তাদের মুখ দেখলে বোঝা যায় আগের দিন কেমন কেটেছে। একজন তো ফিরলোই না। সবাই কি অর্থে বশ হয়? আবার সব অত্যাচারিতার স্বামী কিংবা আত্মীয়রা নির্জীব বা নিরীহ হয় না। অনেকে বলিষ্ঠ হয়। আত্মসম্মানবোধ থাকে প্রখর। তেমন লোকের পালটানে পড়লে মালিক আশরফের অবস্থা হয়। তার ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া গিয়েছিল সৈন্যদের ছাউনি থেকে অনেক দূরে পথের ধারে। দেহটাকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা হয়নি। সৈন্যরা ক্ষেপে উঠেছিল প্রতিশোধ নিতে। উলাঘ খাঁ তীব্র আপত্তি জানিয়ে হুকুম জারি করেছিল। বলেছিল, দলবদ্ধভাবে এসব চলবে না। রাজধানীর আশেপাশের মানুষদের চটালে ওই সব পথে রসদ আসার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে ওরা। তার লোকেরা নিজেরাই ঘোরতম অন্যায় করছে। অথচ চোট পেলে প্রতিশোধ নিতে চায়। ওসব চলবে না। এখানে এত সৈন্য নিয়ে আসার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হ'ল অবরোধে সফলতা অর্জন। যারা চরে খাচ্ছে, তারা অন্যায় করছে। সৈন্যদের তবু কিছুটা সামলানো যায়। কিন্তু উচ্চপদের মানুষদের ঠেকানো কঠিন। তারা নিজেদের এলেমে যা করে করুক, কিন্তু ফেঁসে গেলে দলবদ্ধভাবে প্রতিশোধ নেওয়া চলবে না।

মালিক আশরফকে গোর দেওয়া হ'ল। পরদিন আরও দু'জন মারা গিয়েছিল। তবে তারা রোগগ্রস্থ হয়েছিল। মালিক আশরফের মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে তার পরমাসুন্দরী স্ত্রীর কাছে পাঠানো হ'ল। সুন্দরী বলে নামডাক আছে আশরফের বেগমের। বয়সও খুব কম। উলাঘ জানে তার মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছানো মাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে অন্য আশরফেরা ওই সুন্দরীর দিকে এগিয়ে আসবে তাকে পাওয়ার লোভে। সুন্দরীরা সাধারণত অভিশপ্ত হয়। তাদের মন বুঝতে চায় না কেউ, দেহ নিয়ে টানাটানি।

দিল্লী থেকে তেলেঙ্গানার দুরত্ব বড় বেশী। খবর আদান-প্রদানে কালক্ষেপ হয়। মালিক কাফুর যখন অবরোধ করতে এসেছিল তখন আলাউদ্দিন খিলজী দ্রুত সংবাদ প্রাপ্তির জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। সারা পথে সমদূরত্বে মাঝে মাঝে এক একটি চৌকি স্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি চৌকিতে অশ্ব মজুত থাকত। সেই অশ্ব নিয়ে একজন অশ্বারোহী এক চৌকি থেকে অন্য চৌকিতে ডাক সরবরাহ করত। এইভাবে দিল্লীর কোন খবর কিংবা তেলেঙ্গানার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অশ্বের ডাকের মাধ্যমে অল্প সময়ে পৌঁছে যেত। কিন্তু সেই এগারো বছর পূর্বের পুরনো ব্যবস্থা এখন আর তেমনভাবে চালু নেই। কারণ লুদ্দার দেও এযাবৎ কাল নিয়মিতভাবে

দেবগিরিতে সুলতানের প্রাপ্য পৌঁছে দিয়েছে। তবু চৌকিগুলোর অস্তিত্ব সব জায়গায় না থাকলেও এক এক জায়গায় একনো টিকে রয়েছে। তাতে সুবিধা হ'ল।

তেলেঙ্গানার রাজধানী ওয়ারঙ্গল থেকে নিকটতম চৌকির দূরত্ব দশ ক্রোশ। সেই চৌকির অশ্বারোহী গ্রামেরই এক তরুণ। নাম হাসান। হাসানের পূর্বে তার পিতা আবদুল ওই একই কাজ করত। আলাউদ্দিনের সময় সে বহুবার ছোটাছুটি করেছে তার চৌকি থেকে এদিক আর ওদিক। তার হঠাৎ মৃত্যু হ'ল ভালুকের আক্রমণে। সেদিন সে পায়ে হেঁটে আসছিল দূরবর্তী কোন গ্রামের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। হাসানের বয়স বড়জোর পনেরো বছর তখন। আবদুলের জায়গায় হাসানকেই রাখা হ'ল। কারণ ওই বয়সেই সে অশ্বচালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। এখন তো পরিপূর্ণ যুবক।

উলাঘ খাঁ রাজধানী অবরোধ করার পর প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে হাসানকে একবার মাত্র দিল্লীর পত্র নিয়ে আসতে হয়েছে। তাও বিশ পঁচিশ দিন হয়ে গেল। সেই সময় সে উলাঘ খাঁয়ের হস্তে সুলতানের পত্র দেয়।

দ্বিতীয়বার পত্র আসে দিল্লী থেকে। বঙ্গে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে। তাই রাজা লুদ্দারকে তাড়াতাড়ি দমন করে দিল্লী ফিরে যেতে বলেছেন সুলতান। অবরোধ বেশীদিন টিকিয়ে রেখে অনশনে তাকে থাকতে বাধ্য করার মত সময় নেই। হাসান পত্রের বিষয়বস্তু কিছু জানে না। তার কর্তব্য হ'ল সেটি পৌঁছে দেওয়া মাত্র। তার চৌকিতে তাই পত্র এসে পৌঁছোলে সে তার অশ্বটিকে নিয়ে উলাঘ খাঁয়ের ছাউনির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। উলাঘ খাঁ যখন অবরোধ করেন নি তখনও হাসানের ওয়ারঙ্গলে যাতায়াত ছিল। কারণ তখন অন্য কোন কাজ ছিল না। রাজধানীতে এসে এটা ওটা কিনতে তার ভালই লাগত। দশ ক্রোশ পথ তো কিছুই নয়। বিশেষ করে আনোয়ারার জন্য কিছু কিনতে হলে চল্লিশ ক্রোশ পথও সে অনায়াসে ছুটতে পারে। এই আনোয়ারা তার গ্রামের কেউ নয়। গ্রাম থেকে রাজধানীতে আসার পথে দৈবাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল ছয়মাস আগে। পথিপার্শ্বে তার কুটির সংলগ্ন ক্ষুদ্র জমিতে গাছ লাগিয়েছিল আনোয়ারা। তাতে একদিন জল সিঞ্চন করছিল। সেই সময় অশ্বপৃষ্ঠে যাচ্ছিল হাসান। চারচোখের মিলন সেইদিনেই। তরুণ অশ্বারোহীকে দেখে আনোয়ারা চোখ ফেরাতে পারেনি। হাসানেরও একই অবস্থা। সেই থেকে তাদের গোপনে সাক্ষাৎ। তারপর একদিন আনোয়ারার মা ধরে ফেলল। হাসানকে ডেকে গালাগালি। শাসানি পর্যন্ত। হুমকি দিল আর কখনো কুটিরের সামনে দাঁড়াতে দেখলে কুটি কুটি করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে লোকজন ডেকে। হাসান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে আনোয়ারার মায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে — আমাকে মেরে ফেললেও আমি আসব।

— কী ? স্পর্ধা তোমার কম্ম নয়।

— আমি যে আপনার মেয়েকে ভালবাসি। ভালবাসা কি স্পর্ধা। আজই আমাকে মেরে ফেলুন। আমি বেঁচে যাব। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না।

— ঠিক আছে। আমি সবাইকে ডেকে আনছি। তোমার সাহস থাকে তো এক পাও নড়বে না এখান থেকে।

আনোয়ারা তখন আকুল হয়ে কেঁদে ওর মায়ের হাত ধরে ঝুলে পড়ে বলে — ওকে মারলে আমিও মরব। যাও তুমি কাকে ডাকবে, যাও।

মা স্তব্ধ হয়ে যায়। সে তখন হাসানকে পাশে বসিয়ে তার সব খোঁজ খবর নেয়। বেশ সন্তুষ্ট হয় সে। হাসানের জমি জমা কিছু আছে। তাছাড়া সুলতানের লোক সে। মা রাজি হয়ে যায়। তবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। হাসানের অপেক্ষায় আপত্তি নেই। মাকে গিয়ে সব কথা বলে।

মা বলে -- কেমন দেখতে ? কুৎসিত নয় তো?

হাসান বলে — হুরী দেখেছ? হুরী?

— হুরী আবার কেউ দেখতে পায় নাকি ?

— ওই হলো। মনে মনে তো দেখেছ? এবারে নিজের চোখে দেখো।

— ছেলেরা রঙীন চোখে অমন কত হুরী দেখে। পরে দেখা যায় পেঁচা। ছেলেদের ওই দোষ আছে বলে তো অনেক মেয়ে পার পেয়ে যায়।

—তোমার ছেলেকে তেমন ভেবো না।

সুলতানের পত্র নিয়ে ছুটছে হাসান। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনো আনোয়ারার গ্রামের কাছে পৌঁছতে কিছুটা পথ বাকী। পত্রটা তার চৌকিতে অসময়ে এসেছে। খুব জরুরী। অপেক্ষা করার সময় ছিল না তাই। সুলতানজাদাকে পত্র দেবার পর তিনি যদি মনে করেন পত্রপাঠ জবাব লিখে দেবেন, তাহলে সেই জবাব নিয়ে তাকে আবার ছুটতে হবে। অশ্বটির প্রচণ্ড পরিশ্রম হবে। কারণ তার চৌকির পরবর্তী চৌকি প্রায় পনেবো ক্রোশ। অতটা পথ এক নাগাড়ে অতিক্রম করা এর পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। নিজের গ্রামে গিয়ে কিছু দানাপানি আর বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।

এবারে আর আনোয়ারার কাছে বেশীক্ষণ থাকা হবে না। সুলতানজাদার কাছে যাওয়ার পথে বলে যাবে রাত্রে ফিরে আসবে। কোন জবাব নিতে না হলে রাতটা কাটাবে। আর উলাঘ খাঁ যদি পত্র ধরিয়ে দেন তাহলে একটু সোহাগ করে চলে যেতে হবে। চলে যেতে খুব কষ্ট হবে। ও তো ছাড়তে চাইবে না। কিন্তু উপায় নেই। সুলতানের নোকর সে। কত বড় দায়িত্ব তার ওপর।

আনোয়ারার কুটিরের দিকে যাওয়ার সময় সে নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনতে পায়। এ যে ওদের কুটিরের দিক থেকেই আসছে। প্রাণপণে অশ্ব ছোটায় হাসান। কী

হতে পারে? আনোয়ারার মায়ের কিছু হয়েছে কি ? কিংবা? কিংবা তা তো হতে পারে না। তেমন কখনো হতে শোনেনি এদিকে। চিরকাল শান্তিতে বাস করেছে এ অঞ্চলের মানুষেরা। দস্যু বৃত্তি এক আধটা যে হয় না, এমন নয়। তাই বলে নারীর ওপর —

সে অশ্ব নিয়ে কুটিরের সামনে দাঁড়ায়। দেখে অদূরে জাম গাছের গোড়ায় একটি অশ্ব বাঁধা রয়েছে। ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। সে তার কোষ থেকে তরবারি নিষ্কাষিত করে গৃহে প্রবেশ করে। সেখানে আনোয়ারার মায়ের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে থাকতে দেখে সে চমকে ওঠে। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার মুহূর্ত মাত্র অবকাশ পায় না। কারণ অদূরে আনোয়ারাকে শুইয়ে ফেলে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাকে চেপে ধরেছে। আনোয়ারা তবু প্রাণপণে ছট্‌ফট্‌ করছে, পশুটার হাত থেকে নিস্তার পেতে। আনোয়ারার গলা টিপে ধরায় তার জিভ বেরিয়ে আসছে। হাসান তার তলোয়ার লোকটির হৃদপিণ্ডে আমূল বসিয়ে দেয়। একটা চাপা আর্তনাদ করে লোকটি একপাশে গড়িয়ে পড়ে। তলোয়ার তার দেহ থেকে টেনে বের করার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে হাসানের বুকের কাছের কামিজ ভিজিয়ে দেয়। লোকটিকে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সে আনোয়ারার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে সে। আর একটু দেরি হলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যেত। জল নিয়ে এসে সে ঝাপ্‌টা দেয় মুখে। পাশ থেকে আনোয়ারার লুটোপুটি খাওয়া ওড়না তুলে নিয়ে হাওয়া করে তার মাথায়। তার পোশাক ছিন্নভিন্ন। কি দিয়ে ঢাকবে বুঝতে পারে না। আশে-পাশে কিছু নেই। তার মায়ের ওড়না রক্তে জবজবে। সেই রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। তাই পোশাকের দিকে আর নজর না দিয়ে আনোয়ারার চেতনা ফিরিয়ে আনতে যত্নবান হয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনোয়ারা চোখ মেলে। চোখ মেলেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে যায়। হাসান তাকে চেপে ধরে বলে — এই তো আমি! ভয় কিসের ?

হাসানকে চেপে ধরে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে — লোকটা আমার সর্বনাশ করেছে।

— না, পারেনি। ওই দেখ।

আনোয়ারা লোকটার দেহ পড়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বলে ওঠে — মা? মা কোথায়?

হাসান কি বলবে? অদূরেই মায়ের শবদেহ পড়ে রয়েছে। বাইরের আলো আবছা হয়ে এলেও তাকে গোপন করতে পারে না। ঘরের ভেতরে অতটা অন্ধকার হয় নি। মাকে এই অবস্থায় দেখে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বলে আমার জন্যে তোমার এ কি হ'ল মা। আমি কোথায় যাব? কে দেখবে আমায়?

— আমি, আমি দেখব। তুমি বিচলিত হলে চলবে না লক্ষীটি। তোমার গ্রামের কেউ আসেনি দেখছি।

— ভয়ে। এ নিশ্চয় সুলতানের লোক।

— তাই হবে। আমি ডেকে আনছি যাদের পাই।

— না, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।

হাসান গৃহকোণ থেকে প্রদীপটি এনে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে — তোমার কোন ভয় নেই। আমি সুলতানজাদা উলাঘ খাঁয়ের কাছে যাচ্ছি। খুব জরুরী একটা পত্র রয়েছে। সেটি দিয়ে আসতে হবে।

নতুন করে আনোয়ারার মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। সে বলে — না, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি ওদের লোককে খতম করেছ।

কথাটা হাসান নিজেও ভেবেছিল। তবু কর্তব্য তাকে করতে হবে। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এই অপরাধের জন্য উলাঘ খাঁ যদি তাকে কোতল করেন, উপায় নেই। সে সুলতানের রাজত্বে পালিয়ে বেড়াতে পারবে না। সে প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিয়ে বলে — না, সে ভয় নেই। এই লোকটা সবার দুশমন। এদের কেউ ক্ষমা করে না। তুমি ভেবো না।

হাসান পাড়ার কয়েকজনকে ডেকে আনে। ওরা স্বীকার করে দেখেশুনেও ভয়ে এদিকে আসেনি তারা। তাছাড়া ওরা ভেবেছিল একসঙ্গে অনেকে এসেছে। তাই বাড়ির মেয়েদের নিয়ে তারা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। অত্যাচার করতে মাত্র একজন এসেছিল জানতে পেরে তাদের অনুশোচনা হয়। তারা হাসানকে বলে, সে যেন চিন্তা না করে। সব ব্যবস্থা তারাই করবে। আনোয়ারাকেও তারা নিজেদের কাছে রাখবে। পথের ধারের এই কুটিরে একা একা রেখে দেবে না।

হাসান কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। রাত্রি হয়েছে। অন্ধকার পথ। আকাশে চাঁদ নেই। তবে অজস্র তারা রয়েছে। ঝুঁকে পড়েছে হাসানের মাথার ওপর। তবু তাতে আলো হয় না। তবে এ পথ নতুন নয়। তাই অসুবিধা হচ্ছে না ততটা।

উলাঘ খাঁ-এর ছাউনিতে নিয়ে গেল এক সিপাহী। সেখানে অন্য এক সিপাহীকে সে হাসানের পরিচয় দিল। সে তখন অপর একজনকে পাঠাল তাঁবুর ভেতরে। একটু পরে একজন কর্মচারী এসে হাসানকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

উলাঘ খাঁয়ের সামনে এসে হাসান যথারীতি অভিবাদন জানায়। উলাঘের চতুর্দিকে অনেক চিরাগের আলোয় আলোকিত। সে পত্র বাহকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে — তুমি দিল্লীর পত্র এনেছ?

— হ্যাঁ, মেহেরবান।

— তোমার পিরানে খুন কিসের? কেউ কি পত্র ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল?

— না, খোদাবন্দ্।

— তবে?

— একজন আমার ভাবী জানানার ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল। তাই তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি।

উলাঘের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই কৌতূহলান্বিত হয়ে ওঠে। উলাঘ বলে — তাই নাকি ? বল তো কি হয়েছিল?

হাসান আনুপূর্বিক সব কিছু একে একে বলে যায়। উপস্থিত কারও মুখে কথা ফোটে না। এমন কি উলাঘ খাঁও নীরব।

শেষে হাসানই বলে — যাকে খুন করেছি, সে কে আমি জানি না। তবে তার অশ্ব আর পোশাক দেখে মনে হ'ল এখানকার কেউ।

একজন আমীর বলে ওঠে — অশ্বের রঙ কি রকম?

— পাটকিলে রঙ। ঘাড়ের কাছে আর পেছনের দিকটা সাদা।

সবাই নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে। হাসানের মনে হয়, ওরা চিনতে পেরেছে নিহত ব্যক্তিকে।

উলাঘ খাঁ ওদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে — কে ? কিবরিয়া?

— ঠিক অনুমান করেছেন হুজুর।

— আমি ওকে অনেকবার সাবধান করেছি।

হাসান বলে — কোন উপায় ছিল না হুজুর। নইলে আমার আওরতের সর্বনাশ হয়ে যেত।

— পত্রটি দাও।

হাসান ভাবে, পত্রটি নিয়ে উলাঘ খাঁ তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করবে।

উলাঘ খাঁ পত্রটি দু'বার পড়ে। তারপর বলে — তুমি পরশু এসে এর উত্তর নিয়ে যাবে।

সবাই বিস্মিত। উলাঘ খাঁ এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয় নি।

— হুজুর, লাশের কি হবে? মেয়েটির মায়ের লাশের ব্যবস্থা ওরাই করবে বলেছে।

— তোমার সঙ্গে লোক পাঠাচ্ছি। তারা নিয়ে আসবে। অশ্বটিকেও।

উলাঘ খাঁয়ের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টির ভাব ধূমায়িত হচ্ছিল কিছুদিন থেকে। কারণ তার কোন কোন কার্যকলাপ বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কদের পছন্দ হচ্ছিল না। প্রথমত, সে দিল্লী থেকে তার বাহিনী খুব অল্প সময়ের মধ্যে এখানে নিয়ে এসেছে, রাজা

লুদ্দারকে অপ্রস্তুত করার জন্য। অত তাড়াহুড়ো না করলেও চলত। তাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল সবাইকে। অনেকে এজন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল পর্যন্ত। কিন্তু এমন ঝট্‌পট্‌ চলে আসায় যে লুদ্দার দেও খাদ্য সামগ্রী মজুত করে উঠতে পারে নি একথা স্বীকার করতে চায় না কেউ। অসন্তুষ্টির আর একটি কারণ মালিক কাফুর, কবি উবেইদ, দামাস্কাসের শেখজাদা থেকে শুরু করে অনেকে বলেছিল লুদ্দারের কাছে খবর পাঠাতে সে যেন সন্তোষজনক শর্তে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। তাহলে তার ওপর আক্রমণ হবে না। উলাঘ খাঁ একথা মানতে নারাজ। সে বলে, লুদ্দার দেও বাধ্য হবে একসময় সন্ধি করতে। তখন খুশীমত শর্ত আরোপ করা যাবে। সবশেষে কিবরিয়াকে হত্যার ঘটনা। সেনাবাহিনীতে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অথচ তার হত্যাকারী নিজে এসে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল। উলাঘ খাঁ এমন ভাব দেখাল যে ওই পত্রবাহক উচিত কাজ করেছে। অসহ্য। ঘর সংসার ছেড়ে এতদূরে এসে দিনের পর দিন কয়জনের ভাল লাগে। কিবরিয়া যা করেছে প্রায় সবাই বলতে গেলে তাই করে। কিবরিয়া শুধু ভুল করেছে সঙ্গে কোন দেহরক্ষী নিয়ে যায়নি। ওর মৃত্যু সবাইকে একটা শিক্ষা দিয়ে গেল।

উলাঘ খাঁ বুঝতে পারে তার বিরুদ্ধে একটা কিছু কানাঘুষা চলে সেনানায়কদের মধ্যে। তেলেঙ্গানার রাজা ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে। গর্তের বাইরে বিড়াল থাবা মেলে বসে থাকলে ইঁদুর বের হবে কি করে? সুতরাং খোঁচাতে হবে। না খোঁচালে বিড়ালেরও খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। প্রকৃতই খাদ্য ভাণ্ডারে টান পড়েছে। উলাঘ খাঁ হুকুম জারি করে যুদ্ধ নয়, প্রথমে লুটতরাজ চালাও। রাজধানী ওয়ারঙ্গলের ভেতরে এখন প্রবেশ করা যাবে না। সুতরাং অন্যান্য জনপদে লুটতরাজ চালাও। নিশ্চয়ই ওদের রসদ সংগ্রহের গোপন পথ রয়েছে।

সৈন্যরা এতদিন ঝিম্‌ ধরে বসে ছিল। এখন হুকুম পেয়ে মহানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিটি শহরে এবং গ্রামে-গঞ্জে। তাদের কীর্তি দেখে, নির্মমতা দেখে উলাঘ খাঁয়ের ধমনীতেও শোণিত প্রবাহ সবেগে ধাবিত হতে থাকে। সে বুঝতে পারে ভাল হয়ে থাকার চেষ্টা করলেও সম্ভবত তার মধ্যে অন্য কিছু রয়েছে, যা সে নিজেও বুঝতে পারে না। তাকে শয়তান বলা যায় তেমন কাজ এখনও করেনি বটে, তবে সাধু সন্তদের সঙ্গে মিশলে যেমন হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনও নয়। মালিক তিগির, মালিক মল, মালিক তমর ইত্যাদি সবাই নতুন উলাঘ খাঁকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ভাবে, এ আবার কে ? এত নির্মম হতে পারে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র?

কবি উবেইদ সাহস করে সবার সামনে প্রশ্ন করে — সৈন্যরা এই যে অত্যাচার চালালো এতো নিদারুণ, আপনি স্বচক্ষে দেখলেন সব। করুণা হ'ল না?

উলাঘ খাঁ হেসে বলে — করুণা? আমি কবিতা লিখতে এসেছি? এমনিতে আমি বিন্ধ্যপর্বতের মত স্থির। ভেতরে কি আছে নিজেই জানিনা। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে যদি বাধা পাই চূড়ান্ত নির্মম হতে পারি। আপনারা মোটামুটি সবাই যখন এখানে হাজির আছেন, কথাটা সবাই ভাল করে শুনে রাখুন। ভবিষ্যতে আপনাদের খুব কাজে লাগবে।

এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। দু-একজন তখনই মনস্থির করে ফেলে উলাঘের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়বে না।

লুটতরাজ আর হানা দেওয়ার ফল ফলল। তেলেঙ্গানার রাজা লুদ্দার দেও দুর্গ-নগরী ওয়ারঙ্গল থেকে দূত প্রেরণ করে। দূতকে ওরা বলে বসীথ। সে ছাউনিতে এসে উলাঘের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, রাজা তাকে সন্তুষ্ট করতে শীঘ্রই অনেক উপঢৌকন পাঠাবেন এবং পূর্বে দেবগিরিতে যেভাবে প্রতিবছর রাজস্ব দিয়ে আসা হ'ত সেইভাবে দিয়ে আসা হবে। অন্যথা হবে না।

বহুবছর আগে মালিক কাফুর লোভনীয় উপঢৌকন পেয়ে আলাউদ্দিন খিলজীর সম্মতি নিয়ে অবরোধ তুলে নিয়েছিল। লুদ্দার দেও ভেবেছিল সেবারের মত এবার উলাঘ খাঁও প্রলুব্ধ হবে। সে জানে উলাঘের সঙ্গে রয়েছে সেবারের মালিক কাফুর। কিন্তু উলাঘ অন্য ধাতুতে গড়া। সে ওই সব বহুমূল্য উপঢৌকনের টোপটা গিলল না। সে অবরোধ চালিয়ে যেতে মনস্থির করল। উলাঘের সেনানায়করা এতে ক্ষুব্ধ হ'ল। কারণ রাজা উপঢৌকন পাঠালে প্রত্যেকের যথেষ্ট লাভ হ'ত। সেনাবাহিনী লুটে পুটে নিয়ে যা কিছু হাতাবার হাতিয়ে নিয়েছে। সেনানায়করা তখন কিছু পায় নি। রাজা মোটা কিছু পাঠালে সবাই তৃপ্ত হ'ত। উলাঘের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য সুযোগ হাতছাড়া হ'ল।

সেই রাত্রে কবি উবেইদ আর মালিক কাফুর তাঁবুর বাইরে বেশ কিছু দূরে হেঁটে গিয়ে ঘোর অন্ধকারে ঘাসের ওপর বসে গোপনে পরামর্শ করল। তারা ভাবল এই অবরোধ থেকে যদি ফয়দা তুলতে হয় তাহলে উলাঘ খাঁকে রাখা চলবে না। গুপ্ত হত্যা সম্ভব নয়। কারণ যে কারণেই হোক উলাঘ সৈন্যবাহিনীতে যথেষ্ট প্রিয়। আর তার চারপাশে নিরাপত্তার বেষ্টনী থাকে। এই বেষ্টনী তার নিজেরই সৃষ্ট। সে বলে, — জালালউদ্দিনের কথা শুনেছি, কুতুব্উদ্দিনকে স্বচক্ষে দেখলাম। ওভাবে মরার সাধ নেই আমার। সুলতান হই বা না হই দেহটা অক্ষত রাখতে চাই। শয্যায় শুয়ে হাকিম দেখিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু আসবে, এটাই আমার ইচ্ছা। নিজেরও আমার যথেষ্ট নাড়িজ্ঞান আছে। মৃত্যুর আগে নিজেই বুঝতে পারব।

মালিক কাফুর কয়েকজনকে দলে পেল। কিন্তু কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়? দিনের পর দিন শলা পরামর্শ করেও পথের কোন হদিস করতে পারে না।

শেষে একটা সুযোগ মিলল। তেলেঙ্গানা অভিযানের সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি নিতে হয়েছিল। তাই দিল্লীর সঙ্গে তার সংযোগ বজায় রাখতে পুরোনো ডাক ব্যবস্থাকে জোড়াতালি দেওয়া হলেও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এখনও। তাই প্রথম প্রথম সপ্তাহে এক বা দু'দিন করে ডাক পাওয়া গেলেও পরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করল। দু'সপ্তাহে একবার করে ডাক এল কিছু দিন। তারপর আরও দেরি। এক মাসের মধ্যে উলাঘ খাঁয়ের সঙ্গে দিল্লীর সংযোগই ছিল না।

মালিক মখ আফগান এক রাতে তার শিবিরে সবাইকে ডেকে বলে — অপেক্ষা করে কি হবে? কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।

কবি উবেইদ বলে — কি ভাবে?

মালিক আফগান বলে — আপনি কবি। আপনার কল্পনাতে সব কিছু আগে আগে আসা উচিত। আসল কবিতা তো এখন শিকেয় তুলে রেখেছেন।

— বুঝলাম না তবু।

— দিল্লীতে কি হচ্ছে এখানকার কেউ কিছু জানে না। এবারে রটিয়ে দেওয়া হোক সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই খবর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বলে দেওয়া হোক উলাঘ খাঁ খবরটা চেপে রেখেছে। তার অভিপ্রায় হ'ল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রথমে খতম্ করবে এবং পরে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করবে। তাই তাকে সবাই মিলে এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করা উচিত। নইলে কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

চক্রান্ত সম্পূর্ণ সফল হ'ল। আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে সেনাধ্যক্ষরা নিজের নিজের বাহিনী নিয়ে উলাঘ খাঁকে পরিত্যাগ করল। বিভ্রান্ত উলাঘ খাঁ তড়িঘড়ি অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে তার নিজের সৈন্যদলকে একত্রিত করে দেবগিরির দিকে ধাবিত হয়। এদিকে সমস্ত সিপাহীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'ল। তারা এবং তাদের দলনায়করা কি করবে ভেবে পায় না। রাজা লুদ্দার এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। তার সৈন্যদের হাতে চক্রান্তকারীদের ফৌজ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হ'ল। কিছু পালিয়ে গেল। বাকীরা নিহত হ'ল।

দেবগিরিতে এসে উলাঘ খাঁ দেখল সুলতান গিয়াসউদ্দিনের একটি পত্র সেখানে আগের দিন এসে পৌঁচেছে। অশ্বারোহীর অভাবে পড়ে রয়েছে। সে নিশ্চিন্ত হ'ল। পিতার মৃতু সংবাদ তাহলে মিথ্যা। পিতা লিখেছেন ওয়ারঙ্গলের অবরোধের কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে। কারণ বঙ্গভূমিতে বিদ্রোহ বারবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। উলাঘ খাঁ কিছুদিনের মধ্যে আবার বাহিনী গঠন করে ফিরে চলল ওয়ারঙ্গলের দিকে। সে কল্পনা করতে পারেনি মালিক কাফুর, মালিক মখ আফগানদের ওই অবস্থায় দেখবে। তাদের নিজেদের বাহিনীর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। সামান্য লোকজন নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। উলাঘ খাঁয়ের বাহিনী দেখে তাদের ধড়ে প্রাণ

এল। গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে তারা আত্মসমর্পণ করল। অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষদের এই দুরবস্থা দেখে অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করল সে। তাদের কাতরতায় এক বিজাতীয় ক্রোধের উদ্রেক হয় তার মধ্যে। মনে হয়, তখনই ওদের শেষ করে দেবে। কিন্তু সংযত হয় সে। দেবগিরি থেকে পিতাকে সবকিছু বিস্তারিতভাবে লিখে জানিয়েছে। বলেছিল পিতা পুত্র উভয়ের বিরুদ্ধে ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল। ফলে তেলেঙ্গানা বিজয় পেছিয়ে গেল। বিজয় যখন প্রায় করায়ত্ত, লদ্দার দেও যখন ভেঙে পড়ার মুখে তখন শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে ওরা এই ষড়যন্ত্র করেছে। কবি উবেইদ সম্বন্ধে লিখেছে — আপনি হাকিম উবেইদকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন। আমাকে বলতেন উনি অন্য জগতের মানুষ। তাই আলাউদ্দিন খিলজী ওঁকে সভাকবির মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। কবিদের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। তবু হয়ত আনতাম না এখানে। শুধু আপনার কথা শুনে এনেছিলাম। এখন ওঁর অন্য এক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সেই রূপের সঙ্গে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম মানুষের রূপের কোন প্রভেদ নেই।

সবাই যখন একে একে ধরা দিল, যখন তেলেঙ্গানার রাজধানীর চতুর্দিকে আবার অবরোধের প্রাচীর গেড়ে তোলা হ'ল, তখন এক দ্বিপ্রহরে উলাঘ খাঁ ওদের সবাইকে নিয়ে আসতে বলল তার ছাউনিতে।

ওরা প্রত্যাশা করেছিল ওদের অন্তত উপবেশনের জন্য আসন দেওয়া হবে। কিন্তু উলাঘ খাঁ সেই ব্যবস্থা রাখল না। সবাইকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। অথচ তাদের দিকে একবারও দৃষ্টি না ফেলে চূড়ান্ত উপেক্ষা করল।

কবি উবেইদ শুধু মাথা ঝাঁকায় আর বলে — কি ভুলটা যে করলাম। ওরা এমন খোঁচাতে শুরু করল। আমি ছিলাম কবি মানুষ, ওদের ওইসব মারপ্যাঁচ কি আমার মাথায় ঢোকে ?

উলাঘ খাঁ প্রশ্ন করে — ওরা কারা?

— সবাই।

— তবু স্পষ্ট করে বলতে হবে।

— এই যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাত দুপুরে দূরের প্রান্তরে টেনে নিয়ে যেত। শলা-পরামর্শ করত। আমি অতশত জানি নাকি ? ভাবলাম, বেশ একটা মজা হবে। তাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে গিয়েছি।

উলাঘ খাঁ বলে — মাতৃদুগ্ধ কতদিন পান করেন নি?

— মানে?

— মানে হ'ল, বয়স আপনার যথেষ্ট হয়েছে। এখন শিশু শিশু ভাব দেখিয়ে নিজেকে কি নিরাপরাধ প্রমাণ করা যায়?

— খোদার কসম—

— চুপ করুন।

কবির দোষারোপে অন্য সবাই রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

উলাঘ খাঁ মালিক কাফুরকে বলে — মনে আছে, সেদিনের কথা যেদিন আমার কাছে এসে নিরাপত্তার আশ্রয় চেয়েছিলে। বলেছিলে, বিশ্বস্ত থাকবে? তোমার অভিজ্ঞতা যাতে কাজে লাগাতে পারি সুলতান তাই তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। ভালই প্রতিফল দিলে।

— আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম।

— থামো।

একে একে প্রত্যেককে নানা প্রশ্ন করে উলাঘ খাঁ। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারে না।

দু'দিন পরে ওদের সবাইকে একদল সিপাহী সমেত দিল্লীতে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কাছে পাঠায় উলাঘ খাঁ। সঙ্গে একটি পত্র দেয়। পত্রবাহক রূপে দলের সঙ্গে পাঠানো হয় হাসানকে। হাসান এখন আনোয়ারাকে সাদি করে সুখে আছে। উলাঘ খাঁ তাকে বলেছে দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর তাকে বরাবরের জন্য দেবগিরিতে পাঠানো হবে। শুনে খুব খুশী হাসান। সে শুনেছে দেবগিরির নাম রাখা হচ্ছে দৌলতাবাদ।

পঁচিশ দিনের মধ্যে হাসান ফিরে আসে, সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পত্র নিয়ে। তাতে তিনি লিখেছেন, ওদের দেখে তিনি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে জীবনে অমন কখনো হননি। তাই শিরচ্ছেদ করে অল্পসময়ের মধ্যে না মেরে তাদের শূলবিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওরা নাকি মৃত্যুর আগে উন্মাদের মত আচরণ করেছিল। প্রত্যেকে বন্দী অবস্থাতেও জল্লাদের পায়ের ওপর পড়েছিল ক্ষমা চেয়ে। আর হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছিল। সুলতান লিখেছেন — মনে রেখো, বিশ্বাসঘাতকতার কোন ক্ষমা নেই। যে বিশ্বাসহন্তা রূপে একবার প্রমাণিত তার ওপর চূড়ান্তভাবে নির্দয় হতে হবে। নিজের পুত্র হলেও তার নিস্তার নেই।

উলাঘ খাঁ পিতার পত্রের অর্থ মর্মে মর্মে বুঝতে পেরে একটু হাসে। কয়েকজনের প্ররোচনায় মাঝে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা সাময়িকভাবে তার মধ্যেও একবার জেগেছিল ওয়ারঙ্গলের চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি করতে করতে। একথা পিতা জানতে পেরেছেন কিনা কে জানে। দিল্লীর বাইরে এসে স্বাধীনভাবে চলতে চলতে মাথায় অনেক পোকা প্রবেশ করে।

অবরোধ চলতে থাকে। এখন আর বাধা দেওয়ার কেউ নেই। রায় লুদ্দার দেও

সুলতান সেনার যে সমূহ ক্ষতি করেছে কড়ায়-গণ্ডায় তা উসুল করে নিতে হবে। রাজাকে ক্ষমা করার আর প্রশ্ন ওঠে না। তবে তাকে হত্যা করার সুযোগ এলেও করার উপায় নেই। কারণ তার জায়গায় কোন মুসলমান শাসনকর্তার ওপর ভার দিলেও সে বেশীদিন টিকতে পারবে না। এই অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে হিন্দু অধ্যুষিত। কচিৎ কখনো দু'চারটি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুসলমানের বাস। সুতরাং লুদ্দারকেই বহাল রেখে সুবিধা আদায় করে নিতে হবে যতটা সম্ভব।

এবারের অবরোধ হয়েছে অনেক নিশ্ছিদ্র। লুদ্দার অনন্যোপায় হয়ে প্রস্তাব পাঠায়। উলাঘ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। দু'দিন পরে রাজা আবার প্রস্তাব পাঠায়। আবার প্রত্যাখ্যন। উলাঘ খাঁ এবারে হিংস্র হয়ে উঠেছে। তার মতানুযায়ী না হলে চিরকালই সে নির্মম। সে জানে মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের নরম মনোভাবের জন্য অনেক লাভ করেছিল। লুদ্দার প্রতি বছর রাজস্ব দেবে বলেও অস্বীকার করেছিল। পরে কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহের সময়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। তাই এই ধরনের সন্ধির কোন গুরুত্ব নেই। লুদ্দার মনে মনে হেসেছে প্রতিবার। এবারের শেষ হাসিটা নিজে হাসতে চায় উলাঘ খাঁ। মালিক তমর, মালিক তিগিরদের পেয়ে সে ভেবেছিল কাজটা খুব সহজ হবে। কিন্তু অত উচ্চপদে থেকেও তারা যে প্রলোভনের উর্ধে উঠতে পারবে না সেকথা কল্পনা করতে পারেনি। এখন সে অনেক পরিণত। এবারে লুদ্দারের আর চালাকির পথ থাকবে না।

ওয়ারঙ্গল থেকে ঘন ঘন দূত আসতে থাকে। তবু উলাঘ খাঁ অনড়। তার মনোভাব সেনানায়কেরা বুঝতে পারে না। তবে এবারে বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বিদ্রোহের শাস্তি যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে মালিক কাফুর, মলিক তমররা শোচনীয়ভাবে প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ রেখে গিয়েছে।

রাজা লুদ্দার একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। সন্ধির প্রস্তাব বারবার প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার ভানুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে সে। সে যখন খবর পায় ভানুদেব তার বাহিনী নিয়ে সাতদিনের মধ্যে রওনা হবে, তখন দূত প্রেরণ করা সহসা বন্ধ করে দেয়।

আর সেই দিনই উলাঘ খাঁ তার বাহিনী নিয়ে দূর্গনগরীর ওপর তুমুল আক্রমণ চালায়। প্রথমে রাজধানীর বাইরে যে সমস্ত বাধা ছিল সব অপসারিত করে। তারপর বাইরে পাষাণ প্রাচীর ধ্বংস করে। শেষে মূল প্রাচীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কয়েকদিনের মধ্যে রাজা লুদ্দার দেও আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

লুদ্দারের প্রাসাদের মধ্যে তাকে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত করনো হয় উলাঘ খাঁয়ের সামনে।

— আমি শেষ পর্যন্ত আপনার হস্তে বন্দী হলাম।

— আপনি তো জন্ম থেকেই বন্দী হতে চেয়েছিলেন।

— আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

— খুব সোজা। আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর আমলের আগে থেকে আপনি একই চালাকি করে আসছেন। আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে থেকে আপনার এই খেল্ শুরু। অবরোধের সঙ্গে সঙ্গে লোভনীয় উপহার দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষকে বশ করেন। বলেন, নিয়মিত রাজস্ব পাঠাবেন। দু'বছর পাঠিয়ে বন্ধ করে দেন। এবারেও ভেবেছিলেন তেমন কিছু হবে। হলো না। এবারে আমি এসেছি। আমার অত লোভ নেই। তার ওপর আপনি আমার অনেক সৈন্য হত্যা করেছেন। এক সময় আমিও বিপদে পড়েছিলাম। আমি কিন্তু আপনার কারসাজী প্রথম থেকেই জানতাম। ওদিকে ভানুদেবের খবরও আমি জেনে গিয়েছিলাম। এবারে আপনার ব্যবস্থা আগে করে ভানুদেবেরও একটা হিল্লে করতে হবে। সে ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি আমি কাজ শেষ করে ফেলব।

— আমি সুলতানের অধীনে বরাবর থাকব। আপনার প্রতিনিধি এখানে থাকুক।

উলাঘ খাঁ হেসে বলে -- আর নয়। দিল্লী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। আগামীকালই যাত্রা শুরু। ভয় নেই, আপনি একা নন। সপরিবারে।

রাজা লুদ্দার দেও-এর নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়। কিন্তু সেই অশ্রুর কানাকড়ি মূল্য নেই উলাঘ খাঁয়ের কাছে। বিজিতের ভয়ার্ত চিত্তের ওপর এই প্রথম নিপীড়ন চালিয়ে সে এক অনাস্বাদিত সুখ অনুভব করে। সামনের এই মানুষটি তার পিতার সমবয়স্ক বলে মনে হয়। বড়ও হতে পারে। আজ তার দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত। অথচ বছরের পর বছর সে দিল্লীর সুলতানকে ধোকা দিয়ে এসেছে আর মুচকি হেসেছে। আজ সেই খল হাসির অবসান ঘটল।

উলাঘ খাঁ ডাকে - কাদের খাঁ?

কাদের খাঁ সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

উলাঘ আবার ডাকে — খাজা হাজি নায়েব?

হাজি নায়েব সেলাম করে এগিয়ে আসে।

— আপনারা দু'জনা আমাদের এই মহামান্য অতিথিকে সপরিবারে নিয়ে কাল প্রত্যুষে দিল্লীর পথে যাত্রা করবেন।

রাজা লুদ্দার বলে — আমার একটি পুত্র খুব অসুস্থ।

— রাস্তায় চলতে চলতে ঠিক হয়ে যাবে।

— তার মৃত্যু হতে পারে।

— কত মৃত্যু তো আপনি ঘটালেন। একটা মৃত্যু না হয় বেশী হ'ল। এই তুচ্ছ ঘটনায় আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না। হ্যাঁ, আজ থেকে আপনার এই সুন্দর শহরের

নাম হবে সুলতানপুর। কালই এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করব। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে আমি আপনার প্রিয় দোস্ত ভানুদেবকে শায়েস্তা করতে রওনা হব। একবার যখন আরম্ভ করেছি শেষ না করে ছাড়ব না।

তেলেঙ্গানা থেকে জজনগরে যাওয়ার পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর রাজাদের একটু আধটু শিক্ষা দিতে দিতে চলে উলাঘ খাঁ। এরা প্রত্যেকেই ভানুদেবের সহায়ক। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে প্রায় চল্লিশটা হাতি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লীতে সুলতানের কাছে। রাজমহেন্দ্রীতে একটা মসজিদ নির্মিত হ'ল। এরপর একটা চিঠি পেয়ে উলাঘ খাঁ যেন কেমন হয়ে গেল। সুলতানের পত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সংবাদ। উলাঘ খাঁয়ের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বেগমের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু কিছুতেই বেগমের মুখ স্পষ্টভাবে মনে করতে পারে না। অথচ মনে পড়ে, চলে আসার আগে তার সঙ্গে অনেক কথা বলে এসেছে। তার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট মনে আছে। পুত্র সন্তান হলে তার নাম কি হবে ঠিক করে এসেছিল। বেগম তার কথা রেখেছে কিনা জানা নেই। এই সামান্য বিষয়ে সুলতানকে লেখার কোন অর্থ হয় না। সুলতান ভাবপ্রবণতাকে খুব একটা আমল দেন না। পুত্র সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করলে তাকে হয়ত দুর্বলতা বলে ভেবে বসবেন তিনি।

বেগমের কথা ভাবতে ভাবতে উলাঘ খাঁয়ের শিরা উপশিরায় রক্ত ছোটাছুটি করতে শুরু করে। অতি ঘনিষ্ঠ এবং প্রায় সমবয়সী মালিক কাসেমকে বলে — এদেশে স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না?

কাসেম লাফিয়ে ওঠে — যাবে না কেন? আলবৎ যায়। হুকুম করলেই পাওয়া যায়।

— কথায় কথায় হুকুম করতে হবে নাকি ? আছ কি করতে ?

কাসেম ছুটল। উলাঘ খাঁ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে অজ্ঞান হয় না। উন্মাদও হয়ে পড়ে না। যখন নারীর প্রয়োজন হয় তার দু-একদিন আগে কাসেম তার ভেতরে একটা অস্বস্তি এবং অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করে। বুঝে ফেলে এইবারে সুন্দরী ললনার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। সে সঙ্গে সঙ্গে উলাঘ খাঁয়ের কাছে গিয়ে বলে — আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি। কাল ফিরলে হবে? উলাঘ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। তেলেঙ্গানায় এতদিনের মধ্যে বার চারেক এমন হয়েছে। তার তাঁবুতে যখন কোন রমনীকে পাঠানো হয় তখন ত্রিসীমানার মধ্যে কারও থাকা চলবে না। কাসেমের ওপর কড়া হুকুম।

রাজমহেন্দ্রী থেকে কিছুটা দূরে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গায়ে এক সুদৃশ্য কুটিরে থাকে নর্তকী চন্দনা। এখানকার রাজা এবং বড় বড় ভূস্বামীদের খুশী করতে কালেভদ্রে

ডাক পড়ে তার। সে খুবই মহার্ঘ সামগ্রী। নিত্য ব্যবহারের জন্য সে নয়, বড় যত্নে রাখে নিজের দেহ-মন কে। তাই তাকে পেতে হলে চড়া মূল্য দিতে হয়। তবে এখানকার মহারাজের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর নিজের সুন্দরী রাজনর্তকী রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে আশেপাশের রাজ্যের রূপসী নর্তকী ও গায়িকারা। তাদের পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা প্রতিযোগিতা থাকে। প্রকাশ্যে না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে। একথা তারা নিজেরা ভালই জানে। তাই মহারাজের কাছ থেকে আহ্বান এলে কোন চাহিদা নেই চন্দনার। বিনামূল্যে তাঁর পদপ্রান্তে নিজেকে সঁপে দেয় গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে।

কাসেম সারাদিন ঘোড়ায় চেপে ঘুরে ঘুরে কোন সন্ধান না পেয়ে আতঙ্কিত হয়। উলাঘ খাঁ ভীষণ ক্ষেপে যাবে। এমন কখনো হয়নি। আসলে বিদেশী বলে রাজ্যের লোকেরা সুলতানের ফৌজের ওপর বিরূপ। তার ওপর বোধন শহরে দেবল নামে এক অতি ক্ষুদ্র মন্দিরের ওপর মসজিদ গড়ে দিয়েছে উলাঘ খাঁ। নাম দিয়েছে দেবল মসজিদ। তাতে এদিকের মানুষেরা রেগে গিয়েছে। তার ওপর এরা জেনেছে অন্য সব রাজ্য থেকে চল্লিশটা হাতি ছিনিয়ে নিয়ে দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে। তাই কোন নর্তকীর খোঁজ ওরা দিতে চায় না। যে লোকটা এত শত্রুতা করছে তাকে অত খাতির কিসের?

মালিক কাসেম চোখে সর্ষের ফুল দেখে। সে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে দেবল মন্দির অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে ছিল বহুদিন। কেউ পূজা দিত না। কোন পূজারী ছিল না। আরতিও হত'না। তাই মসজিদ করা হয়েছে। কেউ কোন বাধাও দেয়নি।

ওদের জবাব — আরতি না হলে কি মন্দির থাকে না? আসা যাওয়ার পথে সবাই ওদিকে ঘুরে সম্ভ্রম জানিয়ে প্রণাম করত। সব সময় কোন মূর্তি থাকবে তার কোন কথা আছে? ঈশ্বর আসলে তো অদৃশ্য। আর মসজিদ বানাতে বাধা দেবে কে? অত ফৌজ নিয়ে উনি এসেছেন। বাধা দেওয়ার হিম্মৎ কার থাকে?

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যায়। তবু কোন খোঁজ নেই। ঘুরতে ঘুরতে সে দেখতে পায় পাহাড়ী রাস্তায় এক নির্জন স্থানে একজন সাধু বসে বসে আপন মনে একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে, সে নিরুপায় হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাঁকে সেলাম করে কেঁদে কেটে বলে — আমাকে উদ্ধার করুন। নইলে আমার দুরবস্থার শেষ থাকবে না।

সাধু একতারা পাশে নামিয়ে রেখে শান্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করেন — কি হয়েছে তোমার?

সে বলে যে দিল্লীর সুলতানের পুত্র হ'ল তার মনিব। সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে শেষে বলে — নর্তকী যোগাড় করতে না পারলে আমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত

করতে পারেন। এমনকি তাঁর মেজাজ এক একসময় হঠাৎ এমন হয়ে যায় যে আমাকে শূলে চড়িয়ে দিতে পারেন।

সাধু তাঁর মাথার বড় বড় উসকো খুসকো চুলের মধ্যে ডান হাতের আঙুল চালাতে চালাতে উদাস দৃষ্টিতে মালিক কাসেমের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন — এর নাম প্রবৃত্তি। তাই না? ইন্দ্রিয় লালসা। সবার থাকে। কারও কম, কারও বেশী। কেউ নিজেকে সংযত রাখতে পারে, দমন করতে পারে। কেউ পারে না। কুকুরের মত হয়ে ওঠে। কুকুরের তো তবু নির্দিষ্ট মরশুম রয়েছে। মানুষের ওসব বালাই নেই। দোষ কারও নয়। তোমার মালিকেরও নয়। আমি নিজেও প্রবৃত্তির দাস ছিলাম এক কালে।

কাসেম কৃতার্থ হয়ে বলে — তাহলে তো আপনি বুঝেছেন সব। আমাকে এবারে উদ্ধার করুন।

— এতে উদ্ধারের কি আছে? এর জন্য এক শ্রেণীর নারীকে পাওয়া যায়।

— না না, একেবারে সাধারণ হলে চলবে না। সুলতানের পুত্র বলে কথা। গায়ে ঘামের গন্ধ, মাটির গন্ধ থাকলে চলবে না। বেশ ফুল ফুল সুঘ্রাণ থাকা চাই।

সাধু অনতিদূরের পাহাড়ের গায়ে একটি শ্বেতবর্ণের বাড়ি আঙুল দিয়ে দেখান। তিনি বলেন— তোমার প্রভুর প্রবৃত্তির সঙ্গে ওইখানে যে থাকে তার প্রারব্ধ জড়িয়ে রয়েছে। তুমি ওখানে যাও। যাকে পাবে তাকে যত্নের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তোমার প্রভুর সামনে উপস্থিত করাও। ওর যেন কোন ক্ষতি না হয়।

— ক্ষতি? আপনি বলছেন কি ? আমার মালিক খুশী হলে অনেক কিছু দিয়ে দেবেন। আর পছন্দ না হলে পরের দিন আবার আমাকে ছুটতে হয়। ক্ষতি ওদের কখনো করেন না উনি।।

— বেশ, যাও ওখানে। দেখো যদি ধরতে পার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। নইলে ও আটকা পড়ে রয়েছে এই সংসারে।

মালিক কাসেম সাধুর কথার সারমর্ম কিছুই বুঝতে পারে না। বোঝার সময়ও নেই তার। সন্ধান পেয়ে সে পাহাড়ের দিকে ছুটতে থাকে। সে চলে গেলে সাধু পাশ থেকে একতারা তুলে নিয়ে আবার গাইতে থাকেন। আশে-পাশের গাছপালা যেন আবার নিশ্চিন্ত মনে তন্ময় হয়ে ওঠে।

নর্তকী চন্দনার অসম্মত হওয়ার কথা নয়। সে উলাঘ খাঁয়ের কথা শুনেছে। ছত্রিশগড়ের দেওয়ান ক'দিন আগে তার কাছে বায়না করতে এসেছিল। তখন তার মুখে উলাঘ খাঁয়ের পরিচয় পেয়েছে। দিল্লীর সুলতানের পুত্র। সুতরাং রাজী।

কিন্তু যাবে কি করে? তাকে নাকি প্রথম রাত্রির মধ্যেই পৌঁছতে হবে। শকট নেই, ডুলি নেই। মালিক কাসেম অতি বিনয়ের সঙ্গে তার অশ্বে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়।

চন্দনা অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলে ওঠে — আপনার সঙ্গে? একই সঙ্গে?

— আর যে উপায় নেই। আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন।

— কি ভাবব? একই অশ্বে?

— আপনাকে আমি সামনে বসাব না। আপনি পেছনে বসবেন। আমাকে ধরে রাখবেন। আমাকে কোন রক্ত মাংসের মানুষ বলে ভাববেন না। স্রেফ একটা খুঁটি ভাববেন। আসলে আমার অবস্থা সেই রকমই। এখন যদি পরীক্ষা করেন বুঝতে পারবেন আমার ভেতরে রক্ত বলে কোন বস্তু নেই। সব জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গিয়েছে। আপনাকে ওখানে সময়মত পৌঁছে দিতে পারলে আবার সচল হবে সেই রক্ত।

চন্দনা কৌতুক অনুভব করলেও বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে বলে — চলুন। কিন্তু ফেরার পথে এভাবে আসব না।

— কখনই নয়। তখন তো অন্য ব্যবস্থা। তখন তো আপনি বেগম সাহেবা।

— তার মানে?

— মিথ্যে বললাম কি ? ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আসুন।

চন্দনাকে নিয়ে মালিক কাসেমের অশ্ব যখন উলাঘ খাঁয়ের শিবিরের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল তখন তৃতীয়ার চাঁদ অস্তগামী।

শিবিরের ভেতরে উলাঘ খাঁ পায়চারী করছিল। ধীর ভাবেই পায়চারী করছিল। আর মনে মনে কাসেমের মুণ্ডপাত করছিল। সেই সময়ে চন্দনাকে নিয়ে কাসেমের প্রবেশ। প্রথম দর্শনেই চন্দনা তাকে মুগ্ধ করে দেয়। বনে জঙ্গলে ফুটে ওঠা পাহাড়ী ফুল তো এটি নয়। এটি প্রস্ফুটিত হয়েছে সযত্ন প্রয়াসে। মনে মনে কাসেমের প্রশংসা না করে পারে না সে।

কিন্তু চন্দনার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েই তুড়ি দিয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয় কাসেমকে। কাসেম কুর্নিশ করার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। পুলকিত অন্তরে তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভাবে, খুব পছন্দ হয়েছে মালিকের। আজ যদি মালিকের এই খেয়ালটা না হ'ত তা হলে একে হয়ত সে ও পেতে পারত। সুলতানজাদার ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে দেয় বলে সে-ও সাধারণ সেনা নয়। একজন সেনাধ্যক্ষ সে। উলাঘের মোসাহেব হয়েছে ইচ্ছা করে। তাতে অনেক সুবিধা। ভাবী সুলতানের সবচেয়ে কাছের আদমি সে।

কাশেম বাইরে গেলে উলাঘ খাঁ চন্দনার সামনে এগিয়ে এসে তার চিবুক তুলে ধরে মুখের দিকে চায়।

— তুমি খুবসুরত। দিল্লী যাবে?

— আমার নিজের দেশই ভাল লাগে। অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবি না।

— দিল্লী গেলে তোমার বরাত খুলে যেত।

— এখানে আমি যতটুকু পাই, তাতেই খুশী।

উলাঘ খাঁ মুগ্ধ হয় মেয়েটির কথায়। সে অন্যমনস্ক হয়ে বলে — তোমার মত একজনের আমার হয়ত বড় প্রয়োজন ছিল।

চন্দনা সামান্য হেসে বলে — কেন দিল্লীতে সুন্দরী নেই?

— শুধু সুন্দরীতে কি হবে? সেই সঙ্গে একটা অন্য ধরণের মন?

— প্রথম দর্শনেই কি করে বুঝলেন আমি সেই মনের অধিকারিণী?

— বোঝা যায়। তুমি আমাকে দেখে বোঝনি?

চন্দনা একটু নীরব থেকে বলে — ধারণা করেছিলাম বটে। তবে নাও মিলতে পারে।

— আমার সম্বন্ধে কি ধারণা তোমার?

— না থাক। আপনার সঙ্গে জীবনে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা। কী হবে অত গভীরে গিয়ে।

— তবু।

— কয়েক মুহূর্তের অনুমান মাত্র।

— বলো।

— আপনি ভীষণ একগুঁয়ে। আপনার সম্বন্ধে দুরকমের কথা শুনেছি। একদল বলে আপনার প্রকৃতি খুব নরম, অন্যদল বলে আপনি নিষ্ঠুর নির্দয় বেপরোয়া।

— অদ্ভুত তো। আমি জানতাম না। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

চন্দনা অস্ফূট স্বরে বলে — মনে হয়, দুটোই।

— তাই আবার হয় নাকি ?

— হয়।

উলাঘ খাঁ চন্দনাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে — যাক ওসব কথা। এখন আমি সব কথা সব সমস্যার বাইরে চলে যেতে চাই। যদি চিরকাল এভাবে নিয়ে যেতে পারতে, তোমাকে দিল্লীতে মঞ্জিল বানিয়ে রেখে দিতাম।

— তাহলে যে আমার সঙ্গীত বন্ধ হয়ে যেত।

— বন্ধ কেন?

— আপনার ধর্মে সঙ্গীত পছন্দ করে না অধিকাংশ মানুষ। ওসব গাওয়া বা শোনা নাকি গুনাহ্।

— অতসব জানিনা। আমি নিজে নাচগান খুব পছন্দ করি। আমার নিজের নর্তকী আর সঙ্গীত শিল্পী আছে।

— সত্যি?

— হ্যাঁ। তেমন দিন এলে প্রাসাদের পাশে তাদের রাখব, যাতে ইচ্ছা করলে শুনতে পারি, দেখতে পারি।

— আপনি অন্যরকম।

— যাবে আমার সঙ্গে?

— না সুলতান জাদা। তবে আপনাকে খুব ভাল লাগছে। এমনকি আপনাকে ভাল বাসতে ইচ্ছে করছে।

— বাসবে আমাকে? আমার বেগম আমাকে ভালবাসে, বাসতে হয় বলে। কেমন যেন পুতুল পুতুল। ভালবাসায় ভাসিয়ে দিতে পারেনি। তুমি আমাকে সেইভাবে ভালবাসবে?

— তা হয় না। আমাকে আনা হয়েছে এক রাত্রির জন্য। শুধু একটি মাত্র রাত্রি।

— অনেক রাত্রি এবং অনেক দিনের জন্যও তো হতে পারে। প্রথম দর্শনেই তোমাকে দেখে মনে হয়েছে তুমি তাই, আমি যা চাই।

— আপনি ফিরে যান দিল্লীতে। তারপরেও যদি আমার কথা মনে পড়ে, যদি আর একবার অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজে আসেন আমাকে নিয়ে যেতে তাহলে আমি নিশ্চয় যাব।

একথায় উলাঘের উদ্দামতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। চন্দনা মনে মনে হাসে। ভাবে এমন কত দেখেছে। রাত্রিকে স্বপ্নময় করে তোলার জন্য আবোল তাবোল বকে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে অন্য রকম। হয়ত কাল সকালেই দেবল মন্দিরের মত তার কুটির সংলগ্ন রাধা-গোবিন্দের মন্দিরটি ধূলোয় মিশিয়ে দেবে। এরা নিজেরা সব সময় অমন হয় না। কিন্তু আশেপাশের অনুচরবৃন্দ অনেক কিছু এদের দিয়ে করায়। কিন্তু এর প্রতি একটি বিশেষ ধরণের আকর্ষণ অনুভব করে চন্দনা। একে ভালবেসে ফেলেছে মনে হচ্ছে। এ যেন তার পরিত্রাতা।

জাজনগর থেকে উলাঘ খাঁ আবার ফিরে যায় তেলেঙ্গানায়। এবারে শহরে প্রবেশ করে বিজয়ীর মত। পর পর দুটি দুর্গ প্রাকারের প্রবেশদ্বার তাকে অভ্যর্থনা জানাতে সুসজ্জিত করা হয়। একটা আত্মগরিমা অনুভব করে সে জীবনে প্রথম।

এখানে অপেক্ষা করার সময় সে আবার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের তলব পায় দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার জন্য। এবারে সুলতানের লক্ষ্মণাবতীতে না গেলে আর নয়। সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

দিল্লীতে পৌঁছোলে সুলতান গিয়াসউদ্দিন স্বয়ং এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা

জানালেন। বললেন — তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। এই দীর্ঘ সময় তুমি যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছ যা একমাত্র একজন কুশলী যুদ্ধবিশারদের পক্ষে সম্ভব। তুমি পরিণত হয়ে উঠেছ।। এখন রাজধানীতে বসে সাতদিন আনন্দ স্ফূর্তি কর। তারপর আমি নিজে যাব লক্ষ্মণাবতীতে। অনেক দিন ফেলে রেখেছি ওই অশান্ত অঞ্চল। ওই অঞ্চলই আমাদের রসদের সিংহভাগ যোগায়। ফেলে রাখা যায় না এভাবে দীর্ঘদিন।

দিল্লীতে আনন্দের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে খবর এল মঙ্গোলরা উত্তর ভারতে আক্রমণ চালাচ্ছে। সামান-এর শাসনকর্তা গুরশাস্প সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে বার্তা পাঠিয়েছে যে মঙ্গোল বাহিনী সিন্ধুনদ অতিক্রম করে সামান আবরোধ করেছে। সুলতান খবর পেয়েই হিন্দু মুসলমান সেনানায়কদের তত্ত্বাবধানে সেনা বাহিনী প্রেরণ করলেন। সামানে বাহিনী পৌঁছোলে তার সর্বাধিনায়ক গুরশাস্পই রইল। দুটি অঞ্চলে যুদ্ধ হ'ল। একটি সামান-এর পূর্বে শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে, অপরটি উত্তরে বিয়াসের তীরে। মঙ্গোলরা পরাজিত হ'ল। দিল্লীর বাহিনী বহু মঙ্গোল বন্দীকে নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন খুব পুলকিত হলেন এবং বাহিনীর সেনানায়কদের প্রভূত পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে পাওয়ারীরা গুজরাটে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওখানে পাঠানো হ'ল অভিজ্ঞ সেনাপতি নায়েব উজির শাদিদাবর কে। এবারেও শত্রুরা পর্যুদস্ত হ'ল এবং তাদের ঘিরে ধরে ঠেলতে ঠেলতে একটি দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ করা হ'ল। কিছুদিন ওভাবে আবদ্ধ থেকে যখন দেখল ওভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে তাদের শুকিয়ে মরতে হবে তখন তারা ফন্দি আঁটতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তারা ফন্দিতে সুলতানের সেনানায়ককে পরাস্ত করল। তাদের মধ্যে কিছুলোক নিজেদের গায়ক আর বাদক বলে পরিচয় দিয়ে দুর্গের বাইরে এসে লোকের মধ্যে মিশে যায়। তারপর ওই পরিচয় দিয়ে গাইতে গাইতে এবং বাজনা বাজাতে বাজাতে মালিক শাদি দাবরের সম্মুখে এসে তাকে হত্যা করল। দলপতির মৃত্যুতে বাহিনীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। তারা ফিরে এল দিল্লীতে। তবে গুজরাটকে শান্ত করা গেল।

এতদিন হয়ে গেল দিল্লীতে এসেছে অথচ এর মধ্যে নিজের বেগমের সঙ্গে দেখা করা হয়ে উঠল না। কি করে হবে? পিতা বিজয়োৎসব করতে ঢালাও হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং শুধু দিল্লী নয়। আশেপাশের অনেক শহরে যেতে হয়েছে তাকে। সে জানে, ক'দিন পরে পিতা যাত্রা করবেন সুদূর বঙ্গদেশে। তখন তার ওপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন তাকে খুব খাতির করতে শুরু করেছে। যেন সে এখনই সুলতান হয়ে গিয়েছে। দু একজন চোখ টিপে বলেছে, এই বয়সে অত দূরে

যাচ্ছেন সুলতান। শরীর দিলে তো? তাদের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কিছুর ইঙ্গিত। এই সব ইঙ্গিতে আগে সে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠত। মন্তব্যকারীদের কত হেনস্থা করেছে নিজের হাতে। এখন কিন্তু এই ইঙ্গিত তাকে স্বপ্ন দেখায়। সে জানে তেলেঙ্গানাতে স্বাধীন ভাবে কাজ করার পর থেকে তার এই পরিবর্তন। তেলেঙ্গানাতে থাকার সময়েই দু একজনকে বাজিয়ে দেখেছিল পিতার বিরুদ্ধে যাওয়া যায় কিনা।

যাই হোক সেই রাতে বেগমের কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হয় সে। বেগম আগেই খবর পেয়েছিল যে তার স্বামী প্রাসাদে ফিরেছে। তাই শিশু পুত্রটিকে পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে ধাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পালঙ্কের ওপর বসে একাকী প্রতীক্ষায় ছিল সে। ভাবছিল, সুলতানজাদা হয়ত ভুলে গিয়েছে তার একটি সন্তান হওয়ার কথা ছিল। কক্ষের চারদিকে চারটি বড় বড় পিলসুজের ওপর প্রদীপ জ্বলছিল। বেগমের পরনে ছিল হালকা গোলাপী রঙের পোষাক আর ফিকে বেগুনী রঙের ওড়না।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায় উলাঘ খাঁ। স্বপ্নময় পরিবেশ। নিজের স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। আরে, এ যে দেখছি যত নারী দেখলাম তাদের অধিকাংশের চেয়ে ভাল। জাজনগরের পাশের সেই পাহাড়ের কোলের মেয়েটির কাছাকাছি প্রায়। দূর থেকে তো বটেই। ছুটে গিয়ে বেগমকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে বিধ্বস্ত করে ফেলে। বেগম হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। তার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সে হাঁফাতে থাকে, দারুণ ভাবে হাঁফাতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনার কোন কথা নেই। শেষে বেগম মুখ খোলে। সে স্বামীর বুকের ওপর মাথা রেখে বলে — দেখে মনে হচ্ছে এই দীর্ঘ ছয়-সাত মাস তুমি অভুক্ত ছিলে।

— যদি বলি, ছিলাম।

— তোমার বলতে বাধা নেই। যা খুশী বলতে পার। কিন্তু কেউ যদি শোনে, এমন কি বাইরের ওই তোতাপাখিও, তাহলে হেসে উঠবে।

উলাঘ খাঁ একটু হেসে বলে — কি করলে তুমি বিশ্বাস করবে?

— কিছু করার দরকার নেই। তোমরা পুরুষ মানুষ, হারেমে বসে থাকলে চলবে না। হারেমে আমি বসে প্রতীক্ষা করব। তবু ভাল আরও পাঁচদশটাকে এনে এখানে ভরোনি। যা কিছু বাইরে বাইরে। পুরুষদের কি একটাতে চলে? তার ওপর ভাবী সুলতান।

উলাঘ খাঁ নীবব থাকে।

পাশের কক্ষ থেকে শিশুর ক্রন্দন ভেসে আসে।

— এখানে আবার বাচ্চার কান্না কেন?

— এখানকার শিশু কি অন্য জায়গায় গিয়ে কাঁদবে?

উলাঘ খাঁ একটু ভেবে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বলে—আরে, তাই তো? কোথায় সে?

— শুনলে তো কাঁদছে।

— আনছে না কেন?

— সামলাচ্ছে। কান্না থামুক। একে একে সামলাতে হবে তো? প্রথমে ওর জন্মদাতাকে সামলানো গেল, এবারে ওকে।

উলাঘ খাঁ শুনে হাসে। সে বলে — সেই নাম রেখেছ তো?

— হ্যাঁ, তুমি নিজের মুখে বলে গেলে, না রেখে পারি?

— জানো, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক ভাল হয়। কিন্তু প্রকৃতি তাদের ভাগ্যে দেয় শুধু বঞ্চনা। ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব একে ?

— তবু যদি পুরুষেরা এভাবে দরদ-ভরা কথা বলে তাহলে ভাগ্য বলে মনে করবে মেয়েরা। তারা জানে যন্ত্রণা সহ্য করতে তাদের দুনিয়ায় আসা। সেই যন্ত্রণার ওপর কেউ যদি সহানুভূতির হাত বুলিয়ে দেয় তাহলে তার কাছে সে বাঁধা পড়ে। তাকে মন দিয়ে ফেলে, ভালবাসায় কিংবা শ্রদ্ধায়।

উলাঘ খাঁ নিবিষ্ট মনে বেগমের কথা শোনে। স্বামীর কাছে নারীরা যে এত গম্ভীরভাবে বুদ্ধিযুক্ত কথা বলতে পারে সে জানত না। তার ধারণা ছিল নারীরা হালকা চালে চলে। পুরুষেরা যা বোঝায় তাই বোঝে। তারা অল্পে উচ্ছ্বসিত হয়। ঝর্ণার মত কলকল করে হেসে ওঠে, তেমনি সামান্য কারণে তাদের নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরে। এই কয় মাসের অনুপস্থিতি তার বেগমের মধ্যে একটা বিরাট্ পরিবর্তন এনে দিয়েছে বলে মনে হয়। তেলেঙ্গানা যাওয়ার আগে সে-ও অন্য সবার মত সাধারণ ছিল। এমনকি স্বামীর সঙ্গে সহবাসও ছিল নিয়ম মাফিক। তার মধ্যে আজকের এই সুতীব্র আগ্রহ আগে কখনো দেখা যায় নি। পুত্র জন্মগ্রহণের আগেও নয়। ফলে জগতটাকে উলাঘের কাছে রঙ চঙ হীন ধুসর বলে মনে হ'ত। দেখা যাক, বেগম এই নতুন অবস্থায় কতদিন থাকে।

পরিবেশকে হাল্‌কা করার জন্য উলাঘ খাঁ বলে — বেগমেরা রূপের প্রশংসায় বিগলিত হয়। যে কোন পুরুষ শুধু তোমার রূপের প্রশংসা করে মন জয় করে নিতে পারে।

বেগম বলে — আগে যে ভাবে মন জয় করার কথা বললাম সেভাবে কখনই নয়। তবে হ্যাঁ, মিথা বলব না, রূপের প্রশংসা শুনতে সব নারীরই ভাল লাগে। কেন জানো? যদি স্বামী কিংবা অন্য পুরুষেরা নারীর প্রতি অবহেলা দেখায়, কিংবা নারী যদি ভাবে তার রূপের দিকেও কেউ চাইছে না, তাহলে তার অবস্থা হয় অশ্বশকট

কিংবা বলীবর্দের গাড়ির চাকার মত। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয় গাড়ির চাকায় দীর্ঘদিন তেল না দিলে শব্দ হয়। চাকা শব্দ করে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে চলে। একটু তেল ঢাললেই শব্দ থেমে যায়। গাড়িও অনেক বেশী সচল হয়। তার গতি বাড়ে। নারীর রূপের প্রশংসা চাকায় তেল দেওয়ার মত। নিজের প্রশংসা শুনলে নিঃশব্দে নিজের আনন্দে মশগুল থেকে শান্তির সংসার সৃষ্টি করে।

উলাঘ খাঁ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

উলাঘ খাঁ তেলেঙ্গানা অবরোধে যখন ব্যাপৃত ছিল তখন সে শত্রু ও মিত্র দুই প্রকারের মানুষ দেখেছিল। যারা শত্রু তাদের তো খতম করা হয়েছে। যারা মিত্র তাদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণীর মানুষ ছিল। এক শ্রেণীর ছিল, যারা প্রকৃতই সুহৃদ। কোন অবস্থাতেই উলাঘের অমঙ্গল কামনা করেনি তারা। এখনও করেনা। আবার কেউ কেউ তখন থেকেই রয়েছে যারা নিজের স্বার্থে উলাঘের মঙ্গল চায়। উলাঘের উন্নতির সঙ্গে নিজেদের উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নিতে চায়। সহজতম পথে উলাঘের যাতে উন্নতি হয় সেই পথেরও ইঙ্গিত দেয় তারা। যার মধ্যে সর্বনাশা পথও রয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন উলাঘ খাঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ভাবী সুলতান হওয়া সত্ত্বেও সুলতান গিয়াসউদ্দিন তাঁর অতি বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তিকে তেলেঙ্গানাতে পাঠিয়েছিলেন পুত্রের ওপর সর্বদা প্রখর নজর রাখতে। সুলতানজাদাদের প্রলুব্ধ এবং প্ররোচিত করার লোকের অভাব হয় না। যে ব্যক্তি তেলেঙ্গানায় ছিল সে সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি। সে-ই এক সময় খবর পাঠিয়েছিল সুলতানকে, যে কয়েক জনের উস্‌কানিতে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা মাথায় ঘুরছে উলাঘের। খবর পেয়েই গিয়াসউদ্দিন পুত্রকে তেলেঙ্গানার অবরোধ তুলে দিয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই সেই বিশেষ ব্যক্তি মারফৎ সুলতান জানতে পারেন যে পুত্রের মাথা থেকে বদ মতলব দূর হয়েছে। সুলতান তখনকার মত নিশ্চিন্ত হন এবং পুত্র বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে একটু বেশী মাত্রায় জাঁকজমকের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেন যে তার সুলতানী পাকা। হয়ত কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে মাত্র। সে তো হবেই। কারণ মানুষের আয়ু তো আর নিজের হাতের মধ্যে নয়। আল্লাহ এই দুনিয়ায় যতদিন রাখবেন ততদিন থাকতে হবে। তার কমও নয় বেশীও নয়।

পুত্র রাজধানীতে এসে স্থিতি হলে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বঙ্গভূমিতে যাত্রা করার আয়োজন শুরু করেন। বহুদিন থেকে ঝুলে রয়েছে এটি। এর পর জটিল আকার ধারণ করতে পারে। লক্ষ্মণাবতীর ঘটনা অদ্ভুত ধরনের। ওখানকার মসনদের দাবীদাররা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ বাধিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মধ্যস্থতা মানতে গিয়ে

তাঁর অধিকার কায়েম করার সুযোগ এনে দিয়েছে। ওরা সবাই সুলতান গিয়াসউদ্দিন বল্‌বনের বংশধর।

গিয়াসউদ্দিন বল্‌বনের পুত্র নাসিরউদ্দিন মহ্‌ম্মদ বাঘরা খাঁ। তাঁর তিন পুত্র মুইনুদ্দিন কইকুবাদ, রুখনুদ্দিন কইকাউস এবং সামসুদ্দিন ফিরোজশাহ। এঁদের মধ্যে বল্‌বনের মৃত্যুর পরে মুইনুদ্দিন কইকুবাদ দিল্লীর সুলতান হন। তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা রুখনুদ্দিন কইকাউস বঙ্গভূমিতে লক্ষ্মণাবতীর সুলতান হন। তাঁর মৃত্যুর পর সামসুদ্দিন ফিরোজশাহ বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই মসনদ নিয়ে বিবাদ বাধল ভায়েদের মধ্যে। সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের চার পুত্র। এরা হলেন শিহাবউদ্দিন বাঘরা শাহ, নাসিরউদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর এবং কুতলু খাঁ। এঁদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর হলেন সবচেয়ে বেশী উচ্চাকাঙ্খী। তাঁর ক্ষমতাও বেশী। পিতার জীবৎকালেই ইনি সোনার গাঁ-এর শাসন কর্তা নিযুক্ত হন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। নিজের আধিপত্য পাকা করার জন্য নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং প্রথমেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুতলু খাঁকে হত্যা করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবউদ্দিনকে বিতাড়িত করেন। বাকী নাসিরউদ্দিনকে তিনি বিব্রত করতে থাকেন। দুই ভাই-ই লক্ষ্মণাবতী অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ বেশীদিন টিকতে পারেন না সেখানে। তখন তাঁরা দিল্লী যাত্রা করলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে মধ্যস্থ মানতে। সুতরাং সুলতান তুঘলক সুযোগ পেয়ে গেলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দক্ষিণভারতের চেয়ে বঙ্গভূমিকে বরাবর বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ বঙ্গ কোনোদিনই দিল্লীর অধীনে থাকা বরদাস্ত করে না। তাই তেলেঙ্গানাতে পুত্রকে পাঠিয়ে লক্ষ্মণাবতীর জন্য নিজে নিখুঁত ভাবে তৈরী হচ্ছিলেন। তিনি একদিন জেষ্ঠ্য পুত্রকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করলেন। পুত্র লক্ষ্য করল এই বয়সেও পিতা বেশ সজীব এবং সতেজ। এত দূর দেশে যাত্রা করছেন অথচ মনের ওপর বিন্দুমাত্র চাপ নেই। বরং বহুদিন পরে যুদ্ধযাত্রার সুযোগ পেয়ে তিনি অতিমাত্রায় পুলকিত। উলাঘের মন খারাপ হয়ে যায়। এই বয়সেও তার ওপর পিতার নির্ভরতা একেবারে নেই। যেন আরও বহুবছর দিল্লীর মসনদ অধিকার করে বসে থাকবেন। এই যুদ্ধযাত্রা তাঁর কাছে যেন বন্য পশু শিকারের মত উত্তেজনাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। অথচ মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখান যেন তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তখন তিনি উলাঘ খাঁকে শোনান — জানতো, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কথায় কথায় সব কিছু ভুলে যায়। একটু আগে কি বলেছিল মনে থাকে না। তাই একই কথার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। আমারও তেমন হয় নিশ্চয়। তুমি তখন হয়ত খুব বিরক্ত হও।

উলাঘ খাঁ স্পষ্ট জবাব দেয় -- আপনার তেমন হয় না। তাই বিরক্ত হওয়ার প্রশ্ন নেই।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন লক্ষ্মণাবতীতে পৌঁছনোর আগেই গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে হটিয়ে দিয়ে তার দ্বিতীয় ভ্রাতা নাসিরউদ্দিন মসনদে জাঁকিয়ে বসেছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক পদার্পণ করা মাত্র নাসিরউদ্দিন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চট্‌পট্‌ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

সুলতান তখন তাঁর দত্তক পুত্র তাতার খাঁকে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরের বিরুদ্ধে সোনার গাঁ-এ অভিযানে পাঠালেন। সে সোনার গাঁ-এ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল। তাতার খাঁ তাকে পরাজিত করে সুলতানের হুকুমে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়। সুলতান তখন দত্তক পুত্রকে সপ্তগ্রাম ও সোনার গাঁয়ের অধিকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লী ফেরার উদ্যোগ নেন।

তুর্কী বেগমের যখন আকস্মিকভাবে মৃত্যু হ'ল তখন তাঁর স্বামী সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক লক্ষ্মণাবতী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মুঙ্গেরের কাছেও এসে পৌছোন নি। প্রাতঃকালে সুলতানের পঞ্চম পুত্র অর্থাৎ তুর্কী বেগমের গর্ভের একমাত্র সন্তান নাসরৎ খাঁ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল নিজের বেগমের কাছ থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে। প্রায় প্রত্যহ সে আসে অন্তত একবার। কারণ অন্যান্য ভাইদের মত সে আদৌ বহির্মুখী নয়। এমন কি সেই জন্য তার বদনামও রয়েছে। এই বদনাম চরিত্রবান হওয়ার বদনাম। বড় বেশী বেগম-ঘেঁসা। শিকারে অবধি যেতে অনীহা। তার বেগম স্বামীকে অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে তুলনা করে আর লজ্জায় মরে যায়। সব সময় গা ঘেঁষে থাকে অথচ সেই বলিষ্ঠতা নেই। কাছে এলে যেন কাতু কুতু লাগে। মরে যেতে ইচ্ছা হয়। অন্যান্য ভাইদের উন্নত বক্ষ আর কঠিন ইস্পাতের মত বাহু দেখে অজান্তে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অথচ নাসরৎ একা তুর্কী মায়ের সন্তান বলে মনে মনে গর্ব রয়েছে। যদিও মৃদু স্বভাবের বলে সেই গর্ব ভাষায় প্রকাশ পায় না। অন্যান্য ভাইরা তো সাচ্চা নয়, "কারাউনা"।

বেগমের হাবভাব, কথাবার্তা ইত্যাদিতে একদিন নাসরৎ-এর কাছে ধরা পড়ে যায় তার মনোভাব।

মৃদু কণ্ঠেই বলে - তুমি কি আমাকে পছন্দ কর না?

- কে বলল?

- প্রথম প্রথম কত সুন্দর ভাবে ধরা দিতে। এখন সরে সরে থাক। আজকাল

তো আমার পায়ের শব্দ শুনলে ছুটে পালিয়ে যাও।

— তোমার পায়ের শব্দ কি করে শুনব। তুমি কখনো বাইরে থেকে এসে ভেতরে ঢোকো? তুমি তো নিজেকে সব সময় পাশাপাশি এই দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছ। এখানেই ঘোরাফেরা কর। তোমার প্রবেশে নতুনত্ব কোথায়? তোমার গায়ে রাজপথের ধূলিকণা মাখানো থাকে না, কখনও ঘর্মাক্ত কলেবরের ঘ্রাণও পাই না। সেই ঘ্রাণ অপরিচিত বনফুলের সুঘ্রাণ বলে মনে হয় পর্দানশীন নারীদের কাছে। এই দুই প্রকোষ্ঠের গন্ধ তোমার সর্বাঙ্গে। আমার গায়েও তাই। সেজন্য কোন নতুনত্ব পাই না।

— একথা বলতে পারলে? আমি ভেবেছিলাম—

— তুমি কি ভেবেছিলে আমি জানিনা। তবে সহজ সত্য কথা হ'ল পুরুষকে পুরুষের মত হতে হয়। যেমন নারীকে নারীর মত।

— এইবারে তোমায় চিনেছি। তোমরা চরিত্রবান স্বামী চাও না। আমার মত পত্নী প্রেমে অবিচল পুরুষকে চাও না।

বেগম হেসে বলে — নারীরা পুরুষদের সমস্ত দোষ সমস্ত স্খলন মেনে নিয়েই তাদের ভালোবাসে। গায়ে কাদামাটি লেগে থাকলে সাফসুফ্ করে নিতে বেশ আনন্দ হয়। আমার মুশকিল হয়েছে কি জানো?

— কি ?

— তোমার ওই অত্যধিক সদগুণের জন্য তোমাকে ঘৃণা করতে ইচ্ছা হয়। তুমি অমন হওয়ায় আমিও যেন নারীদের মধ্যে দলছাড়া — পতিত।

বেগমের কথা সহ্য করতে না পেরে আকুল ভাবে আশ্রয়ের খোঁজে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে নাসরৎ। সেখানে দেখে হাকিম নাড়ি দেখে তার মায়ের হাত ধীরে ধীরে শয্যার ওপর নামিয়ে রেখে মাথা নাড়ে।

শয্যাপার্শ্বে যে সমস্ত বাঁদীরা ঘিরে ছিল তারা কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পূর্বেও বেগম সাহেবা বেশ ভালই ছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। হঠাৎ তিনি বললেন তাঁর ভেতরটা কেমন অস্থির করছে। কিছুতে স্থির থাকতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের হাকিমকে খবর পাঠানো হ'ল। হাকিম একটুও বিলম্ব করেনি। কিন্তু সব শেষ।

নাসরৎ খাঁ হতভম্ব হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথায় তখনো কিছু ঢুকছে না। তখনো সে ভাবছে তার বেগমের কথা মাকে এখনো বলা হয়নি। এবারে বলতে হবে।

হাকিম তার পাশে এসে বিষণ্ণকণ্ঠে বলে— দাবাই দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না।

সম্বিত ফেরে নাসরৎ-এর। সে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। একটু ঝুঁকে পড়ে তাঁর কপাল স্পর্শ করে। যদি প্রস্তুতি থাকত তাহলে চোখের জল আসত হয়ত। কিন্তু এত আচম্বিতে মৃত্যু এল যে, মৃত্যু যে এসেছে তাও বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

নাসরৎ খাঁ প্রশ্ন করে — কী হয়েছিল?

— বুঝতে পারছি না। মনে হয় কলিজা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

— আপনি নিয়মিত দেখতেন না?

— হ্যাঁ।

— তবে?

-- উনি তো কখনো কোন অভিযোগ করেননি।

বাঁদীরা সন্ত্রস্ত। সবাই ভাববে, বেগম সাহেবা অসুস্থ হওয়া সত্বেও কাউকে খবর পাঠানো হয়নি। কেউ জানতেও পারল না। কোন বেগমের মৃত্যুর পূর্বে বেশ কিছুদিন হাকিমী ও ইউনানী চিকিৎসা চলবে ঘটা করে, পুত্র কন্যারা ঘন ঘন এসে কাছে দাঁড়াবে, পাশে বসবে, কপালে হাত রাখবে, অবসর পেলে সুলতান একবার এসে শিয়রের কাছে দাঁড়াবেন, তবে তো বেগমের মৃত্যু যোগ্য মর্যাদা পেল। কিন্তু এ কি হ'ল? নাসরৎকে তারা দুর্বল চিত্তের ভালমানুষ বলে জানে। কিন্তু কথাটা উলাঘ খাঁয়ের কানে পৌঁছোলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? তার নিজের গর্ভধারিনী না হলেও ছে[illegible] কথা বলবে না। তাদের সবাইকে একসঙ্গে কোমরে দড়ি বেঁধে মুলতান [illegible] আফগানিস্থানে পাঠিয়ে দেবে। তাদের বুক কাঁপতে থাকে। তবু উলাঘ খাঁয়ের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে।

জাবেদা নামে বাঁদী একটু বুদ্ধিমতী। সে হাকিম সাহেবকে বলে — খবরটা অন্য সুলতান জাদাদের জানাতে হবে। সুলতান কন্যা খোদাবন্দজাদাও রয়েছেন।

— হ্যাঁ, জানিয়ে দাও সবাইকে।

— আমরা বাঁদী। আমাদের কাজ হারেমের ভেতরে। তাছাড়া আমরা কিছুই বুঝি না। আপনি হাকিম, সব দেখলেন। কি হয়েছিল বুঝিয়ে বলতে পারবেন। আমরা কিছুই বুঝলাম না। দেখলাম আপনি একটা হাত জোরে খাম্‌চে ধরলেন আর উনি অবশ হয়ে গেলেন।

— কি বলছ? খাম্‌চে ধরলাম আর অবশ হয়ে গেল? তার মানে? নাড়ি দেখা কাকে বলে জান?

জাবেদা ভাল মানুষের মত মাথা ঝাঁকায়।

— তুমি না জানলে কি হবে! দুনিয়া শুদ্ধ সবাই জানে। এই তো সুলতানজাদা রয়েছেন। উনি দেখেছেন সব। খাম্‌চে ধরলাম? কি বিশ্রী কথা। তোমার নাম কি? আমি সুলতানজাদা উলাঘ খাঁকে বলব। কি নাম তোমার?

— জাবেদা।

— জাবেদা, জাবেদা। হ্যাঁ মনে থাকবে।

হাকিমের কথা শুনেই বাঁদীরা বুঝতে পারে জাবেদার নাম বলে দেওয়ার মত দুঃসাহস হাকিমের হবে না। ওদের হাসি পায়। কিন্তু স্বয়ং বেগম সাহেবার মৃতদেহ সম্মুখে শায়িত। তাঁর ওপর দরদ তেমন না থাকলেও তাঁর স্বামী ও সন্তানেরা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাছাড়া উনিও খারাপ ছিলেন না। সামান্য একটু উগ্র হলেও মনটি সাফ্ ছিল। কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ ছিল না।

সবাই এক একে মৃতের কক্ষে এল। সবাই জানে মৃত্যু অমোঘ। তবে এক এক জনের বেলায় এক এক রকমের হয়। উলাঘ খাঁ ভাবে, এঁর মৃত্যু ভালই হয়েছে। তার মনে অদূর ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনার কথা তালগোল পাকাচ্ছিল। তাই পিতার প্রথম বেগম চলে গেলেন বলে স্বস্তি পেল। মানুষ যত বেশী দিন বাঁচে তত দুঃখ পায়। দীর্ঘায়ু মানুষ সুখের চেয়ে দুঃখ পায় অনেক বেশী। জীবনের আনন্দময় পরিবর্তন বড় একটা দেখে না। দুঃখের ভাগ অনেক বেশী মর্মান্তিক হয়ে ওঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এঁকেও হয়ত চূড়ান্ত দুঃখ পেতে হত আরও বেশী বাঁচলে। এ বরং ভালই হ'ল।

সব শেষে দেখতে আসেন নাসরৎ ব্যতীত বাকী ভাইদের গর্ভধারিনী মাখদুমা-ই-জাহান। সপত্নীর মৃত মুখের দিকে চেয়ে অনেক কথা মনে হয় তাঁর। তাঁর স্বামীর জীবনে ইনিই প্রথম নারী। অথচ নিজের আসন ধরে রাখতে পারেননি। মনে মনে কত দুঃখই না ছিল। আজ সব কিছুর অবসান। তবু শেষ জীবনের সান্ত্বনা পুত্র নাসরৎ। মাখদুমা-ই-জাহান স্বামীর সঙ্গে এক মাস কথা বলেন নি, যখন শুনলেন তুর্কী বেগম গর্ভবতী। আজ উনি সব কিছুর উর্ধে।

উলাঘ খাঁ পিতার নিকট একজন পত্রবাহক পাঠিয়ে দেয়। উনি জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে এই আঘাত পেলেন। না পেলেও চলত।

বঙ্গভূমিতে সাফল্য অর্জনের পরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খোশ মেজাজে দিল্লীর পথে রওনা হয়ে পথিমধ্যে গঙ্গার ধারে একস্থানে শিবির স্থাপন করেন। বেগম সাহেবের মৃত্যু সংবাদ তখনো এসে পৌঁছোয়নি সুলতানের শিবিরে। তিনি তাঁর সমবয়স্ক সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল ছিলেন। বলছিলেন তাঁর অতীত জীবনের নানা কাহিনী। তাঁর মধ্যে সামান্য একটু আত্মম্ভরিতার আঁচও পাওয়া যাচ্ছিল, যা তাঁর মধ্যে কদাচ দেখা যায় না। তবু গঙ্গার শীতল হাওয়ার পরশ গায়ে এসে লেগে সারা শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল বলে একটু লাগাম ছাড়া আজ তিনি। তাঁকে সবাই চেনে, অত্যন্ত সংযমী। কিন্তু সংযমী মানুষেরও অসংযমী কথাবার্তার প্রয়োজন হয় মাঝে মধ্যে। নইলে ভেতরটা হাঁপিয়ে ওঠে। সুলতানদের বরাতে তো প্রকৃত বন্ধু জোটে না,

সেই স্থান পূর্ণ করে চাটুকারেরা।

অনেক কথার মধ্যে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বলেন — তোমরা কি জান জীবনে আমি কতগুলো যুদ্ধ জয় করেছি?

একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে — তেতাল্লিশটা।

গিয়াসউদ্দিন চটে গিয়ে বলেন — তুমি খুব চালাক ভাব নিজেকে, তাই না ওয়াজির? তাই পঞ্চাশ না বলে তেতাল্লিশ বললে।

ওয়াজির মুখ কাচুমাচু করে বসে থাকে। অন্য সবাই হাসি চাপার চেষ্টা করে।

সুলতান বলেন — আমি এ পর্যন্ত ঊনত্রিশটি যুদ্ধ করেছি এবং জিতেছি। একে একে বলছি মিলিয়ে নাও। প্রথমেই ধর মুলতানের বিদ্রোহ। দ্বিতীয় কলামপুরের বিদ্রোহ। তারপর এই সোনার গাঁ-এর গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর। এও তো বিদ্রোহও করেছিল। তারপর দোয়াবের বিদ্রোহ। কটা হল?

— পাঁচ।

গিয়াসউদ্দিন লক্ষ্য করেন তাঁর কথায় কান না দিয়ে উপস্থিত আমীরদের মধ্যে দুজনা ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ক্রুদ্ধ হন তিনি।

— তুমি কি বলছ গুলজার খুরসীদের কানে কানে?

— না মেহেরবান, কিছু না।

— কিছু না, বললেই শুনব? কথা বলার অর্থই হচ্ছে কিছু বলা। আমি যেখানে হিসাব মেলাতে বসেছি, সেখানে তুমি ফাল্‌তু কথা বলছিলে। কি বলছিলে?

গুলজার একটু ভীত হয়। কারণ যে কথা সে বলছিল, কোন সন্দেহ নেই সেটা সুলতানের অপ্রিয়। সে যদি একটু ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করে খুরশীদের কাছে যাচাই করলে সে সঙ্গে সঙ্গে সত্য কথাটা বলে দেবে।

তাই গুলজার নির্জলা সত্য কথা বলে — খোদাবন্দ্, আমি শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া প্রসঙ্গে বলছিলাম।

সুলতান একথা শুনেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁর আসনের হাতলে প্রচণ্ডভাবে ঘুসি মেরে বলেন — ওই লোকটার নাম কখনো আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। খুসরব খাঁয়ের দেওয়া অত সম্পত্তি আর অর্থ আত্মসাৎ করেছে। আমার হুকুমও মানছে না। অথচ অন্য সবাই ফেরৎ দিল। কয়েকজন অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়ার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তারা আর জীবনে ফিরতে পারবে না। ওই নাম আমার সামনে কখনো বলবে না।

এবারে খুরশীদ কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে গুলজারের সমর্থনে বলে — নামটা আমিই প্রথমে উচ্চারণ করেছিলাম সুলতান। আমার মনে হচ্ছিল এই বিষয়ে আপনাকে ব[illegible] প্রয়োজন। কারণ আগে এক ধরণের মানুষ আপনার বিরুদ্ধে যে উলাঘ খাঁকে উ[illegible]

দিতে চেষ্টা করেছিল তা এখন আর গোপন নেই।

— তাতে কি ?

— তাদের মধ্যে অনেকেই শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে শ্রদ্ধা করে। আউলিয়ার ভক্ত হলেই যে সবাই ভাল মানুষ হবে এমন কথা নেই। অনেকে খারাপ রয়েছে তাদের মধ্যে। এখন আপনি বহুদিন রাজধানীর বাইরে আছেন। নিজামউদ্দিনের সেই সমস্ত ভক্তরা দিল্লীতে নিশ্চিন্তে রয়েছে। তারা ষড়যন্ত্র করতে পারে।

— এবারে গিয়ে আউলিয়াকে আর দেখতে পাবে না। ক'দিন পরে ডাক পাঠাচ্ছি। উলাঘ খাঁকে নির্দেশ পাঠাব ওই ভণ্ডকে দেশছাড়া করে দিতে।

খুরশীদ চমকে ওঠে। সে বলে — খোদাবন্দ্ সেই কাজ কি ভাল হবে? তাঁর অসংখ্য অনুগামী রয়েছে। দেশে আর বিদেশে তাঁর অসাধারণ প্রভাব।

— যত প্রভাব থাকুক সুলতানের প্রভাব অনেক বেশী তার চেয়ে। কি বল তোমরা?

সবাই বলে ওঠে — অবশ্যই। হাজার বার।

ঠিক সেই সময়ে শিবিরের বাইরের রক্ষী ভেতরে প্রবেশ করে বলে — একজন অশ্বারোহী দিল্লী থেকে এসেছে খবর নিয়ে।

গিয়াসউদ্দিনের অনুমতি পেয়ে তাকে নিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড় করনো হয়। বার্তাবাহক সুলতানকে যথাযোগ্য কুর্নিশ করে।

— কি খবর?

— সুলতানজাদা পত্র পাঠিয়েছেন মেহেরবান।

গিয়াসউদ্দিন পত্রটি হাতে নেন। পত্রবাহক জানে কোন্ বিষয়ে পত্র দিয়েছে উলাঘ খাঁ। তাই একটা প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষায় দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য সবার চোখ সুলতানের দিকে। সুলতান পত্রটি ধীরে ধীরে খুললেন। জানুর ওপর রেখে পড়তে শুরু করলেন। একটু পড়েই তিনি থেমে যান। ওপরের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে আবার ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মুখমণ্ডল থমথমে এবং রক্তিম হয়ে ওঠে। তিনি পত্র ধরে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে থাকেন। তারপর আবার পড়তে শুরু করেন। কোন ভুল হয়নি। দ্বিতীয় বার পড়েও একই অর্থ। এই বেগম ছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনের প্রথম নারী। রূপ ছিল যেন তার তরবারি। যেমন মোহিত করত, তেমনি শঙ্কারও সৃষ্টি করত। সুলতান নিজের সব কিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিলেন এঁকে। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলেন। জাত্যাভিমান বাধা হয়ে দাঁড়াল ওই রূপসীর। নইলে আজ অমন উপেক্ষিত জীবন যাপন করতে হত না। হারেমে আসতে যেতে তিনি তাঁর বিষণ্ণ মুখ কতবার দেখেছেন। খারাপ লাগত। ওঁর তো কেউ-ই নেই এদেশে। আত্মীয় স্বজন সবাই ফিরে গিয়েছে নিজের দেশ তুরস্কে। বড় নিঃসঙ্গ জীবন ছিল। তবু পড়ে ছিলেন কিসের

প্রত্যাশায়? সুলতানের মন ওঁকে দেখে নরম হ'ল। উপেক্ষিতার প্রতি অনুকম্পা জাগল। তারপর দুর্বলতা। ওই নারীও ছিলেন বুভুক্ষু। উভয়ে উভয়কে চাইলেন সেই রাতে যে রাতে প্রচণ্ড বর্ষণে যমুনার দুকুল ছাপিয়ে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল বারিরাশি। তিনি দেখলেন ওই নারী নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সে দিতে চায় অনেক কিছু ব্যাকুল হয়ে। এইভাবে মাঝে মাঝে যাতায়াত এবং নাসরতের জন্ম। বেগম মাখদুমা-ই-জাহান তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। অনেক দিন বন্ধ ছিল। শেষে সুলতান তাঁকে স্পষ্ট করে বলেন, ওই নারীও তাঁর বেগম — প্রথম বেগম। তিনি একটা ভুল করেছিলেন বলে চিরকাল বঞ্চিত থেকে যাবেন এমন হতে পারে না। পরে বেগমের মনে হয়, সত্যিই তো, সুলতানেরা হারেমে কতশত নারী রাখে। মাত্র একজন উদ্বৃত্ত নারী ভাগ বসাচ্ছে বলে মন খারাপ করার অর্থ হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের খেয়াল হয় তাঁর সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে অনেকে উন্মুখ হয়ে। তিনি পত্রটি পাশে রেখে বলেন — উলাঘ লিখেছে তুর্কী বেগমের মৃত্যু হয়েছে।

একটা অস্পষ্ট মিলিত আওয়াজ উঠে মিলিয়ে যায়।

সুলতান সংযত কণ্ঠে বলেন — কার কখন সময় এসে যায় কেউ বুঝতে পারে না। মেনে নিতে হয়।

— তবু সহ্য হয় না হুজুর।

— প্রথমে তাই মনে হয় ইকবাল। পরে দেখা যায় সব সয়ে যায়। জীবনে জন্ম মৃত্যু থাকবে। উলাঘ এখানে থাকলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারত। ও কী যে না জানে, তাই ভাবি। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব অর্থ সব বিষয়ে ভাল জ্ঞান রয়েছে। তাই মরহুম বেগম তার নিজের মা না হলেও উলাঘকে খুব পছন্দ করতেন। নাসরৎ তার মায়ের ন্যাওটা বেশী ছিল শৈশবে কিন্তু মৃতার বিশেষ টান ছিল জউনার প্রতি। আমাকে না বললে কি হবে, আমি সব বুঝতে পারতাম। ও যতদিন তেলেঙ্গানায় ছিল, আমার ধারনা বেশীর ভাগ রাত্রি ওর নিজের মায়ের মত তুর্কী কোথাও অনিদ্রায় কাটাতেন। তিনি জানতেন তাঁর গর্ভের সন্তান ঠিক উপযুক্ত নয়। তার একজন স্থায়ী অভিভাবকের প্রয়োজন। তাই উলাঘের ওপর ভার দিয়েছিলেন আমার সামনে।

—খুব স্বাভাবিক। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন।

—তোমরা ভেবো না , আমি ভেঙে পড়েছি। এই যে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পত্রবাহক, এর মারফৎ পুত্রকে পত্র পাঠাব। লিখব আমি দিল্লী পৌঁছে যেন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে দেখতে না পাই।

শিবিরে নীরবতা নেমে আসে।

শহর তো শহর দিল্লী শহর। শহরের কী বাহার কী চেকনাই। দেহলি হিন্দুদের পুরোনো শহর। কিন্তু এখন কি আর সেই দেহলির অস্তিত্ব রয়েছে? এই শহর দেবগিরির মত নয়, মুলতানও নয়। এগুলো যদি তলাও হয় তো দিল্লী হচ্ছে সাগর। দিল্লী বলতে একটি মাত্র শহরের কথা মনে হয়। কিন্তু আসলে দিল্লী কি একটি শহর ? দূর থেকে লোকেরা সুলতান তুঘলকের রাজধানী দেখতে এসে ঘুরতে ঘুরতে কাহিল হয়ে পড়ে। কতবার যে কূয়োর জল আর জলাশয়ের জল পান করতে হয় গুনে শেষ করা যাবে না। কতবার যে দোকানের সামনে চৌপায়ার ওপর বসে পেটে কিছু দিয়ে নিতে হয় তার ঠিক নেই। দিল্লী নামেই একটা , আসলে তার মধ্যে ঢুকে রয়েছে একুশটি জনবহুল বসতি যার প্রতেকটি এক একটি বড়সড় শহর। এদের মধ্যে প্রধান হ'ল চারটি। দিল্লী তো রয়েছেই, তার সঙ্গে রয়েছে সিরি। এটাই তো মধ্যমনি। এখানে বাস করতেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী আর কুতুবউদ্দিন। এখন আরও একটা অংশ গড়ে উঠেছে। নাম তার তুঘলকাবাদ। চতুর্থ শহরের নাম ছিল জঁহাপনা।

দিল্লীর ঘরবড়িগুলো হ'ল প্রস্তর আর ইঁট নির্মিত। ছাদ কাঠের আর মেঝে সাদা পাথরের। বিশালাকার শহরে হাজার খানেক পাঠশালা বিদ্যালয় আর মাদ্রাসা রয়েছে। অন্তত একাত্তর বাহাত্তরটি বড় চিকিৎসালয় রয়েছে।

এতবড় শহরের অধীশ্বর হলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক। আর শহরবাসীর মনের অধীশ্বর হলেন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া। বিদ্যুতের চমকেঁ যেমন এক নিমেষে গোটা আকাশটাকে চিরে ফালাফালা করে দেয় তেমনি শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার বহিষ্কার সম্বলিত সুলতানের পত্রের কথা তড়িৎগতিতে প্রতিটি মানুষের কর্নগোচর হ'ল। অনেকে ভয়ে কেঁপে উঠল, অনেকে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা জেনে গেল সুলতান গিয়াসউদ্দিন রাজধানীর মাটিতে পর্দাপণ করার পূর্বেই সুলতান আউলিয়াকে শহর পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে। সুলতানের আদেশ কি উনি অমান্য করতে পারবেন? অথচ উনি না থাকলে মানুষের হৃদয় শূণ্য হয়ে যাবে। দিল্লীর ঐশ্বর্য্যের উৎস হ'ল সুলতানের অপ্রতিহত ক্ষমতা। আর দিল্লীর প্রাণরসের উৎস হ'ল আউলিয়ার অবারিত করুণাধারা। দুটোর একটিকেও যে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু সাধারণ মানুষ বড় অসহায় আর দুর্বল। তাদের বুদ্ধি আছে কিন্তু সেই বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত বলে কাজে লাগে না। তাই তারা সব বুঝেও অবুঝ। তারা জানে আজ সুলতান যদি নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে মেনে নিতেন আর নিজামউদ্দিনের যদি সুলতানের প্রতি কোন ক্ষোভ না থাকত তাহলে শুধু দিল্লী কেন সারা দেশে শান্তি বিরাজ করত। বাইরের শত্রুর আক্রমন কিংবা দেশের এখানকার ওখানকার দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের মনে এমন ত্রাস সৃষ্টিকারী অশান্তির সঞ্চার করতে পারত না।

অথচ পরিবেশ ছিল শান্তির। এত বড় শহর দিল্লী. এত লোকজন, কত রাজা

মহারাজা , নবাব সুলতান রাজত্ব করে গেলেন যুগের পর যুগ ধরে কিন্তু তার সৌন্দর্যের প্রতি অধিপতি থেকে শুরু করে সাধারণ অধিবাসীদেরও বরাবরের নজর। দিল্লীর প্রতি প্রগাঢ় মমতা সবাই অনুভব করে এসেছে। নইলে এই বিশাল শহরের তিনদিকে উদ্যান বেষ্টিত হবে কেন? শুধুমাত্র পশ্চিম দিকে পাহাড়। অবশিষ্ট তিনদিকে উদ্যান । নানারকমের ফুল ফুটে থাকে সারা বছর। কোন কোন ফুলের পরিচর্যার প্রয়োজন হয়, কোন ফুল আপনা থেকে ফোটে, বড় হয় আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ে। পড়ে গিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। যাতে সে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত না হয়ে যায়, তার জন্য রেখে যায় তার বীজ। সেই বীজ বৃক্ষের জন্ম দেয় । কারণ বৃক্ষই আবার পত্র পুষ্পে ভরে উঠবে। মানুষের মত তাদের মধ্যেও নিঃশব্দে বির্বতন চলছে। সেই বির্বতনে নেই কোন অশান্তি, নেই বাদ বিসংবাদ। মানুষ এমন পারে না কেন? প্রশ্নটা সাধারণ মানুষের নয়। প্রশ্নটা উলেমাদের , পণ্ডিতদের। কারণ তারা অনুভব করেছিল, একটা ঘোরতর কিছু ঘটতে চলেছে। এভাবে বরাবর চলতে পারে না।

মাতা মাখদুমা -ই জাহান পুত্র উলাঘ খাঁকে ডেকে প্রশ্ন করেন —তোমাকে আজকাল এমন দেখি কেন?

বিরক্ত উলাঘ বলে— কেমন দেখ?

— অন্য রকম। সব সময় কি যেন ভাব। কারও সঙ্গে ভাল ভাবে করে কথা বল না। একটা রাগ রাগ ভাব।

— দেশটা আপাতত আমাকে চালাতে হচ্ছে বলে।

—দেশ তোমার পিতাও চালিয়ে এসেছেন এতদিন। কোনদিন মনে হয় নি বিরাট বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

— উনি অনেক উঁচু দরের, আমি অতি সামান্য মানুষ।

বেগমসাহেবা বিস্মিত হন। পুত্রের কথাবার্তার মধ্যেও পরিবর্তন। তিনি রেগে উঠে বলেন— এই ক'দিনেই যদি তোমার এই দশা হয় তাহলে বুঝতে হবে সুলতান হওয়ার উপযুক্ত এখনও তুমি হও নি।

ব্যঙ্গের সুরে উলাঘ খাঁ বলে— তাই নাকি? তোমার সেরকম মনে হচ্ছে ? দেখা যাক।

উলাঘ সহসা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায় নির্বাক মাতাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে। বেগম সাহেবার মন খুব মুষড়ে যায়। এই পুত্রকে তিনি সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। আগে কখনও সে তাঁকে অসম্মানজনক কিছু শোনায় নি। অথচ আজ প্রকারান্তরে অপমান করে গেল। তাঁর কানে ভেসে এসেছে সে আজকাল প্রতিষ্ঠিত অথচ

অনভিপ্রেত কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে। তাছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়ার গোঁড়া সমর্থক বলে পরিচিত কয়েক ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করে। দেখা করা দোষনীয় কিছু নয়, তবু সুলতান যখন আউলিয়াকে পছন্দ করেন না তখন তাঁদের সঙ্গে বিশেষ করে এই সময়ে এত ঘনিষ্ঠতা করার দরকার কি ? সুলতান ফিরে এলে তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলে চলত। তিনি খুব বুদ্ধিমান। অবুঝ নন তিনি। বরাবর তিনি নীতি নিষ্ঠ। আউলিয়াকে তাঁর অপছন্দ করার কারণ নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন তিনি। হয়ত তাঁর সঙ্গে সামনা সামনি আলাপ করলে তাঁকে ভাল লাগত। পুত্রের এই মনোভাব বেগম সাহেবার ভাল মনে হয় না। এ যেন জেনে শুনে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা। যে মানুষটা এতদিন পরে গৃহে ফিরছেন তিনি যাতে সব দেখে শুনে খুশী হন সেটাই দেখা উচিত ছিল উলাঘের। অনেক দিন পরে নিজের লোকের কাছে ফিরে মানুষ শান্তি চায়। হাসি মুখ দেখতে চায় সবার। নিজেও হাসতে চায়।

বেগম সাহেবা ঠিকই ধরতে পেরেছেন, উলাঘ সত্যই পাল্‌টে গিয়েছেন। সে পিতার পছন্দমত আমীর ওমরাহদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নতুন লোকদের নির্বাচিত করছে। তার ঘনিষ্টদের মধ্যে রয়েছে মৌলানা নিজামউদ্দিন ইন্‌তিশার, মালিকজাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ, সাদুদ্দিন মনতিক্ প্রভৃতি অনেকে যারা খুব বেশী সুনামের অধিকারী নয়। এদের মধ্যে একজন সম্বন্ধে অন্তত উলাখ খাঁ অন্ধ নয়। তাকে সে তেলেঙ্গানা থেকে চেনে। তবে হ্যাঁ, লোকটা তার একটা সাংঘাতিক দুর্বলতার কথা জানে। তারই পরামর্শে তেলেঙ্গানাতেই সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা ভেবেছিল একবার— মাত্র একবার। তবে শেষে তার সাহায্যেই সেই যাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়। পরিবর্তে অবশ্য কবি হাকিম উবেইদ, মালিক কাফুর ইত্যাদি অনেকের প্রাণ যায় সুলতানের আদেশে। আসলে তারা রাজা লুদ্দারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে অবরোধ উঠে যায়। পরিবর্তে রাজা তাদের দেবে বিপুল অর্থ। সেই সঙ্গে উলাঘ খাঁকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্রের কথা এত প্রচার পেয়েছিল যে আমীর ওমরাহ সবাই নিজেদের সৈন্যদল নিয়ে উলাঘকে পরিত্যাগ করেছিল। তাতে শাপে বর হ'ল উলাঘ খাঁয়ের। তার নিজস্ব ষড়যন্ত্রের কথা চাপা পড়ে গেল। সে শুনেছিল মালিক কাফুর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শোনার সময় সুলতানকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছিল কিভাবে তাঁর নিজের পুত্র তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু সুলতান সেই কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বাঁচার তাগিদে অমন আবোল তাবোল অনেক কথা বলে। সাদুদ্দিন মনতিক সেই সময় নিজে থেকে দিল্লীতে ছুটে গিয়ে সুলতানকে আগেভাগে বলে দিয়েছিল কাফুরেরা কি বলতে পারে। তাই সাদুদ্দিনকে হাড়ে হাড়ে চিনেও উলাঘ খাঁ তাকে দলে নিয়েছে। দলে নিয়েছে আর এক কারণে । সাদুদ্দিন হল নিজামউদ্দিন আউলিয়ার একনিষ্ঠ ভক্ত।

পিতা গিয়াসউদ্দিন আউলিয়াকে প্রচণ্ডভাবে চটিয়ে দিয়েছেন। এর ফল খারাপ হতে বাধ্য। তাই এই ব্যাক্তিকে দলে রেখে আউলিয়াকে সন্তুষ্ট রাখা যাবে। দেখাতে হবে, তার পিতা যে মনোভাবই পোষণ করুন না কেন সে ওসবের মধ্যে নেই। সে অন্য পথের পথিক। শেখ নিজামউদ্দিনের প্রতিও তার যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। যদিও মনে মনে সে জানে তার পিতা এই মানুষটিকে সহ্য করতে না পারলেও তিনি একনিষ্ঠ ঈশ্বর বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, তিনি স্বল্পাহারী, নিয়মিত কোরাণ পাঠ করেন, পাঁচ ওকত নমাজ পড়েন। প্রতি বছর রোজা রাখেন অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে।

অথচ সে নিজে? ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে না ঠিকই। তবে একনিষ্ঠ কখনই নয়। সুফী সাধুদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে বটে, তবে তারা ধর্মের নামে ভণ্ডামী করলে শেষ করে দিতে দ্বিধা বোধ করবে না। এটা সে ভালভাবে জানে। তবু নিজামউদ্দিনকে একজন আমীর মারফৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিনের হুকুম জানিয়ে দিয়েছে যথা সময়ে। এই হুকুম যে সুলতানের পুত্রের নয়, এই কথাটা বুঝিয়ে বলার জন্য আমীরের সঙ্গে পাঠিয়েছিল সাদুদ্দিন মনতিককে । সে আউলিয়াকে বলেছে উলাঘ খাঁ হ'ল 'অবস্থার দাস আর সুলতানের হুকুমের নফর। সে নিজে যদি সুলতান হ'ত তাহলে এই ঘোর অন্যায় কিছুতে ঘটতে দিত না। বৃদ্ধ সুলতানের ভীমরতি ব্যতীত এ আর কিছু নয়। সুলতান নিজেও স্বীকার করেন তাঁর কোন কিছু মনে থাকে না আজকাল। এক কথা বারবার বলেন।

শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া সাদুদ্দিন মনতিকের মুখে সব শুনেছিলেন শুনে একটু হেসেছিলেন। সুলতান রাজধানী এসে পৌঁছোনোর আগেই তাঁকে দিল্লী ছেড়ে যেতে বলেছেন।

আউলিয়া নির্বিকার কণ্ঠে সাদুদ্দিনকে বলেন— দিল্লী হনাজ দূর অস্ত।

সাদুদ্দিন অর্থ না বুঝে কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে উলাঘ খাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাতে রওনা হ'ল। পথে দেখা হয়ে গেল মালিক জাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ-এর সঙ্গে। সাদুদ্দিন তাকে দেখে উৎসাহিত হয়ে বলে— ওখানেই যাচ্ছেন নাকি মালিকজাদা?

— তাছাড়া অন্য কোন পথ আছে নাকি? সব ঠিক মত চললে বৃদ্ধ বয়সে আর একটি পথ রয়েছে। সেটি হ'ল মক্কার পথ।

সাদুদ্দিন মনে মনে হাসে। যে লোকটার মনে এত বেশী উচ্চাশা সে যাবে মক্কায়। মাঝ পথেই ধূ ধূ বালিরাশির মধ্যে বুকের ছাতি ফেটে মরবে। বরং বলা যেতে পারে মৌলানা ইনতিশার যেতে পারেন। তিনি ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকলেও একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে নাকি। কী সেই উদ্দেশ্য তা অবশ্য কখনো প্রকাশ করেন না।

এদের সবার অবিরত উস্‌কানিতে উলাঘ খাঁয়ের মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। এক কালে সে আলাউদ্দিন খিলজীকে খুবই অপছন্দ করত চক্রান্ত করে নিজের পিতৃব্যকে খুন করার জন্য। তার ধারণা ছিল এভাবে মসনদের আইন-মাফিক উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। অথচ আলাউদ্দিন এমনিতেই হতে পারতেন। কারণ পিতৃব্য তথা শ্বশুরের পর মসনদ তাঁর বাঁধা ছিল। কিন্তু তর সইছিল না। জালাল-উদ্দিনের বয়স হলেও শক্তসামর্থ ছিলেন। আলাউদ্দিন সেই সুন্দর স্বাস্থ্যের দিকে বিষ নজরে দেখতে শুরু করলেন প্রথমে। তারপর ধৈর্য হারাতে থাকেন। ভাবলেন, সুলতানের স্বাভাবিক মৃত্যুর দিন যখন আসবে তখন তাঁরও মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসবে। সুলতানী উপভোগ করবেন কবে? তাছাড়া তিনি অনেক কিছু করতে চান যা জালালউদ্দিনের অভিপ্রেত নয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন পিতৃব্যকে মসনদ থেকে অপসারিত করতে হবে। কিন্তু জনপ্রিয় সুলতান মসনদ থেকে সরে গিয়ে বেঁচে থাকলে অনেকে নতুন সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তাই একেবারে ধরা থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়েছিল।

যে উলাঘ খাঁ আলাউদ্দিনকে নীতিহীন প্রতারক বলে ঘৃণা করে এসেছে সে যে বন্ধুবেশী শয়তানদের প্ররোচনায় একই পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, সেকথা বুঝতে পারে না। তার মজবুত বিবেকে এক সময় ঘুন ধরল। সেই ঘুণাক্ষর একমাত্র তার গর্ভধারিনী ব্যতীত কেউ বুঝতে পারল না। বেগম সাহেবাও চূড়ান্ত কিছুর কথা ভাবতে পারেন নি। আর ভগিনী খোদাবন্দজাদা তো কিছুই অনুমান করেনি। তার স্বামী মালিক সাদি যখন বলেছিল যে, সুলতানজাদার রকম সকম আজকাল অন্যরকম ঠেকছে, তখন খোদাবন্দজাদা হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল— কি রকম ঠেকছে ?

— পুরনো আমীরদের একেবারে আমল দিচ্ছে না। কথায় কথায় তাদের অপমানিত করছে। ভাল না এসব। অনেকে অন্যরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে।

— তোমার তাতে কি?

— আজকাল আমাকেও সহ্য করতে পারছে না।

— সুলতান এলে ঠিক হয়ে যাবে।

— তিনি এলে, তুমি তাঁকে বলে আমাকে দূরে কোথাও শাসনকর্তা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।

—সে কি ! রাজস্বের ভার রয়েছে তোমার ওপর। সুলতান তোমার ওপর কতখানি নির্ভরশীল । তুমি সুলতানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছ। সেখান থেকে কেউ কি ইচ্ছা করে নির্বাসনে যেতে চায়!

— আমি অনেক ভেবে চিন্তে কথাটা বলেছি।

খোদাবন্দজাদা কিছু না বুঝে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে— তোমার

পুত্র দাবর মালিকের কি হবে? সে এখন ছেলেমানুষ। সে-ও চলে যাবে তোমার সঙ্গে?

—তুমি যাবে না?

— সুলতান যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন অন্তত নয়।

— যা ভাল বোঝো কর। তবে আমার কথাটা ওঁকে বলো। আমি রাজধানী থেকে দূরে চলে যেতে চাই।

উলাঘ খাঁয়ের মনে পড়ে খুব শৈশবে শিশুরা যখন মা বা ধাইমায়ের কাছ-ছাড়া হয়না তখনি গিয়াসউদ্দিন তাকে তাঁর অশ্বের সম্মুখে বসিয়ে চলে যেতেন নদী পেরিয়ে অনেক দূরে। কদমে ছোটাতেন অশ্ব। ধীরে ধীরে উলাঘের কদমে ছোটার ছন্দ রপ্ত হয়ে যায়। পিতা একদিন তার হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে অশ্ব থেকে অবতরণ করে বললেন— ছোটাও। সেদিন একটুও অসুবিধা হয়নি। এই ভাবে তিনি অসিযুদ্ধ শিখিয়েছেন, বর্শা নিক্ষেপ করা শিখিয়েছেন। তারপর একদিন রাজনীতির আবর্তে উলাঘ খাঁ এবং অন্যান্য সন্তানদের থেকে তিনি একটু দূরে সরে যান। তাই বলে উলাঘের শিক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে ছাড়েন নি। কুতলঘ খাঁকে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন গৃহশিক্ষক রূপে। উলাঘ খাঁ বরাবর ভেবেছে সে যেখানে এসে পৌঁচেছে তার কৃতিত্বের সিংহ ভাগ দাবী করতে পারেন তার পিতা। আজকাল অবশ্য তার ভাবনা অন্য ধরণের। সে আজকাল ভাবে পুত্রকে শিক্ষা পিতাই তো দেবেন। বাইরের কেউ এসে দিয়ে যাবে না। সুলতানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও তার পিতা কখনো তাকে তরুণ বয়সে পাহাড়-পর্বতে শিকারে পাঠান নি। শিকারে না গেলে যে স্নায়ু মজবুত হয় না একথা তাঁর অজানা ছিল না। সুলতান হয়ে তিনি আত্মীয় অনাত্মীয় সবাইকে এক একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের পাঁচ পুত্র সন্তানকে কিছু দেননি। ভগিনী খোদাবন্দজাদার স্বামীকেও উচ্চপদে বহাল করলেন। পাঁচ ভাইয়ের কপালে জুটলো শুধু পদবী। এই সব পদবীর কোন মূল্য নেই। এতে ক্ষমতা আসেনা, অর্থও আসেনা। সে সুলতান হলে প্রথমেই তার নিজের পদবী পালটে ফেলবে। একদিনও সবুর করবে না। সুলতান তার বিষনজরে তখন থেকে পড়েছেন যখন সে তেলেঙ্গানা থেকে দিল্লী ফিরে এসে প্রথম জানতে পারে, তার মতিগতি জানার জন্য তিনি সর্বক্ষণ একজনকে তার কাছাকাছি রেখেছিলেন, যা দ্বিতীয় কোন প্রাণী জানত না। হ্যাঁ, তার নাম মালিক হামিদ। গিয়াসউদ্দিন লক্ষ্মণাবতী যাত্রা করার পরের দিনই তাকে তুলে গুম ঘরে নিয়ে আসা হয়। উলাঘ খাঁ নিজে তার সামনে গিয়ে হাজির হয়।

—তেলেঙ্গানা কেন গিয়েছিলে?

— আপনার সঙ্গে থাকতে।

—কেন?

— সুলতানের সেই রকমই হুকুম ছিল।

— তোমার কাজ কি ছিল?

— আপনার ওপর লক্ষ্য রাখতে যাতে আপনার ক্ষতি কেউ করতে না পারে।

—হ্যাঁ, তোমার ব্যবহারে তেমন মনে হত বটে মাঝে মধ্যে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা কি?

—অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

একজন এক-চক্ষু লোক রয়েছে গুম-ঘরের তদারকিতে যার মুখ গুটিবসন্তের জন্য ক্ষতবিক্ষত। নাম তার আবু। মানুষকে কত ভয়ঙ্করভাবে কষ্টদায়ক শাস্তি দেওয়া যায় সেই বিষয়ে তার উদ্ভাবনীশক্তির তুলনা নেই গোটা দেশে।

উলাঘ খাঁ আবুকে বলে— আমি বিকেলের দিকে আবার আসব। তখন যেন সত্যি কথা বলে।

— আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তখন সব কিছু বাৎলে দেবে।

প্রকৃতই সব সত্য কথা বলে দিয়েছিল মালিক হামিদ। অবশ্য তখন তার চেহারার আর আকৃতির অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

উলাঘ আবুর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল— তোমাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছিল দেখছি।

— ঠিক বলেছেন হুজুর। এ খুব শক্ত চিজ। তবে এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

— এ আর কোন কাজে লাগবে কি?

— না, কোন কাজে লাগবে না।

— তাহলে ব্যবস্থা করে ফেল।

আবু তখনই তৎপর হতে চায়। উলাঘ খাঁ দুহাত তুলে বাধা দিয়ে বলে— না না, এখন নয়।

মালিক হামিদ কেঁদে ফেলে বলে— আমার অল্পবয়সী স্ত্রী আছে, সে সন্তান-সম্ভবা।

— শোন হামিদ। আমার বিরুদ্ধে কেউ গেলে তার ক্ষমা নেই। তুমি আগুনে হাত দিয়েছিলে।

উলাঘ খাঁ ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। মালিক হামিদকে পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি এর পরে।

উলাঘ খাঁ বুঝল। তার তদারকিতেই হামিদ দুনিয়া থেকে সরে গেল। আগেও এমন

কত হয়েছে। পরে তো হবেই। শীঘ্রই এই ধরণের আর একটি সম্ভাবনার দিন এগিয়ে আসছে। হামিদকে সরিয়ে ফেলে সে আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করল। হামিদ লোকটার অন্য পরিচয় নেই।সে শুধু তার শত্রু। শত্রুর বিশেষ কোন আকৃতি নেই তার কাছে। তার জীবনের সুখদুঃখের ইতিহাস থাকে না। সে প্রাণহীন জড় পদার্থের মত। তার দিকে চাইলে অনুকম্পা জাগার প্রশ্ন ওঠে না। যে সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাকে চূড়ান্ত শাস্তি পেতে হবে। তাকে সে রেয়াত দেবে না। এর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তার বদনাম হতে পারে। সেই বদনাম সে গ্রাহ্য করে না। যে পুরুষের ক্ষমতা আছে সে যদি সব সময় সাধারণ মানুষের মন যুগিয়ে চলতে চায় তাহলে অসাধারণ কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বুঝতে হবে সে দুর্বল চিত্তের। লোকে তার গুণগান করে মন ভিজিয়ে সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে। দৃঢ়চিত্তের মানুষের কাছে এরা ঘেঁষতে পারেনা। বদনাম করলেও আড়ালে আবডালে করে। কারণ শাস্তির ভয় আছে।

বন্ধুরূপী সহচরদের সংস্পর্শে থেকে থেকে উলাঘ খাঁয়ের আরও পরিবর্তন হ'ল। যে উলাঘ একসময়ে পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্তের সময়ে অশ্ব থামিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত, যে উলাঘ দূর থেকে মহুয়া ফুলের সুঘ্রাণ পেয়ে তার উৎস সন্ধানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত, আকাশের বুকে অপসৃয়মান মেঘকে নানা রকম আকার নিতে দেখে বিমুগ্ধ হত এককালে, সেই উলাঘ এখন আর আকাশের দিকে চাইবার অবকাশ পায় না। সে বিস্মৃত হয়েছে যে সারা দুনিয়াকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে এক স্বর্গীয় চন্দ্রাতপ, যার বুকে নিত্য নতুন সৌন্দর্যের খেলা দেখে সাধু সুফীরা অনুপ্রেরণা পেয়ে কত অজস্র ভক্তিগীতি রচনা করে চলেছেন। উলাঘ খাঁ এখন অন্য মানুষ। এখন তার কল্পনা সঙ্কুচিত এবং নিষ্পেষিত, ভাবালু দৃষ্টি নেই, এখন সে দেখে শুধু রক্ত। কোন সময় নিজের মত অন্যমনস্ক হতে চাইলেও পারে না। সহচররা পায়ের নীচের শক্ত মাটির কথা হামেশা মনে করিয়ে দেয়।

কে যেন ক্রমাগত উলাঘের কানে ফিসফিস করে বলে চলে—সময় নষ্ট করোনা জউনা। প্রথম সুযোগই কাজে লাগাতে হবে। ভেবো না, তোমার চার ভাইকে যতটা সরল এবং নিশ্চেষ্ট দেখায় তারা ততটাই নিষ্পাপ। দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে এক মুহূর্তের বিলম্বে জন্মের মত সুযোগ হারিয়ে যায়। এমনকি প্রাণও চলে যেতে পারে। তোমার নিজের যেমন পরামর্শদাতারা রয়েছে, ওদেরও রয়েছে। ওদের মনে তারা ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে অবিরত।

আনমনা উলাঘ খাঁ চমকে উঠে স্বগতোক্তি করে— ঠিক, ঠিক।

সেই সময় একজন বাঁদী এসে বলে— বেগমসাহেবা—

— বেগম সাহেবা? কে, মা?

—না, ছোট বেগমসাহেবা।

এর নাম আবার ছোট বেগমসাহেবা হয়ে গেল কবে থেকে? কিভাবে যে চালু হয়। উলাঘ খাঁ মজা পায়। সে বলে— যাচ্ছি।

— উনি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—উলাঘ আশ্চর্য হয়ে ভাবে, সেকি ! এই সদরে এসেছে। এ যে দরবার কক্ষের পাশের কক্ষ।

তাড়াতাড়ি উঠে পর্দা সরাতেই দেখে পত্নী দাঁড়িয়ে।

— তুমি এখানে যে?

— কোথায় যাব তবে?

—কেন? হারেমে?

—বেগমেরা হারেমে প্রতীক্ষারত থাকে। সেই প্রতীক্ষা যদি অনন্তকাল ধরে চলে, তাহলে আর বসে থাকা যায় না। নিজেকে সক্রিয় হতে হয়।

— ভীষণ ব্যস্ত আমি। তোমার কাছে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারিনি।

—অথচ এখানে একা একা বসে রয়েছ।

—একা নই।

— অন্যজন কে? তোমার আর এক সত্তা?

—এ কথার অর্থ?

— আমি জানি।

— কি জান?

— হারেমে চল।

কৌতুহলী হয়ে উলাঘ খাঁ বেগমের পেছনে চলে। তবু হয়ত সঙ্গে যেত না। বেগমের সঙ্গে কথা বলে তার ভাল লাগল। একটা স্নিগ্ধ ভাব। যতই রেগে কথা বলুক, ওর চেয়ে মঙ্গল তার কেউ চায় না। ও তার সন্তানের জননী। তাকেও ভালবাসে।

শয্যায় বসে উলাঘ বলে— এবারে বল।

— কি বলব?

— অন্য জন কে ?

বেগম বিষাদভরা কণ্ঠে বলে— আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি তোমার মধ্যে ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্ব চলছে। আগে তোমার মধ্যেকার ভাল ছিল প্রবল, আর এখন ঠিক তার বিপরীত। এখন মন্দটা তোমাকে পেয়ে বসেছে। সেই মন্দ তোমার চোখের কোলে, তোমার মুখের ভাঁজে ভাঁজে ছবি এঁকে চলেছে। এইভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিন পরে তোমাকে দেখে আমারই আতঙ্ক হবে।

— কী যা তা বলছ?

— আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি যা অনুভব করছি তাই বলছি, তুমি যেমনই হও না কেন, তোমার মধ্যে স্বভাবিকতা ছিল। আর সেটাই ছিল তোমার সৌন্দর্য। সেই স্বাভাবিকতা তুমি হারাতে বসেছ।

— সাম্রাজ্যের ভার কাঁধে চাপালে স্বাভাবিক থাকতে পারে কোন্ মানুষ?

— স্বয়ং সুলতানের দিকে চাইলেই বুঝতে পারতে।

সুলতানের নাম শুনে উলাঘ খাঁ সহসা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। তার মনে হয় স্ত্রীর মাথাটা নিয়ে পাষাণের দেয়ালে ঠুকে ঠুকে থেঁতলে দেয়। মনে হয় দুহাত দিয়ে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে দেয়। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলে নেয়। মনে মনে ঠিক করে, আর একবার যদি সুলতান গিয়াসউদ্দিনের গুণগান গায় তাহলে শেষ করে দেবে।

উলাঘ খাঁ দেখে বেগম তার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বলে—আমি অতি সামান্য। পিতার মত যোগ্য নই।

—তোমার কি হয়েছিল সুলতানজাদা?

— আমার? কিছু না তো?

— মনে হল, তুমি কেমন হয়ে গেলে। হাতের কাছে একটা কিছু খোঁজার চেষ্টা করলে। নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠল, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হ'ল। তোমার চোখের মণি ক্ষণেকের জন্য অদৃশ্য হ'ল। শুধু সাদা অংশ দেখা যাচ্ছিল। কি হয়েছিল তোমার?

— কিছু না। আমি এখন যাই।

—হ্যাঁ, তাই ভাল। তবে, যে বিবেকের কথা তোমার মুখে আগে অনেক শুনেছি, সেই বিবেকের কাছে তোমাকে যেন কখনো জবাবদিহি দিতে না হয়।

উলাঘ খাঁ নিষ্ক্রান্ত হয়। বেগম সাহেবা ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে শিশু পুত্রের মাথা দুহাতে চেপে ধরে বলে ওঠে— তোকে আমি এমন হতে দেবো না। তার জন্যে যদি মসনদ ফস্‌কে যায়, তবু ভাল। মসনদের জন্য উন্মাদ হয়ে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলিস না। স্বাভাবিকভাবে এলে ভাল, নইলে দেশ ছেড়ে চলে যাবি। এ আমি সইতে পারিনা। দিনের পর দিন একটা মানুষ তিল তিল করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সহ্যের অতীত এটা। মানুষটা কতখানি সম্ভাবনাময় ছিল। কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত উচ্চাঙ্গের রসিকতা— কোথায় মিলিয়ে গেল সব।

বেগম সাহেবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেও উলাঘ খাঁয়ের স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগে গেল। বেগম সাহেবা তাকে যেখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল

সেখানেই সে আবার ফিরে এসে বসে পড়ল। তার কপালের দুপাশের রগ তখনো দপদপ করছিল। বাতায়ণ পথে মৃদু হাওয়া এসে গায়ে লাগছিল। আরাম বোধ হচ্ছিল তার। দূরের রাজপথ দেখা যাচ্ছিল। দুটো হাতি নিয়ে চলছিল দুই মাহুত। সাধারণ হাতি। গায়ে সাজসজ্জা নেই। একটা ডুলি চলে গেল, পেছনে পেছনে একজন ঘোড়সওয়ার। নিজের পাহারায় বেগমকে কোথাও নিয়ে চলল কেউ বোধ হয়।

মাথার দপ্‌দপানি কমে যায় ধীরে ধীরে। কিন্তু তার মনে হতে থাকে যেন অনেকক্ষণ ধরে কোন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করেছেন। পরিশ্রম করার পর যেমন ক্লান্ত মনে হয় ঠিক তেমনি। ওই ক্ষণেকের ধৈর্যচ্যুতির জন্য কি একটা শক্তিক্ষয় হয়েছে তার? কিংবা অপরাধবোধ?

না, অপরাধবোধ নয়। এখন ওই সব নিয়ে চিন্তা দুর্বলতার নামান্তর মাত্র। এ সব চিন্তাকে আস্কারা দেবে না সে কিছুতে।

সেই সময়ে প্রবেশ করে মালিকজাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ। উলাঘ খাঁকে একা পেয়ে সে খুব আনন্দিত হয়। সব সময় সবাই তাকে ঘিরে থাকে। নিরিবিলি একেবারে পাওয়া যায় না। সুলতানের কাজ দেখতে হয় বলে, এখন তো একেবারেই সময় নেই। অথচ উদ্দেশ্যটা যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য মাঝে মাঝে সুলতানজাদাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। কত লোক কত আরজি জানায় প্রতিদিন, সুলতানজাদার কি খেয়াল থাকে? তাই কৌশলে মৌলানা ইনতিশারকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। নইলে সে তো সঙ্গে আসছিল। তারও নাকি উলাঘ খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। ইনতিশার এমনিতে খুব বুদ্ধিমান ও মতলববাজ হলেও তার ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রয়েছে। সেই জন্যই তার চরিত্রে হয়ত সাদাসিধে একটা দিক রয়েছে যার ফলে অনেক সময় সাধারণ বিষয়ে তাকে ধোঁকা দেওয়া অসুবিধা হয় না। সে না হয়ে অন্য কেউ হলে কখনোই মালিকজাদার সঙ্গ ছাড়ত না।

— কি মনে করে আইয়াজ? একা কেন? বিশেষ মতলব কিছু?

— আমার চরিত্র তো আপনার কাছে পড়া কিতাবের মত। গোপন করার কিছু নেই আমার।

— আসল কথা চটপট বলে ফেল। আমার মেজাজ আজ খুব সুবিধের নয়।

— সুলতান তো কয়েকদিনের মধ্যে রাজধানীতে এসে পৌঁছোবেন।

—হ্যাঁ, দশবারো দিন বড় জোর।

— আমার কথাটা খেয়াল রাখবেন হুজুর।

— কোন্ কথাটা?

— আমাকে আপনি যে কাজে লাগাবেন বলেছিলেন? আমি প্রস্তুত। আপনি সুলতান হলে আমাকে প্রধান উজির করে নিতে ভুলবেন না। সেই আশায় দিন গুনছি।

এতক্ষণে উলাঘ খাঁ সতেজ আর সজাগ হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে যায় সামনের এই ব্যক্তিটি তাকে আভাসে বলেছিল, উলাঘকে সুলতান করার জন্য সে নিজের দুই হাত রক্তাক্ত করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না। আর এই কথার একমাত্র গূঢ় অর্থ হ'ল নিজের হাতে সে সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে শেষ করে দিতে পারে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করে উলাঘ খাঁ— তোমার কথার অর্থ তুমি বোঝো?

আইয়াজ মানুষটি এমনিতে বেশ ভাল। তার দয়া মায়া রয়েছে। সে নীতিনিষ্ঠও ছিল। পাপাচারকে ঘৃণা করত। একসময় সে ভেবেছিল প্রতিদিনের ক্লেদাক্ত, জীবন থেকে সরে গিয়ে সে নির্মল জীবন যাপন করবে। কিন্তু কতকগুলো কারণে তার মধ্যে হঠাৎ এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। সে এখন অন্য মানুষ। তাকে এখন উচ্চাশা পেয়ে বসেছে। অনেক বড় হয়ে ওঠার নেশায় আচ্ছন্ন সে। সে জানে এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তবু উপায় নেই। বড় তাকে হতেই হবে। সে বলে— হ্যাঁ, আমি বুঝে সুঝে ঠাণ্ডা মাথায় বলছি।

— বিফল হলে পরিণাম জানা আছে তোমার?

— আছে সুলতানজাদা।

— তাহলে প্রস্তুত থাক। তুমি ঠিক সময়ে ডাক পাবে।

মালিকজাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ বিদায় নেওয়ার একটু পরে একজন অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হয়। তাকে উলাঘ খাঁয়ের সামনে আনা হলে সে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের একটি পত্র তার হাতে দেয়।

উলাঘ খাঁ প্রশ্ন করে— সুলতানের তবিয়ত কেমন আছে?

— খুব ভাল মেহেরবান। তবে উনি একটু ক্লান্ত। উনি বলেছেন পত্রে সব বিস্তারিত ভাবে লেখা রয়েছে।

—তুমি এখন যাও। আমি আজ সন্ধ্যায় এই পত্রের উত্তর তোমাকে দেবো।

সামনে ঝুঁকে কুর্নিশ করে পত্রবাহক বিদায় নেয়।

সুলতান লিখেছেন ঃ

প্রিয় পুত্র, আমি দৃঢ় আশা রাখি যে আমার অনুপস্থিতিতে তুমি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করছ। তোমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পেরেছি বলে অতদূর দেশে নিশ্চিন্তে গিয়েছিলাম এবং নির্ভাবনায় থাকতে পেরেছি। অশান্তির ভয় থাকলে যুদ্ধাভিযান অনেক সময় সফল হয় না। বঙ্গভূমিতে যে ব্যবস্থা করে এসেছি, দীর্ঘদিন আমাদের আর কোনো অশান্তি ভোগ করতে হবে না। তবে তাতার খাঁকে ওখানে রেখে আসতে হ'ল সোনার গাঁ-এর শাসনকর্তা রূপে। সে আমার পোষ্যসন্তান হলেও নিজের পুত্রের মত বিশ্বাসী। ও তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা

করে। অনেক দিন পরে আমি যখন আর থাকব না, তখনও ওর ওপরে ভরসা রাখতে পার।

আসল কথা লেখার আগে একটা অপ্রিয় কথা বলে নিচ্ছি। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া যদি খুসরব খাঁয়ের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত সম্পদ-এর মধ্যে যদি প্রত্যার্পণ না করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন আমি রাজধানীতে পদার্পণ করার আগে দেশ ছেড়ে চলে যান। এই আমার দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ সাবধান বাণী। আমি বরাবর নীতি-নিষ্ঠ।

এবারে আসল কথায় আসি। আমি রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌছোব আর মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যে । আমি সেনাবাহিনী নিয়ে সোজা রাজধানীতে প্রবেশ করতে চাই না। আমার ইচ্ছা রাজধানীর অদূরে নদীর তীরে পছন্দমত স্থানে সমস্ত সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হব। সেখান থেকে তাদের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই বোধহয় আমার জীবনের শেষ অভিযান।

এবারে পরিশ্রম বেশী মনে হয়েছে। এক এক সময় কষ্টও হয়েছে। সেদিন বসে বসে গুণে দেখছিলাম কতগুলো যুদ্ধ আমি জয় করেছি। মাঝে মাঝেই হিসাব করি। উনত্রিশবার তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তাই আমি মালিক -ইল-গাজী।

এবারে আমি রাজধানীর উপকণ্ঠে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে চাই একা একা। এতদিন লক্ষ লক্ষ সিপাহীদের সঙ্গে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই। এই জন্যই বোধহয় সুলতান বা মহারাজদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাজধানীর পাশে এইভাবে কয়টা দিন অতিবাহিত করার নিয়ম চালু আছে অতীত কাল থেকে। একটা কাজ করতে হবে তোমার। ভাল একজন বাস্তুকারকে যোগাড় করতে হবে যে দারুবিশেষজ্ঞ। তাকে দিয়ে কাঠের একটা ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করবে। কারণ আমি তো একা থাকব না। তুমি থাকবে, আমীর ওমরাহ থাকবে। সেখানে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করব। এবারে রাজধানীতে সবাইকে দেখতে পাব। শুধু নাসরতের মাকে দেখতে পাব না। সে আমার জীবন থেকে বরাবরের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। দিন কখন যে কার ফুরিয়ে যায় কেউ জানতেও পারে না। অথচ এটাই বিধিলিপি।

সুলতানজাদা উলাঘ খাঁ পিতার পত্র পেয়ে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে একবার ভাবে মালিকজাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজকে এখনই ডেকে পাঠাবে আবার। কিন্তু সে বাড়িতে পৌছোয়নি এখনো। অন্য কোথাও যেতে পারে। তবু তাকেই দরকার। কারণ তেলেঙ্গানা অভিযানের সময় থেকে সে সর্বদা পেছনে লেগে রয়েছে। তখন থেকে সে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। এই ধরণের লোকেরা নিজেদের কাজকে গুরুত্ব দেয় খুব। মৌলবী নিজামুদ্দিন ইনতিশার পরামর্শ দিলেও

নিজে এগিয়ে এসে কোন ঝুঁকি নিতে চাইবে না। বাকী সব যারা রয়েছে তাদের মধ্যে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার ভক্তও রয়েছে কিছু কিছু, যারা সবাই চায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমল দ্রুত শেষ হয়ে যাক। কিন্তু কিভাবে শেষ হবে সেকথা ঘুরিয়ে বললেও সোজা ভাষায় কিছুতেই বলতে চায় না। মৌলবী অবশ্য বলেছে দুইভাবে সুলতানকে হটানো যায়। প্রথমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়ী হয়ে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে পথ থেকে অপসারিত করে। কিন্তু কিভাবে অপসারিত করতে হবে জিজ্ঞাসা করলে সোজা উত্তর দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে বলে, সেটা আপনাকে ভেবে চিন্তে পরামর্শ নিয়ে ঠিক করতে হবে। উলাঘ খাঁ যদি তার উত্তরে বলে— আপনার পরামর্শ আমি চাইছি। আপনি বলুন।

ইনতিশার তখন চুপ করে থেকে কথা ঘুরিয়ে বলে— আপনি যেভাবে বলবেন, তাতেই আমার সায় আছে। আমি শুধু চাই সুলতান গিয়াসউদ্দিনের দিন শেষ হোক।

আরও কয়েকজনকে বাজিয়ে দেখেছে উলাঘ খাঁ। কোন কাজে আসেনি। তাদের কেউ বলেছে বাঁদীকে দিয়ে শীতল পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া যায়। কেউ বলেছে নিদ্রিত অবস্থায় বক্ষদেশে ছুরিকাঘাত করতে। কিন্তু স্বহস্তে কেউ কিছু করবে না। এমনকি দায়িত্বও নেবে না। তারা সবাই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। কারণ তারা জানে অধিকাংশ ষড়যন্ত্রই সাধারণত ব্যর্থ হয় এবং ব্যর্থ হলে কষ্টদায়ক মৃত্যু অবধারিত। উলাঘ খাঁ দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ চেপে ধরে ভাবে— কিন্তু তারা একথা জানে না, ষড়যন্ত্র সফল হোক কিংবা বিফল হোক, কোনদিন সে যদি সুলতান হতে পারে তাহলে এই পাশকাটানো স্বভাবের জন্য এদের কপালে নিদারুণ দুঃখ লিখিত রইল।

মালিকজাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ এদের মত নয়। সে সোজা মানুষ। সে যেমন নিজের উচ্চাশার কথা গোপন না রেখে অকপটে বলে, তেমনি বিনিময়ে কি করতে পারে তাও জানায়। এমন কি স্বহস্তে সুলতানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে সে প্রস্তুত। সুতরাং তাকেই শেষ পর্যন্ত ডাকে উলাঘ খাঁ। পর দিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে নদীর তীরে বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে অশ্বারূঢ় হয়ে আসতে বলে তাকে।

মালিকজাদা পরদিন ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির। তার অশ্বটি দেখে কিশোর বয়সের নিজের একটি অশ্বের কথা মনে পড়ে যায় উলাঘ খাঁয়ের। সেটি মুলতান থেকে আসা এক সওদাগর তার পিতাকে দিয়েছিল কোন ব্যাপারে কৃতার্থ হয়ে। বাড়তি হয়ে যাওয়ায় সেটি উলাঘের ভাগ্যে জুটেছিল।

—তোমার এই বাহনটি কোথায় পেলে আইয়াজ?

আইয়াজ বলে—- মুলতানের এক বণিক দিয়েছে।

— আশ্চর্য!

— আশ্চর্য হলেন কেন?

—আজ থেকে ঠিক বিশ পঁচিশ বছর আগে ঠিক এই রঙের এমন একটি অশ্ব আমার ছিল। সেটি দিয়েছিল মুলতানের এক সওদাগর।

এবারে আইয়াজের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়— আশ্চর্য!

— জগতে কিছুই আশ্চর্যের নয় আইয়াজ। হয়ত দেখা যাবে দুটি অশ্ব একই বংশের। আশ্চর্যের কিছু নয়, এই জন্য বলছি, আজ আমি তোমাকে যে এই হাওয়া-লাগা, পাতা নাচানো গাছটার নীচে ডেকে পাঠিয়েছি এটাও কি আশ্চর্যের নয়? আবার গভীর ভাবে ভাবলে দেখবে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

— সেকথা অবশ্য হাজারবার সত্য।

—তুমি কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলে তামাম হিন্দুস্থানের সুলতানের পুত্র তোমাকে একা নির্জন স্থানে ডেকে পাঠাবে গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্র করার জন্য?

-- কখনো ভাবিনি।

-- তবে? ভাবতে গেলে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবই আশ্চর্যের। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখলে বুঝবে বিলকুল স্বাভাবিকভাবে সব চলেছে। ওসব কথা ছাড়। আসল কথা শোনো।

উলাঘ খাঁ সুলতানের পত্রের কথা বলে। আর বলে কী ধরনের অভ্যর্থনা তিনি চান।

আইয়াজ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে-- ওই মহল নির্মাণের ভার আমার ওপর দিন হুজুর। তাহলে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কি বলতে চাইছ?

-- কাঠের মহল নির্মাণের প্রভূত অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। আমি দীর্ঘদিন হিমালয়ের মোঙ্গল সীমান্তে থেকেছি। সেই সময়ে আমি ওদের কুঠি নির্মাণ দেখতাম। শিখতামও। ওরা এই বিষয়ে পারদর্শী। কারণ ওখানে প্রস্তর বা ইটের বাড়ি নেই।

-- তুমি কি পাকাপোক্ত বাড়ি করবে নাকি ?

-- তা তো করতেই হবে।

তোমাকে দিয়ে হবে না।

-- কেন মেহেরবান?

-- আমি চাই না সুলতান শহরে প্রবেশ করুন।

- সেই ব্যবস্থাই তো করব।

তাহলে নিশ্চয় মজবুত বাড়ি করবে

- যথেষ্ট মজবুত বানানো হবে। সেটি ভেঙে পড়ার পরে যখন সবাই তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করবে, তখন দেখবে কোন খুঁত নেই।

-- ভাঙবে কি করে?

-- যেখানে সুলতান এসে বসবেন বা খানাপিনা করবেন সেই জায়গাটা হবে মণ্ডপ ধরনের। তার সামনে দিয়ে আপনার হস্তীযূথ সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে সুলতানকে শুঁড় উঁচিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে চলে যাবে। সব হস্তী কি সমান উচ্চতার হয়? ধরুণ যদি ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি থাকে তার মধ্যে পঞ্চদশ হস্তীটি উচ্চতায় একটু বেশি হবে। স্বভাবতই সে আটকে যাবে। সে পুরুষ হস্তী। তাই জেদী। আটকে গিয়ে রেগে আরও জোরে চলার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে সামনের অংশটা মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। দুর্ঘটনায় তো কারও হাত থাকে না। একে দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যাবে?

উলাঘ খাঁ বুঝতে পারে লোকটার একসময়ে অতি সজ্জন ব্যক্তি বলে সুনাম থাকলেও, উচ্চাশা তাকে শয়তান করে তুলেছে। সে জানে নিজেও সে এখন শয়তানের দোসর। তাই আইয়াজের এই পন্থা তার মনে ধরে। এর মধ্যে বাস্তবতা রয়েছে-- কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ। তবু কেউ না কেউ এর মধ্যে সন্দেহের আঁশটে গন্ধ পাবে।

তাই মালিকজাদাকে সে বলে-- ভেবোনা, একমাত্র তুমিই দুনিয়ার ধুরন্দর শয়তান। তোমার চেয়েও বেশি বুদ্ধি ধরে এমন অনেক ব্যক্তি এই রাজধানীতেই রয়েছে। তারা তোমার কথা মেনে নীরব থাকবে না।

মালিকজাদা এতদিন পরে এই প্রথম উলাঘ খাঁয়ের সামনে নিঃশব্দে এক ধরনের হাসি হাসে। এতদিন হাসার দুঃসাহস কখনো হয়নি। কিন্তু আজ সুলতানজাদা কয়েকটি কথার মধ্যে তার খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। চিরকালের ব্যবধানটা সহসা অন্তর্হিত।

সে বলে-- আর একটি উপায় রয়েছে। তবে সেটি নির্ভর করবে আশমানের ওপর।

-- আশমানের ওপর কেন?

-- এখন তো বর্ষাকাল এসে গিয়েছে। তবু আশমান ফাঁকা। আপনি আমাকে বলেছেন সুলতানের খুব কষ্ট হয়েছে লক্ষ্মণাবতী থেকে ফেরার পথে। প্রচণ্ড গরম, আগুনের হলকার মত হাওয়া তাঁকে কাহিল করে দিয়েছে। এই সময় দিল্লিতে বজ্রপাত হয়। উনি যখন ফিরে এখানে থাকবেন, তখন একদিন তেমন হতে পারে। তাহলেই হবে। বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাঠামো ভেঙে পড়বে। তবে আমাকে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতে হবে। আমাকে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে বিশেষ কারণে।

-- সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শূলে চড়ানো হবে।

চমকে উঠে আইয়াজ বলে-- কেন হুজুর, একথা বললেন কেন?

-- তুমি যে গল্প কথা শোনালে তাকি বিশ্বাসযোগ্য হ'ল?

-- একবার আশমান কাঁপিয়ে শব্দ হতে দিন। তখন আপনি নিজেই বিশ্বাস করবেন। আপনার চোখের সামনে ঘটলেও অবিশ্বাসের কিছু খুঁজে পাবেন না। তবে যেই ক'টা দিন উনি থাকবেন, তার মধ্যে অন্তত একবার অমন বজ্রপাত ঘটা চাই। নইলে হস্তীর ব্যবস্থা তো রইলই।

--- বজ্রপাতে কি করে ভাঙবে?

-- সেই ব্যবস্থা করে রাখব। একটা দড়া ধরে হেঁচকা টানের ব্যাপার মাত্র। হুড়মুড়িয়ে পড়বে সমস্ত কাঠামো, যেখানে সুলতান থাকবেন। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। দিল্লিতে আকছার অমন ঘটে।

-- দায়িত্ব তোমার। কেউ আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইলে আমি সইব না। বলব, তুমি দায়ী। তাহলে নির্ঘাত ফাঁসী।

-- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মালিকজাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ বড় বড় কাঠের গুঁড়ি এনে ফেলে উলাঘ খাঁয়ের নির্বাচিত স্থানে। স্থানটির নাম আফগানপুর। রাজধানীর সন্নিকটে নদীর তীরে একটি চমৎকার স্থান। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সুলতান এসে পৌঁছে একবার দেখেই স্থানটিকে পছন্দ করে ফেলবেন।

আইয়াজ বহু শ্রমিক নিয়ে আসে। চারটে হাতিকে কাজে লাগায় গুঁড়ি সরানোর জন্য। সময় খুব কম। এই অল্প সময়ে কাঠের গুঁড়ি চিরে তক্তা বানিয়ে ঘর তোলা সহজসাধ্য কর্ম নয়। তবু বুকে সাহস নিয়ে অসাধ্য সাধনে এগিয়ে এসেছে আইয়াজ। কারণ তার সম্মুখে ভবিষ্যতের খাজা জাহাঁ পদবীর টোপ ঝুলছে।

ওদিকে উলাঘ খাঁ একজন বিশ্বস্ত সেনাপতির ওপর ভার দিল হস্তীদের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করতে। সে-ও একজন চক্রী।

কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। উলাঘ খাঁ বিস্মিত হয় আইয়াজের কর্মদক্ষতা দেখে। লোকটি শুধু পারদর্শী নয়, সে প্রতিভাবানও বটে। তার মত বুদ্ধি যার রয়েছে, মন তার কুৎসিত হলেও খাজাজাহাঁ হওয়ার হিম্মৎ সে রাখে। এর হাতে তার কল্পনার রাজধানীর অট্টালিকা নির্মাণের ভার দিলে যোগ্য হাতেই দেওয়া হবে।

প্রতিদিন সুলতানের সর্বশেষ অবস্থানের কথা জানতে অশ্বারোহী ছোটাছুটি করছে। সেই অশ্বারোহী দিল্লি থেকে খবর নিয়ে যাচ্ছে প্রাসাদ নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ে। তার মুখে সব শুনে সুলতান প্রীত হন। পুত্র সম্বন্ধে একটা গর্ববোধ তাঁকে সবসময় উৎফুল্ল

রাখে। এই পুত্র অবশ্যই তুঘলক বংশকে দিল্লীর মসনদে স্থায়ীত্ব দিয়ে যাবে। বংশে এমন প্রতিভার জন্ম হলে ভিত্তিটা সুদৃঢ় হয়। সে এমন পন্থা পদ্ধতির উদ্ভাবন করবে যাতে শাসনকার্য মসৃন ভাবে চলে, প্রজারা সুখ শান্তিতে থাকতে পারে। তিনি জানেন, তাঁর মত উলাঘ খাঁও হিন্দুবিদ্বেষী নয়। বরং তাঁর চেয়েও তার মধ্যে হিন্দুপ্রীতি রয়েছে বেশি। সে তার নিজের সৈন্যদলে বেশ কিছু হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেছে। তিনিও বাধা দেননি। তাছাড়া কোন হিন্দুরাজ্য আক্রমণে সে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করে না যদি না সেই রাজ্য সাম্রাজ্যের বিপদের কারণ না হয়।

তাই বেশ খোশমেজাজে একদিন সুলতান আফগানপুরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। দিল্লীতে, বিশেষ করে পুত্রের নিকট ফিরে আসছেন বলে এতদিনের ক্লান্তি কেটে গিয়ে বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর সমবয়স্ক একদল ঘনিষ্ঠ আমীরকে একান্তে ডেকে সহাস্যে তিনি বলেন-- মনে হচ্ছে, আর একবার লক্ষ্মণাবতীর দিকে অভিযান চালাতে পারি।

আমীর হেসে বলে-- পুত্রের কাছাকাছি এসেছেন বলে অমন মনে হচ্ছে। দিল্লী থেকে যত দূরে সরে যাবেন ক্লান্তি আবার চেপে ধরবে আপনাকে। সবই মনের ব্যাপার।

অবশেষে আফগানপুরে এসে পৌঁছোন সুলতান গিয়াসউদ্দিন। সেখানে পুত্র এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। বহুদিন পরে পুত্রকে দেখে তাঁর মন ভরে ওঠে। তবু তাকে চিন্তিত দেখে তিনি প্রশ্ন করেন-- তোমার কি কোন অশান্তি আছে?

-- না না, অশান্তি হবে কেন? তাছাড়া আজ আপনি এসে পৌঁছলেন।

-- তবু--

-- আপনাকে কিভাবে সংবর্দ্ধনা জানাব তাই নিয়ে চিন্তিত ছিলাম বলে, আপনার অমন মনে হচ্ছে বোধহয়।

-- হতে পারে, হতেই পারে। তবে এর জন্য একটুও ভেবোনা। তোফা মহল তৈরি করেছ। কে করেছে?

আইয়াজকে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় উলাঘ খাঁ। আইয়াজ মাথাটা সামনে অনেকটা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে।

-- তুমি বেশ পারদর্শী বাস্তুকার। তোমাকে আমার কাজে লাগবে।

-- সুলতান মেহেরবান।

কথাবার্তার মধ্যে আইয়াজ একসময় লক্ষ্য করে আকাশের এক কোণে মেঘের উদয় হয়েছে। এ বছরে এই প্রথম। প্রথম বারিপাতের সম্ভাবনা। আর প্রথম বারিপাত বর্ষাকালে হলে নিঃশব্দে হয় না কখনো। তবে ওই মেঘ মুহূর্তে মিলিয়েও যেতে পারে। তাহলে আগামীকাল হস্তীদের কাজে লাগানো হবে।

সৈন্যদের একে একে ছেড়ে দিতে দিতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। সুলতান তখনো খানাপিনা করেননি। পুত্র এসে অনেকবার অনুরোধ করেছেন। তিনি সম্মত হননি। আইয়াজ ভাবে সম্মত না হওয়াই ভাল। মেঘ সত্যিই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এবং দিল্লীর আকাশ ছেয়ে ফেলছে। বছরের প্রথম মেঘ বলে তার মধ্যে একটা যেন ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ঝড় উঠবে। নিশ্চয় ঝড় উঠবে। প্রথমে রাশি রাশি বালি চর্তুদিক অন্ধকার করে দেবে। তারপর বৃষ্টিও হতে পারে। কিংবা ওই ঝড়ই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে রাজস্থানের মরুস্থলের দিকে।

অবশেষে সৈনদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না। তাদেরও গৃহে প্রত্যাবর্তনের তাগিদ ছিল। কতদিন পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকে সঙ্গে করে এনেছে বেশ কিছু দ্রব্য সামগ্রী। যুদ্ধ করা তো শুধু নয়, যেখানে পেরেছে লুঠ করেছে। সংবরণ করা অসম্ভব। অনেক দিন বাইরে থেকে থেকে বন্য স্বভাবের হয়ে যায়। তাই হাল ছেড়ে দিতে হয় কিছুটা। যেসব দ্রব্য এনেছে, যত শীঘ্র সম্ভব ঘরে ফিরে সেগুলো দেখাবে, ভাগ করে দেবে প্রিয়জনদের মধ্যে। সুলতান তাদের সবার প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারেননি। পরে দেওয়া হবে। তবে যাদের পথি মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছিল, কিংবা যারা বহুদূরের অধিবাসী তাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সবাই একসময় চলে যায়। থাকে শুধু আমীর ওমরাহেরা। সুলতান পুত্রকে ডেকে বলেন-- এবারে খানাপিনা করা যেতে পারে। ভীষণ মেঘ করেছে। ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে।

উলাঘ খাঁয়ের বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন। বিবেক বারবার জেগে উঠতে চায়। সে টুঁটি চেপে ধরে বিবেকের। বলে--চোপরও বে-আক্কেল। আমি মসনদে না বসলে অনেক কিছু করা যাচ্ছে না। আমার বয়সটা থেমে নেই। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দূরদৃষ্টিও ঘোলা হয়ে যায়। নতুন কিছু করার সময় থাকে না।

মন্ডপে গিয়ে বসেন সুলতান। সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা। আইয়াজ বারবার বাইরে যায় আর ভেতরে আসে। তার দৃষ্টি সব সময় আকাশের দিকে। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে স্বয়ং বিধাতা চান সুলতানের পরিবর্তন ঘটুক। কারণ ঝড় উঠেছে এবং সেই সঙ্গে গুরুগুরু মেঘ গর্জন। শুধু এই মহত্বপূর্ণ কাজটি সমাধান করতে সাহায্যের জন্য এতদিন দিল্লীর আকাশ বাতাস অসহনীয়ভাবে তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

সুলতান বলেন-- বাঃ, খাসা হাওয়া দিচ্ছে। কতদিন পরে হাড় জুড়োলো। রাতের নিদ্রা মনে হচ্ছে ভালই হবে। কি বল তোমরা?

সঙ্গীরা সবাই খুশী মনে সুলতানকে সমর্থন জানায়।

খানা পরিবেশন করা হয়। নানা ধরনের সুদৃশ্য পাত্রে সেগুলি শোভা পাচ্ছিল।

-- আহা কতদিন পরে এই সমস্ত খাদ্যের দেখা মিলল। তোমরা কি বল?

মালিক হুসেন বলে-- কি করে মিলবে হুজুর। এটা যে রাজধানী। আর ভাবী সুলতান নিজে তদারক করছেন।

-- তা যা বলেছ। তবে লক্ষ্মণাবতীতে আমরা বলবনের বংশধরের প্রাসাদে অতিথি ছিলাম। সেখানেও তো এসব জিনিস দেখিনি।

-- সেখানে যা দিয়েছিল, খারাপ ছিল না। তবে তার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ ছিল না। কি করে থাকবে? তারা আপনাকে দেখেছে বিজয়ী হিসাবে। তারা জানে আপনি তাদের ভালবাসেন না, অনুগ্রহ করেন।

-- তা বটে।

সবাই খুব ধীরে ধীরে স্বাদগ্রহণ করতে করতে খায়। মহলের বাইরে দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এতটাই অন্ধকার। কিন্তু সবার জানা আছে যে, এই মুহূর্তে যদি মেঘ কেটে যায় তাহলে শেষ বেলায় হরিদ্রাভ সূর্যের দেখা আবার মিলবে।

এদিকে ওদিকে দূরে নিকটে ঘন ঘন বজ্রপাতের আওয়াজ শুরু হয়েছে। সুলতান হেসে বলেন-- খুব শব্দ হচ্ছে দেখছি। অনেক দিন পরে ফিরলাম বলে এরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে নাকি?

সবাই হেসে ওঠে।

উলাঘ খাঁ লক্ষ্য করে মালিকজাদা-আহমেদবিন-আইয়াজ সেই অদৃশ্য দড়ার কাছে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখ পাথরে খোদিত। সে নিজেও যেন একটি প্রস্তরমূর্তি। দৃষ্টি ফিরিয়ে উলাঘ পিতার মুখের দিকে চায়। সেই মুখে খুশীর হাসি। এত অনন্দিত হতে তাঁকে আগে কবে দেখেছে উলাঘ মনে করতে পারে না।

খাওয়া শেষ হয়। একে একে আমীরেরা বাইরে যায় মুখ ধুতে। সুলতান এবং আরও কয়েকজন বসে থাকেন। খাওয়া বড় তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। উলাঘ যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চেয়ে বেশি না এগোতে মানা করেছে আইয়াজ। তাই সে একটু আড়ষ্ট।

সুলতান হেসে বলেন-- তুমি অমন সিপাহীর মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছ জউনা। কাছে এসো।

ঠিক সেই সময় খুব কাছে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে অতবড় মহল সশব্দে ভেঙে পড়ে। নিয়তি যে এমন নির্মমভাবে মানুষের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয় পৃথিবীতে আগে বোধহয় কখনো দেখা যায়নি। যারা মুখ ধুতে বাইরে গিয়েছিল তারা বেঁচে গেল। বাকীরা চাপা পড়ল মণ্ডপের নীচে। অনেকের নিষ্পিষ্ট দেহ দেখাই যাচ্ছে। সুলতানের মাথাটা বাইরে। দেহের ওপর একটা বিরাট কাষ্ঠখণ্ড। সেই কাঠের নীচে দেহটা কতখানি অক্ষত আছে বোঝা যায় না। তবে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে।

উলাঘ খাঁ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় পিতার দিকে। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের দুই যন্ত্রণাকাতর চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। তিনি অতি কষ্টে বলেন-- তুমি মসনদ নিয়ে নাও জউনা, আমাকে এভাবে মেরো না।

-- একি বলছেন সুলতান!

সুলতানের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তাঁর শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে। তার মধ্যে কোন-রকমে বলেন-- আমি আশা করতাম তুঘলক বংশ বহুদিন স্থায়ী হবে। হল না। প্রতিভাবানের ওপর শয়তান ভর করলে সে সাধারণের চেয়ে বেশি নিচে নেমে যায়।

-- আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ছটফট করতে করতে গিয়াসউদ্দিন এদিকে ওদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলেন--- তুমি শান্তি পাবে না জউনা। তোমার প্রতিভা পরিণত নয়। পদে পদে অপদস্থ হবে। আমার আর কিছুদিন বাঁচার প্রয়োজন ছিল।

সুলতান সহসা নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

উলাঘ খাঁ ছুটে বাইরে চলে যায়। পিতার চোখের দিকে সে চাইতে পারছিল না। সেই চোখের দৃষ্টি তার অন্তরের অন্তঃস্থল অবধি দেখে নিয়েছে। গোপন কিছুই নেই।

সেদিন ভেঙে পড়া মন্ডপ থেকে সুলতানকে উদ্ধার করতে একটু বেশি সময় লেগে যায়। কারণ সেই মুহূর্তে কুড়ি পঁচিশ জন শ্রমিক যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ওদের আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ সঙ্গে সঙ্গে সুলতানকে উদ্ধার করতে পারলে অক্ষম হলেও উনি প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন। তাই তাঁকে অনেক পরে যখন উদ্ধার করা হ'ল তখন দেহে প্রাণ ছিল না। কিন্তু চোখ দুটো সেইভাবেই খোলা ছিল যেভাবে তিনি প্রিয়তম পুত্রের দিকে শেষ বারের মত চেয়েছিলেন।

উলাঘ খাঁ সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে-- বন্ধ কর। বন্ধ করে দাও।

পাশ থেকে আইয়াজ বলে ওঠে- কি বন্ধ করব সুলতান?

-- আঃ, সুলতান আবার কে? আগে চোখ দুটো বন্ধ করে দাও। বুজিয়ে দাও।

আইয়াজ তাই করে। সে ভাবে, আজ থেকে সে হবে খাজা জাহাঁ। উলাঘ খাঁয়ের সন্দেহ আছে নাকি? সুলতান বলে সম্বোধন করায় অমন অধৈর্য হয়ে উঠলেন কেন?

নির্বিবাদে নিয়ম-মাফিক দিল্লীর মসনদে আরোহণ করলেন উলাঘ খাঁ। উপাধি নিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘলক। তিনি সুলতান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিদের মধ্যে

প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, কে তাঁকে সবচেয়ে সুন্দর উপাধি প্রদান করতে পারে।

কবি মহম্মদ দাউদ-বিন-সুলেমান তো লিখে বসলেন, এক মহম্মদ ছিলেন পয়গম্বর, আর দ্বিতীয় হলেন হিন্দুস্থানের সুলতান।

একজন লিখলেন-- তিনি খলিফা দ্বারা নির্বাচিত সুলতানদের মধ্যে সেরা সুলতান। সবচেয়ে বড় সমর নায়ক।

একজন লিখলেন-- সুলতান মহম্মদকে খলিফা স্বয়ং সমগ্র বিশ্বের এবং ধর্মস্থানের সর্বাধিনায়ক করে প্রেরণ করেছেন।

অন্য কবি লিখলেন-- তুঘলক-পুত্র মহম্মদ-শাহ পূর্ব-পশ্চিমের অবিসংবাদিত মালিক। তাঁর তরবারির ভয়ে ভীত নয়টি আকাশের মাঝে সূর্য কম্পমান।

অনেকে এমন অনেক কিছু লিখে তাঁর মনোরঞ্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। সব দেখে শুনে মহম্মদ-বিন-তুঘলক মুচকি হেসে আপন মনে বলেন-- এমন হলেই চলবে।

পিতার মৃত্যু নিয়ে কোন ঝড় ঝঞ্ঝা ওঠেনি। মা শোকাভিভূত হয়ে রুদ্ধ কক্ষে পড়ে রইলেন তিনদিন অভুক্ত অবস্থায়। তারপর দ্বার খুলে পুত্রকে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-- ওঁর মত মনকে সব সময় অবিচল রাখবে। সব দুর্যোগ কেটে যাবে। উনি তো তোমাকে কবে থেকে নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। তোমাকে উনি প্রতিভাবান বলতেন। তাঁর এজন্য গর্ববোধ ছিল। যদিও সেই গর্ব খুব গোপনে রাখতেন। বলতেন, তুমি যেদিকে যেতে চেয়েছ সেই দিকই তোমার কাছে খুব সহজে ধরা দিয়েছে। সেই কবে শৈশবে নিয়ে যেতেন দূর প্রান্তরে, মনে আছে?

-- হ্যাঁ মা। এখন আসি। শত হলেও আমি এখন সুলতান। ইচ্ছা থাকলেও তোমার কাছে বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই। পিতা যে কেন এভাবে চলে গেলেন।

-- সব নসীব। কারও হাত নেই।

মায়ের মনে এতটুকুও সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। ভাগিনী খুদাবন্দজাদা অনেক কেঁদেছিল। কিন্তু একটিবারের জন্যও তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়নি।

প্রশ্ন করেছিল শুধু একজন, যে দিনের পর দিন স্বামীর চরিত্রের পরিবর্তন কখনো নিকট থেকে কখনো দূর থেকে লক্ষ্য করে এসেছিল। মরহুম সুলাতনের অপঘাত মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকে সে স্বামীর মধ্যে অসম্ভব রকমের এক অস্থিরতা প্রকট হয়ে উঠতে দেখেছিল। তখন অর্থাৎ সুলতানের মৃত্যুর তিনদিন আগে স্বামীর উদ্দেশে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল --বিবেককে দুই পা দিয়ে মাড়িয়ে যেও না।

শুনে স্বামী ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে উঠেছিল-- কী বলতে চাও তুমি?

-- কিছু না। অনেক বাজে কথা বলি, তার মধ্যে এটাও একটা কথার কথা।

-- আমাকে বিরক্ত করা, আমাকে খোঁচা দেওয়া তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে আজকাল। আমার ভাল তুমি চাওনা।

-- চাই। শুধু ভালই চাই।

-- কখনো এভাবে কথা বলবে না ভবিষ্যতে।

আর কথা বলেনি বেগম। সে লক্ষ্য করল সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তার স্বামী অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। সে জানতে পারল না অনেক কিছু, আবার জানলও অনেক কিছু। তবু কাউকে বলার মত কিছু বুঝতে পারল না। যদি বুঝতে পারত তাহলে হয়ত বলত। কারও কাছে না হোক অন্তত নতুন সুলতানের মায়ের কাছে। তার বুকের ভেতর থেকে কী যেন উথলে উঠতে চায় কিন্তু ওঠে না। দু'হাত দিয়ে সজোরে বুক চেপে ধরে। স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল সে। এমন এক অসাধারণ পুরুষকে সে আগে কখনো দেখেনি। সাদির আগে তার ধারণাই ছিল না এত উঁচুদরের পুরুষ পৃথিবীতে রয়েছে। কী না জানেন তিনি। কত জ্ঞান। রসিকতার মধ্যে কত সূক্ষ্মতা। সব কিছু কত উন্নত স্তরের। স্বামীর কথাবার্তায় চলনে বলনে সুলতানী আদব-কায়দা। এসব তাঁকে চর্চা করে শিখতে হয়নি। জন্মগত। এঁকে পেয়ে মনে হত তার মত সৌভাগ্যবতী রমনী পৃথিবীতে কেউ নেই। নিজেকে কত নগণ্য বলে মনে হত তাঁর পাশে। তিনি বুঝতে পারতেন তার হীণমন্যতার কথা। তাঁর সমান উচ্চতায় আনতে আদরে সোহাগে পূর্ণ করে দিতেন। সেই সব দিন ছিল স্বপ্নের দিন। প্রার্থনা করত সেই স্বপ্ন যেন কখনো টুটে না যায়। স্বপ্ন সর্বপ্রথম একেবারে না টুটলেও তরল হয়ে এল তেলেঙ্গানা অভিযানের সময় থেকে। সেই প্রথম তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্য ছেড়ে থাকতে হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে অনেক গুজব ভেসে আসতে লাগল। তবু তার বিশ্বাস অটুট ছিল। সে জানে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক অবধি নিজের প্রিয়তম পুত্রের ওপর অবিচল আস্থা রাখতে পারেননি। খোদাবন্দজাদা নিজের মুখে এসে শুনিয়ে গিয়েছে যে উলাঘ খাঁ ওখানে বসে বসে সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে মসনদ দখলের জন্য। তবু সে বিশ্বাস করেনি। পরে অবশ্য খোদাবন্দজাদা নিজে এসে মাফ চেয়ে গিয়েছে। স্বীকার করেছে রাজধানী বড় বিষম বস্তু। নিজের স্বামী পুত্র কন্যা সবাই পর হয়ে যায়।

খাজা জাহাঁ মালিক জাদা আহমেদ-বিন-আইয়াজ দরবারে বসে উস্‌খুস্‌ করছিল। কিছুদিন হ'ল একটি জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ভেবেছিল একটু তাড়াতাড়ি বের হবে। কিন্তু সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক অনেক বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন অনেকের সঙ্গে। সে খাজা জাহাঁ হলেও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কোন আলোচনা এ

পর্যন্ত করেননি তিনি। তবে সাধারণভাবে সব কথা বলেছেন। এজন্য মনে মনে চাপা ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয় আইয়াজের। তাকে কেন ঠিকমত গুরুত্ব দিতে চান না সুলতান সে বুঝে উঠতে পারে না। আজ তাই দরবারে উপস্থিত থেকে কথাবার্তার মধ্যে অংশগ্রহণ করলেও একটু ছাড়া ছাড়া ভাব ছিল তার। প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে দরবার শেষ করে মহম্মদ-বিন-তুঘলক আসন ত্যাগ করেন।

আইয়াজ তার শ্বেত বর্ণের অশ্বটি নিয়ে প্রাসাদ ছাড়ে। অধিকাংশ দিন সে দু'একজনকে সঙ্গে নেয়। জানা অজানা শত্রুর সংখ্যা তার কম নয়। বিপদ ঘটতে পারে যে কোন মূহূর্তে। তাই একেবারে একা যায় না সাধারণত। তার পদটির প্রতি লোভ রয়েছে অনেকের। তবু আজ সে একা। আজ কাউকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যেতে হবে।

শহর ছেড়ে অনেক দূরে গ্রাম্য পথে সে এসে পড়ে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। গাছের পাতায় পাতায় কোটি কোটি জোনাকী ভিড় করেছে। এরা এভাবে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে কেন? নিশ্চয় খাদ্য সংগ্রহে। দিনের বেলায় বোধহয় চোখে দেখে না। একদিন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছে গিয়ে জানতে হবে। তিনি সব জানেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের প্রত্যাবর্তনের পথে আউলিয়াকে দিল্লী ছেড়ে যাওয়ার কড়া নির্দেশ পাঠালে তিনি শান্তভাবে বলেছিলেন– দিল্লী হনাজ দূর অস্ত। তাই সত্য হল। গিয়াসউদ্দিনের কাছে দিল্লী দূরেই থেকে গেল এ জীবনের জন্য। আইয়াজ ভাবে, আউলিয়া হয়ত জানেন না, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে তুলতে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। অথচ তাঁকে একথা বলা যাবে না। দুনিয়ার মাত্র চারজন মানুষ এই ঘটনার রহস্যের কথা জানে। তাদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ভক্ত রয়েছে ঠিক। কিন্তু তারা কখনো বলতে সাহসী হবে না যে তাদের অতি শ্রদ্ধার ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশীদার হয়েছিল। তাহলে নিশ্চয় উনি ওদের বিতাড়িত করবেন কিংবা নিজেই দিল্লী থেকে চিরবিদায় নেবেন।

জোনাকীরা কতটা আলো দেয় সন্দেহ রয়েছে। তারা খুব হালকা। গায়ে এসে পড়লেও টের পাওয়া যায় না। অশ্বও টের পায় না। যদি এরা অন্য অনেক পতঙ্গের মত কামড়াত তাহলে অশ্ব পরিচালনায় সমস্যা দেখা দিত।

নির্জন রাস্তা। কিছুটা এগোলে একপদী পথ। অশ্ব নিয়ে যাওয়ায় অসুবিধা। দূরে শৃগালের ঐকতান। আশেপাশে ঝোপে ঝাড়ে ক্রমাগত ঝিল্লিরব। নাকে ভেসে আসে এঁদো ডোবার গন্ধ। অতি পরিচিত গন্ধ। সবার কাছে এই গন্ধ দুর্গন্ধ। কিন্তু তার কাছে সুগন্ধ। কারণ সে গন্তব্যস্থলে পৌছে গিয়েছে। অশ্ব থেকে অবতরণ করে পাশের ছোট আমগাছের গোড়ায় বাঁধে। তারপর পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র কুটিরের

সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে কোন অদৃশ্য ফাঁক দিয়ে বাড়ির আলো ঠিক্‌রে বাইরে এসে পড়ছিল। আইয়াজ করাঘাত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে ক্ষীণ নারীকণ্ঠ -- কে ?

-- আমি

দরজা খুলে যায়। হাতে একটি তৈল প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অসামান্য রূপসী এক নারীমূর্তিকে। সেই নারী প্রদীপটি নিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে আইয়াজের দিকে।

আইয়াজ ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আঙুল দিয়ে সুন্দরীর চিবুক উঁচু করে ধরে বলে-- কি দেখছ অত ? আমাকে দেখোনি আগে?

আইয়াজের সঙ্গে নারীর বয়সের পার্থক্য একটু বেশি। তবু তার চোখে ভেসে ওঠে গভীর প্রেমের চাহনি।

সে বলে-- আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না।

-- কেন?

-- তুমি এখন খাঁ জাহাঁ।

আইয়াজ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে-- নাসরিনের কাছে আমি চিরকাল আসব। এবারে আমি এখানে আমার নাসরিনের জন্য মহল তৈরি করব।

-- না।

-- কেন? জান, আমি মহল তৈরি করতে ওস্তাদ।

-- কিন্তু তোমার মহল ভেঙে পড়ে কেন?

বিস্মিত আইয়াজ বলে-- কে বলল?

-- আমি শুনেছি। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের জন্য তুমি প্রাসাদ করে দিয়েছিলে।

-- ঠিক শুনেছ! একজনের গাফিলতিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাছাড়া অমন সোজাসুজি বজ্রপাত হলে নতুন তৈরি মহলের ক্ষতি বেশি হয়। তোমার মহল ধীরে ধীরে মজবুত করে গড়ে তুলব। সেই মহল গড়ার সময় আমার পরিশ্রমের সঙ্গে মিশে থাকবে আমার হৃদয়ের প্রেম। তফাৎ সেই খানে।

নাসরিন আইয়াজের কোলে সুখে ভেঙে পড়ে। তার চোখ বুঁজে আসে।

দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হয়। অশ্ব একটু ডেকে উঠল বলে মনে হ'ল। তাকে সাধারণত ডাকতে শোনেনি আইয়াজ। নাসরিনকে আর একবার আদর করে সে বলে-- এবারে আমাকে যেতে হবে।

নাসরিন ঠোঁট ফুলিয়ে বলে-- শুধু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় তুমি আমার নও। অন্য কারও।

-- একটুও সত্য নয় এই ধারণা। আমি একান্ত তোমারই। আমার মন সর্বক্ষণ এখানে পড়ে থাকে। দেহটা অবশ্য অন্যত্র থাকে। কখনো সুলতানের কাছে, কখনো পরিবারের কর্তব্য সম্পাদনে।

প্রতিবারই বিদায়ের এই মুহূর্তে রূপসীর মন বিষন্ন হয়ে ওঠে। তবু সে কিছু দাবী করতে পারে না। দাবী করার কথা ভাবেও না কখনো। আইয়াজকে সে শুধু ভালবাসে না। তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ সে। তার মা ছিল স্বামী-পরিত্যক্তা ভিখারিনী। যমুনার কূলে একটি ভগ্ন কুটিরে বাস করত মা ও মেয়ে। রুজি রোজগার বলতে কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়িতে কাজ করার চেষ্টা করত। কিন্তু মাকে দেখতে সুন্দরী ছিল। শান্তিতে বেশিদিন কাজ করতে পারত না। ইচ্ছা কবলে মা অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারত। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা ছিল সৎ পথে থেকে মরণ হয় তবু ভাল অসৎ পথে কখনো নয়। ইতিমধ্যে নাসরিনেরও বয়স হতে থাকে। আর তার রূপ তার মায়ের রূপকে ছাপিয়ে যেতে চায়। কত আর লুকিয়ে রাখবে তাকে ? কৈশোরে পদার্পণ করার আগে থেকে মা তাকে কখনো যমুনার কাদা, কখনো কাঠ কয়লার গুঁড়ো মাখিয়ে রাখত। সে ঘোর আপত্তি করলে মা গালে ঠাস করে চড় মারত। গাল লাল টুকটুকে হয়ে উঠত। কিন্তু ওই ভাবে কি রূপ লুকিয়ে রাখা যায়? উভয়ের দিকে নজর পড়তে থাকে দুর্বৃত্ত থেকে শুরু করে নারীমাংস লোলুপ খানদানি বংশের পুরুষদের। সেই সময়ে এক গভীর রাত্রে চার পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের ভগ্ন কুটিরে। কতই বা বয়স তখন ওর? বড় জোর চোদ্দ। ওর মায়ের বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ-বত্রিশ। ঘরে কপাট দিয়ে মা ও মেয়ে এক কোণে বসে কাঁপছিল। বাইরে থেকে ঘন ঘন দ্বারে পদাঘাত। শক্ত দরজা ভেঙে পড়েনি। দুর্বৃত্তরা পাশের ভগ্ন জানালাগুলো রাতের অন্ধকারে দেখতে পায়নি। সেগুলোর যেকোন একটি দিয়ে অতি সহজে তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারত। দরজাটাই শুধু মজবুত ও অক্ষত ছিল। রেগে গিয়ে ওরা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন মা ও মেয়ে বাধ্য হয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। দুবৃত্তরা দু'জনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলে। ওরা আকুল স্বরে কেঁদে ওঠে।

সেই সময় রাতের ওই অন্ধকারে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল মালিকজাদা আহম্মদ-বিন-আইয়াজ। দূর থেকে দুই নারীর আকুল ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

-- একি করছেন আপনারা? এদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?

-- চোপ্। নিজের পথ দেখো। এদিকে তাকিও না।

ওরা মেয়েটির মায়ের ওপর জঘন্য অত্যাচার চালাতে থাকে। কারণ আগে বহুবার সে ওদের কুমতলব বানচাল করে দিয়েছে।

আইয়াজ অসি কোষমুক্ত করে ওদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে ভাবার ফুরসৎ পেল না যে ওদের মধ্যে তিনজনই সশস্ত্র। ফলে তারাও প্রতি-আক্রমণ চালায়। কিন্তু আইয়াজ অশ্বারূঢ় বলে সে বেশি সুবিধা পেল। তবু ওরা মরিয়া। আইয়াজ একজনকে মারত্মকভাবে জখম করল। অপর একজনও আহত হল। একটু পরে বাকীরা রণে-ভঙ্গ দিল। যাদের মনে পাপ থাকে মানসিক দিক দিয়ে তারা খুব দুর্বল হয়, এ তো জানা কথা।

সেদিন নাসরিন এমন কিছু আহত হয়নি। তবে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। আইয়াজ ওদের দুজনকে ওখান থেকে সরিয়ে আজ যেখানে এসেছে এই নির্জন কুটিরে নিয়ে আসে। এখানে আগে সুফী সম্প্রাদয়ের দু'জনা থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তাঁদের সে অনুরোধ করেছিল, আহত ও বিপন্ন দুই নারীকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে। তাঁরা খুবই ধর্মাত্মা, বয়সও হয়েছিল অনেক। তাই আগুনের মত দুই নারীকে দেখেও তাঁরা সহজভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। নাসরিনের মায়ের চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে? চিকিৎসক আনাও নিরাপদ নয়। তাই আইয়াজ শহরে গিয়ে রোগীর অবস্থার কথা বলে ওষুধ নিয়ে আসত প্রতিদিন। তাছাড়া যতটা সম্ভব রোগীর সেবায় সাহায্য করত নাসরিনকে। তবু নাসরিন মাকে বাঁচাতে পারেনি। মায়ের মৃত্যুতে সে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। দুই ধর্মাত্মা ব্যক্তিও তাকে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দিতে পারেননি। আইয়াজ তো কোন ছার। তাছাড়া এত চেষ্টা করেও ওই নারীকে বাঁচাতে না পেরে সে নিজেও বিষন্ন হয়ে পড়ে।

যা হোক, সুফীরা একদিন বললেন, তাঁরা অনেকদিন ধরে এই একই জায়গায় রয়েছেন। এভাবে দীর্ঘদিন একই জায়গায় থাকতে তাঁরা অভ্যস্ত নন। তাঁরা চলে যেতে চান। ভবিষ্যতে কখনো এদিকে এলে এখানে আসার চেষ্টা করবেন।

আইয়াজ প্রশ্ন তোলে-- কিন্তু নাসরিন? ওকে কে দেখবে?

-- কেন? তুমি দেখবে।

-- আমার সময় কোথায়? কতটুকু আসতে পারি এদিকে ? আপনারা তাহলে ওর সাদির ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা অনেক জায়গায় ঘোরেন। নাসরিন কুৎসিত নয়। সে রীতিমত সুন্দরী। যোগ্য পাত্রের অভাব হবে না।

কথাটা নাসরিনের সামনেই হচ্ছিল। সে বলে ওঠে-- আমার সাদির দরকার নেই।

-- সে কি ! একেবারে ছেলেমানুষের মত কথা।

-- না।

দুই বৃদ্ধ তাকে অনেক চেষ্টা করেন বোঝাতে। সে কিছুতে রাজী হয় না। তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে।

তখন তাঁরা প্রশ্ন তোলেন-- কে দেখাশোনা করবে তোমায়?

নাসরিন কিছু বলে না।

আইয়াজ তখন বলে-- অবুঝ হয়ো না নাসরিন। তুমি সাধারণ মেয়ে নও। হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে তুমি নজরে পড়ে যাবে। কে দেখে রাখবে তোমাকে? একবার তো তোমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা যে কত মর্মান্তিক, তোমার মাকে হারিয়েও কি বুঝতে পারছ না তুমি?

-- সাদি আমি জীবনে করব না।

বৃদ্ধদের একজন তখন আইয়াজকে বলেন-- তুমি ওকে বোঝাও, আমরা ঘুরে আসছি। ফিরতে রাত হবে।

তাঁরা চলে গেলে আইয়াজ বলে-- নাসরিন, আমার দিকটা ভাবো। আমার কাজ আছে। তাছাড়া নিজের সংসার আছে। তোমার নিরাপত্তা ঠিকভাবে দেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে?

-- দেখবেন না। আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

-- তাই কখনো হয়? আমি ছেড়ে যাই কি করে বলতো!

এবারে নাসরিন বলে ওঠে-- তুমি কি এতই স্বার্থপর? নিজের কথা ছাড়া কারও কথা ভাবো না।

চমকে ওঠে আইয়াজ-- কি বলছ তুমি?

-- আমি ঠিক বলছি। তুমি অন্ধ। তোমার চোখ থেকেও চোখ নেই। মন থেকেও মন নেই। তুমি কিছু দেখতেও পাও না, বুঝতেও পার না। দিনের পর দিন এসেও একজন লাজুক যুবতীর মনের খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর না। তুমি নিষ্ঠুর।

-- কিন্তু নাসরিন, আমি যে বিবাহিত।

-- তাতে কি? সেটাই বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল?

-- তোমার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ জানো। আমি প্রায় তোমার মায়ের বয়সী।

দুঃখের হাসি হেসে নাসরিন উত্তর দেয়-- বীর যোদ্ধার আবার বয়স। শুনলে হাসি পায়। কতই বা বড় তুমি।

শেষ পর্যন্ত আইয়াজকে হার মানতে হয়। নাসরিনের কথায়, তার কান্নায়, তার রূপে আর যৌবনে ধীরে ধীরে আইয়াজের সংযমের প্রাচীর ধ্বসে যায়। সে এখানে আসে নিয়মিত। অতি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী এক ভৃত্য নাসরিনের দেখাশোনা করে। যখন দিল্লীতে থাকে না তখনো সেই একই ব্যবস্থা। মনে মনে ইচ্ছা আইয়াজের দিন এলে ওকে বেগমের যোগ্য সম্মান দিয়ে ঘরে তুলবে। তাহলে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ রূপসী তার হারেমে থাকবে। সে একাধারে খাজা জাহাঁ এবং শ্রেষ্ঠ রূপসীর খসম। অথচ প্রথম

যৌবনে দুটির কোনোটি সম্বন্ধে তার আগ্রহ ছিল না। আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে মৌলানা নিজামুদ্দিন ইনতিশার। তেলেঙ্গানায় গিয়েই তার অধঃপতন। তারপর ক্রমাবনতি। আগে ছিল চক্রী পরে হয়েছে ঘাতক। ইনতিশারের কুপ্রভাব সুলতানকে আর তাকে অমানুষের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাদের দুজনাকে যদি শয়তান আখ্যা দেওয়া যায়, ইনতিশারের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে স্বয়ং শয়তানও বোধহয় সেই শব্দের অস্তিত্বের কথা জানে না।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশের রাজস্ব এবং নানাবিধ কর আদায়ের খুব সুন্দর বন্দোবস্ত করে ফেললেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও সমান স্বাচ্ছন্দ গতিতে রাজধানী পর্যন্ত অর্থপ্রবাহ বইতে লাগল। তেলেঙ্গানা ও কামপিলা, দ্বারসমুদ্র ও তিরহুথ, লক্ষ্মণাবতী ও সাতগাঁও এবং সোনার গাঁও-এর ওপর রাজধানী দিল্লীর মত সমান নিয়ন্ত্রণ সুলতানের। কোন প্রান্তে এতটুকুও শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় না। দোয়াব অঞ্চলে করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও কোনরকম অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলনা। সবার ধারণা হয়েছে সুলতান ছেড়ে কথা বলবেন না কোনরকম গাফিলতি দেখলে। সুলতান জানেন শিশুর যেমন মাতৃস্তন্যের প্রয়োজন দেশ পরিচালনায় তেমনি রাজস্ব। তিনি বালিস, আমিল ও নায়েবের পদে নতুন নতুন কুশলী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন। ফলে রাজস্ব আদায় আরও নির্বিঘ্নে হতে থাকে।

কিন্তু এত সবের মধ্যেও সুলতানের মানশচক্ষে সেই চক্ষু দ্বয়ের স্থির দৃষ্টি ভেসে ওঠে। সর্বদেহ নতুন তৈরি ভারি তক্তার নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। বাইরে আশ্চর্যজনকভাবে বেরিয়ে আছে শুধু অক্ষত মস্তক। সেই মস্তকের উষ্ণীয় পাশে লুটাচ্ছে। দেহটি অমানবিক চাপ সহ্য করছে বলে সর্বাঙ্গের শোণিত মুখমণ্ডলে এসে জমেছে। তাই সারা মুখ ঘোর রক্তবর্ণ। তারই মধ্যে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সেই চাহনি তারই দিকে— নিজের প্রিয়তম পুত্রের দিকে।

সুলতান একসময় 'না' বলে চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন। আশেপাশে সিপাহী শান্ত্রী থাকলে সচকিত হয়ে দুপা এগিয়ে আসে। তিনি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিরক্ত হয়ে হাতের ইশারায় তাদের সরে যেতে বলেন। পিতা বলেছিলেন— তুমি শান্তি পাবে না জউনা। তোমার প্রতিভা থাকতে পারে, কিন্তু তুমি পরিণত নও।

সুলতান সেই ভয়াবহ দৃশ্য চোখের সামনে থেকে বিতাড়িত করার জন্য একটি দীর্ঘশ্বাসকে কয়েকটি ক্ষুদ্রশ্বাসে পরিণত করে বেদনা মিশ্রিত হুঃ শব্দ করেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। আশে পাশে কোন সিপাহী থাকলে ভাবে, সুলতান চিন্তায় মগ্ন

থাকলে অমন সব অদ্ভুত আওয়াজ বের হয় মুখ দিয়ে।

শান্তি তিনি পাবেন কিনা জানা নেই। তবে অপদস্থ নিজেকে হতে দেবেন না। রাজস্ব আদায় নিয়ে তার সূচনা। তাঁর পদ্ধতি তাঁর পিতার ধারণার বাইরে ছিল। এমন আরও অনেক কিছু তাঁর চিন্তার মধ্যে রয়েছে, যা দেখে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে যাবে। একে একে সবই করবেন তিনি। কারণ এই মুহূর্তে কোনো স্থানে কোনো বিদ্রোহ নেই অশান্তি নেই। এটাই হ'ল কাজের সময়।

নিজের সম্বন্ধে নিজের মনে আকাশকুসুম রচনা করতে যখন মশগুল সুলতান, ঠিক তখন এল তাঁর সুলতানী জীবনের প্রথম আঘাত। পৃথিবীর চার শক্তিশালী সাম্রাজ্য হচ্ছে চীন, হিন্দুস্থান, ইরাক ও উজবেক। তারই মাঝখানে দাউদ খাঁ চাঘাতাই-এর পুত্র তারমাশিরিনের রাজ্য। তিনি বিরাট সংখ্যক সৈন্য বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানের দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে এলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলক সমরবিশারদ হলেও সেই সময় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তাঁর সৈন্য দলের অধিকাংশ নিয়োজিত রয়েছে তেলেঙ্গানা আর দেবগিরিতে, কিছু পড়ে রয়েছে লক্ষ্মণাবতীর কাছে। বাকি যে সৈন্যদল দিল্লিতে রয়েছে তারা তারমাশিরিনের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরের পক্ষে অপ্রতুল।

তবু তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওদিকে শত্রু সৈন্য ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। তারমাশিরিন স্থির করেই এসেছিলেন তিনি মুলতান থেকে না থেমে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী অবধি ধাওয়া করে যাবেন। তাঁর স্বপ্ন সমগ্র অঞ্চল তিনি তছনছ করে দেবেন। তিনি জানেন, হিন্দুস্থানে গিয়ে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব নয়। সেখানে সুলতান ছাড়াও রয়েছে অনেক শক্তিশালী মুসলমান রাজ্য। রয়েছে বিক্রমশালী রাজপুতেরা। তারা তাঁকে বেশিদিন সহ্য করবে না। তুঘলক রাও বিদেশী। কিন্তু তারা বাহিনী নিয়ে এসে এদেশ অধিকার করেনি। তারা নিজের মত একে একে এসেছে। এদেশের অন্য সবার মত তারা সাধারণ কাজের মধ্যে দিয়ে উন্নতি করেছে। এদেশের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের কথা ভুলে গিয়েছে। তারমাশিরিনের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তাই অল্প কয়েকদিন হিন্দুস্থানে থেকে সেখান থেকে যতটা সম্ভব সম্পদ আহরণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা। সম্ভব হলে এদেশে কিছু অনুগত রাজ্য রেখে যাবেন, যারা নিয়মিত কর দিয়ে যাবে।

তারমাশিরিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তাঁকে কোনো প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হ'ল না। অথচ তাঁর গুপ্তচরেরা খবর এনেছিল যে সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক দিল্লীতেই অবস্থান করছেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা এখনো পর্যন্ত শত্রু সৈন্যকে বাধা দেবার মত পর্যাপ্ত নয়। কৌতুক বোধ করলেন তারমাশিরিন। সৈন্যদের শিকারী কুকুরের মত ছেড়ে দিলেন রাজধানীর আশেপাশে। সুলতানকে সোজাসুজি পরাস্ত করা সম্ভব হবে না ভেবে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যমুনার তীরে ছাউনি ফেলে সুলতানের কাছে এই দেশ

পরিত্যাগ করার কতকগুলি শর্ত প্রেরণ করলেন। সেই শর্তগুলি হ'ল হস্তী থেকে শুরু করে সুবর্ণ মুদ্রা ইত্যাদি প্রভৃত সম্পত্তি অর্পণ। তুঘলক এই অপমানজনক শর্ত মেনে নিলে তারমাশিরিন এই দেশ থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী পিতার সেই অসহ্য দৃষ্টি সুলতানের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনি ভাবেন, এই কি তবে শুরু? এত যে আত্মাভিমান, এত যে গর্ব সব কিছু বাইরের একটি অতি সাধারণ রাজ্যের অধিপতি এসে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। অথচ তিনি জানেন, যদি প্রস্তুত থাকতে পারতেন, তাহলে ওই বিদেশী তাঁর সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হত। বড় ক্ষোভ জাগে মনে যে সে সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রকৃত পরিচয় পেল না। ভবিষ্যতে সেই সুযোগ আবার আসবে কিনা জানা নেই। তবে কি সে সত্যই প্রতিভাবান হয়েও অপরিণত?

এই অপমানজনক সন্ধির বছর খানেকের মধ্যে একটি সুসংবাদ এসে পৌছোল রাজধানী দিল্লীতে। তারমাশিরিনের প্রজাকুল এবং আমীর ওমরাহ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে তিনি হিন্দুস্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরপরই। এর একমাত্র কারণ হ'ল তিনি নাকি চেঙ্গিস খাঁ প্রবর্তিত নীতিসূত্র লঙ্ঘন করেছেন। তাঁর দেশের প্রতিটি মানুষ যে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে তিনি স্বয়ং রাজ্যের অধিপতি হয়েও তার থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর আর ক্ষমা নেই। সবাই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বাজুন উঘলেকে সমর্থন জানিয়ে তারমাশিরিনকে মসনদ-চ্যুত করে। তারমাশিরিন প্রাণ বাঁচাতে গজনীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বল্ক-এ ধরা পড়ে যান এবং সেখানে কারারুদ্ধ হন। বল্ক থেকে বন্দীরূপে তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বাঘারা এবং পরে সমরখন্দ। তারপর সমরখন্দের নিকটবর্তী নসফ নামক স্থানে গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁর প্রাণ যায়। হিন্দুস্থান কিছুকালের জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায়।

বড় বেগমসাহেবা তাঁর কক্ষ সংলগ্ন আচ্ছাদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তাঁর পাঁচ পুত্রের বেগমদের ডেকে পাঠিয়েছেন অপরাহ্নে। এভাবে কখনো ডাকেননি তিনি আগে। আসলে পুত্রেরা সবাই দিল্লীতে থাকে না। তারা দেশের বিভিন্ন অংশে নানা ভাবে নিযুক্ত। যদিও দিল্লী থেকে খুব বেশি দূরে বড় একটা কেউ থাকে না। বড় বেগমসাহেবা পুত্র মহম্মদ-বিন-তুঘলককে অনুরোধ করেছিলেন সেইভাবে তাদের কাজ দিতে। তিনি পুত্রকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, আমি জানি এতে তোমার বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। কারণ সুলতান বংশের ছেলেরা অন্য ধরনের হয়। একই পিতা এবং একই মায়ের সন্তান হয়েও শৈশবের ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে তারা শত যোজন দূরে সরে যায়। একে অন্যের মৃত্যু কামনা করে। কখনো কখনো সেই মৃত্যু যাতে বাস্তব রূপ নেয় তার চেষ্টাও করে। তবু তোমাকে বলছি, ওদের দূরে রেখো না। তাতে

দুটো সুবিধা। প্রথমটা আমার স্বার্থ। আমি দেখতে চাইলে ওরা যাতে এসে দেখা করে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত তুমি ওদের ওপর নজর রাখতে পারবে। তবে ওদের কারও তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার হিম্মৎ নেই, একথা তোমাকে বলে দিচ্ছি। আর একটা কথা। নাসরৎকে দিল্লীতে রেখো। ও অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের। তুর্কী মায়ের বুকের দুধ খেয়ে অমন হ'ল কি করে জানিনা। ও দিল্লীতে থাকলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারবে ওর ওপর। দেখবে তোমার চোখের সামনে ও অনেক চক্রীর সাগরেদ হয়ে সবাইকে কথা দিয়ে ফেলছে। ওকে দূরে রাখা বিপজ্জনক। বরং কাছে থাকলে তুমি অনেকের স্বরূপ চিনে ফেলতে পারবে।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক বলেন— তুমি মন্দ বলনি মা। তবে বিহারে যে কোন একজনকে রাখতে হবে। রাখা প্রয়োজন।

আগের থেকে সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে।

বড় বেগমসাহেবা পুত্রবধূদের ডেকেছেন অনেকদিন তাদের দেখেননি বলে। তাছাড়া সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর থেকে হারেম কেমন যেন থমকে রয়েছে। যারা থাকে হারেমে তারাও যেন প্রাণোচ্ছলহীন। এর প্রধান কারণ হয়ত সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের দাপট। দাপট হারেমের ওপর নয়। সারা দেশে, বিশেষ করে রাজধানীতে নানা হুকুম এবং নানা কার্যকলাপের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছেন। সবাই ধীরে ধীরে বুঝেছে যে তাঁর সদিচ্ছার হয়ত অভাব নেই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি যা করেন তার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গতি থাকে না। হারেমে বসে তাঁর মা এবং তাঁর বেগম অনেক কথা শুনতে পান। মাঝে মাঝে তাঁর ভগিনী এসে সত্যমিথ্যা বানিয়ে মায়ের কাছে ভাই-এর সম্বন্ধে নানা কথা বলে চলে যায়। বড় বেগমসাহেবা বিস্মিত হন। তাঁর পুত্র তো এমন হতে পারে না। সে যে আর পাঁচজনের মত সাধারণ নয়, একথা তার পিতা তাঁকে বারবার বলেছেন। এ পর্যন্ত সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কোন ভবিষ্যদবাণী বিফল হতে দেখা যায়নি। তবু সব বেগমদের ডেকে একটা আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। তাঁর আর এক উদ্দেশ্য হ'ল তাদের কাছ থেকে সেই সব এলাকার সুলতান সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার কথা কৌশলে জেনে নেওয়া।

সবাই অতি উৎসাহে নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে এসে প্রাঙ্গণ ভরিয়ে তোলে। নিজেদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে নেয়। অনেকে একে-ওকে প্রথম দেখছে। কি করে দেখবে? এখন তো আর এক পরিবার নেই। যখন এক পরিবার ছিল তখন এইসব অল্পবয়সী বেগমদের কেউ-ই ছিল না। তখন ছিল শুধু সুলতান গিয়াসউদ্দিনের দুই বেগম, পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা। গিয়াসউদ্দিন তখন আমীরের পদে। ভবিষ্যৎ তখনো অনিশ্চিত। তবু তারই মধ্যে কোনো কোনো দিনের আনন্দের স্মৃতি মা এবং

ভাইবোনেরা নিশ্চয় এখনো নির্জনে রোমন্থন করে। তারপর একে একে বেগমেরা এল। আজ তারাই প্রধান। তাদের স্বামীরা এই মেলায় অপ্রাসঙ্গিক। তবে বেগমদের কারও কারও কচি কচি ছেলে মেয়েদের মিষ্টি মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুচারটি। অবাক বিস্ময়ে তারা সবাই এর ওর দিকে মুখ তুলে তুলে চাইছে। কেউ একটু হাসলে প্রতিদানে তারাও হাসছে। তাদের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগছে যে এরা কেউ তাদের দূরের নয়। তবে সেই অনুভূতি স্পষ্ট নয়।

বড় বেগমসাহেবা প্রাঙ্গণে এসে সবাইকে দেখে বহুদিন পরে পুলকিত হয়ে ওঠেন। তাঁর মুখে হাসি ফোটে। তিনি সোৎসাহে বলে ওঠেন-- বাঃ, এ যে দেখছি ফুল বাগিচায় প্রজাপতির মেলা।

সবাই ঘুরে দাঁড়ায় তাঁর দিকে। সবাই একসঙ্গে অভিবাদন জানায়।

— দাঁড়াও দাঁড়াও। আমি হিসাব মেলাতে পারছি না। ওই ছোট ছোট ফুলগুলো কি করে এলো সেটা অনুমান করতে পারছি মাত্র। কারণ এই ভাবেই আবহমান কাল ধরে জীবন-প্রবাহ বয়ে চলেছে। কিন্তু অন্যেরা? আমি জানতাম, আমার স্বামীর পাঁচ পুত্র। হিসাব অনুযায়ী এখানে কচি বাচ্চারা ছাড়া পাঁচ রূপসীর উপস্থিত থাকার কথা। অবশ্য আমার কন্যাকে এর মধ্যে ধরছি না। কিন্তু এ যে দেখছি অনেক বেগম। দেখি দেখি, গুনে দেখি। এক, দুই... বারো। সে কি?

একজন বেগম বলে ওঠে- কি করবেন, বড় বেগম সাহেবা আপনার সব পুত্র যে একজনে সন্তুষ্ট নয়।

— বাঃ, তোমার কথা তো মিষ্টি। যেন মধু ঝরছে। কি নাম তোমার?

-- বাঁদীর নাম আয়েসা।

-- বাঃ বাঃ, সুন্দর কথাও বলতে পার দেখছি। দেখেই বোঝা যায় তুমি খুব দুষ্টু। তুমি তো তিন জনের অভাব একাই পূরণ করতে পার। তোমার স্বামী কে?

— মহমুদ খাঁ।

— মহমুদের কপাল ভাল দেখছি। তাকে অবশ্য আমি নিজে দাঁড়িয়ে সাদি দিতে পারিনি। সে তখন ছিল দোয়াবে। কে ঠিক করে দিল?

— কে আবার, আপনার পুত্র নিজেই।

— নজরের তারিফ করতে হয়। ছেলেবেলায় বোকা ভাবতাম। আসলে তা নয়। তা, তোমাতে তার কুলোলোনা বুঝি ? আর কেউ আছে?

আয়েসা মুচকি হেসে বলে-- এখন পর্যন্ত কেউ নেই।

— তাই বল। মহমুদ শুধু ভাগ্যবান নয়, লোকটাও ভাল দেখছি। তোমার ওখানকার খবর কি?

— ভাল।

-- কোনরকম অসন্তোষ।

-- না।

-- সুলতান সম্বন্ধে কোনরকম কাণাঘুষা?

-- না।

-- বেশ।

তিনি ঘুরতে ঘুরতে আর একজন অপরিচিতা বেগমের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে বলেন--তোমার নাম কি?

-- আমার নাম জোহ্‌রা।

-- তুমি কার?

-- জাফর খাঁয়ের।

-- ও জাফর! কিন্তু সে আগে একটা সাদি করেছে বলে মনে হচ্ছে।

জোহ্‌রা মুখ গম্ভীর করে বলে-- একটা নয়, দুটো।

-- সর্বনাশ! জাফর সামলায় কি করে? ছেলেবেলায় ও তো তাগড়া ছিল না। বাকী দু'জন কোথায়?

জাফরের বাকি দুই বেগম জোহ্‌রায় পাশে এসে দাঁড়ায়।

একজনকে দেখে বড় বেগমসাহেবা বলেন-- তুমি তো বিলকিস। আমি সাদি দিয়েছিলাম। ধরে রাখতে পারলে না?

-- কি করব বলুন। ওকে বিহারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে দূরে থাকে। তিনটে শহরে পালা করে থাকতে হয় বছরের অধিকাংশ সময়ে। নইলে ঠিকমত রাজস্ব আদায় হয় না।

-- তাতে কি হয়েছে।

-- আপনার পুত্র বলেন, "একজনকে টানা হেঁচড়া করে তিন জায়গায় বারবার নিয়ে যাওয়া আসা করা অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চে' তিন জায়গায় তিনজন থাকলে তোমরাও নিশ্চিন্ত, আমারও সুবিধা। আমি আবার একা একা ঘুমোতে পারি না। পাশে কেউ না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে।"

-- সাংঘাতিক ছেলে তো? এরা সব এমন হয়ে উঠল কবে? ছেলেবেলায় দেখে মনে হত সাদাসিধে সরল।

বড় বেগমের কথা শুনে একজন নিজে থেকে এগিয়ে এসে একটু ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে-- ওরা ছেলেবেলায় ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করে বড় হলে কোন্ অকাজ-কুকাজ করবে। তাই অমন শান্ত শান্ত হয়ে থেকে পিতামাতাকে ধোঁকা দেয়। আসলে ওরা সবাই বজ্জাত।

-- তুমি কে ? চিনলাম না তো!

-- আমার নাম সুলতানা।

-- তুমি আবার কার?

-- হিসাব তো পেয়ে গিয়েছেন। আমাকে জানতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আপনার।

-- তা নয়। তোমার ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাও বুঝছি। কিন্তু বহরম খাঁ তো বরাবর বলত যে কোন পুরুষ যদি একজনের বেশি নারী পাওয়ার জন্য লোলুপ হয় তবে সে মানুষই নয়।

-- বলত নাকি? আপনার পুত্র খুব রসিক বলতে হবে।

-- ওর কয় বেগম?

-- পাঁচ।

-- বড় বেগমসাহেবা আঁৎকে ওঠেন। বলেন-- কার কয়টা করে সন্তান?

-- একজনেরও নেই।

-- এ্যাঁ?

-- হ্যাঁ। আপনার পুত্র বলেন, আমরা সবাই বন্ধ্যা। তাই যে রমনী সন্তান গর্ভে ধারণ করতে সক্ষম হবে তার সন্ধান চালিয়ে যাবেন তিনি।

-- বল কি? না না, এ হতে পারে না। ও নিজে ঠিক আছে তো? তোমাদের কি মনে হয়?

ইতিমধ্যে বহরম খাঁয়ের অন্য বেগমরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে সোফিয়া বেগম তিক্ত হেসে বলে-- আমরা বুঝব কি করে বড় বেগম সাহেবা? আমরা তো অন্য পুরুষকে পরীক্ষা করে দেখিনি। তাই কারও সঙ্গে ওর তুলনা করতে পারিনি। আমাদের কোন ধারণা নেই। তবে আমাদের ভাবভঙ্গি দেখে বাঁদীরা সন্দেহ করে আপনার পুত্র ষোল আনা পুরুষ নয়। হলে, আমাদের মধ্যে অনেক বেশি স্ফূর্তি থাকত আর আমাদের মধ্যে সবাই না হলেও কয়েকজন গর্ভবতী হতে পারতাম। আপনি শৈশবে ওকে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, আপনিই বলুন না, আপনার কি মনে হয়?

বড় বেগম সাহেবা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সেদিনেরসেই মিলনোৎসব যে উৎসাহ নিয়ে শুরু হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেই উৎসাহ ততটা ছিল না। তবে সবাই সবাইকে দেখল চিনল। শিশুরা খুব আনন্দ করল। বেগমসাহেবা তাদের নিয়ে খুব মেতে ছিলেন। পুত্রেরা তাঁকে সুখ দেয়নি। তাদের পুত্র কন্যারা অন্তত কিছুটা যদি পুষিয়ে দেয়। স্বামীর যেদিন ওভাবে মৃত্যু হ'ল, সেইদিনই তিনি বুঝেছিলেন তাঁর সুখের দিন শেষ।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের বেগম পুত্র ফিরোজের হাত ধরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সবাই সমীহ করেছে, কিন্তু আন্তরিকভাবে মেশেনি কেউ। বড় বেগমসাহেবার সঙ্গে তাঁর হামেশা দেখা হয় বলে, তিনিও গুরুত্ব দেননি। নতুনদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তাই এক সময়ে সবার অজ্ঞাতে তিনি ওখান থেকে চলে এসেছিলেন।

পুত্র ফিরোজ প্রশ্ন করেছিল-- চলে এলে যে? আমি ওদের সঙ্গে খেলব।

পুত্রের মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে তিনি বলেছিলেন-- তুমি বীরপুরুষ। তোমাকে আমি একটা ঘোড়া দেব।

-- সত্যি?

-- হ্যাঁ, তুমি কত বড় হবে।

-- সুলতানের চেয়েও?

-- সুলতান তোমার কে হন?

-- জানি।

-- কি করে জানলে।

-- তুমি বলেছ।

-- হ্যাঁ, তাঁর চেয়েও তোমাকে বড় হতে হবে।

-- উনি অনেক লম্বা।

বেগম হেসে বলেন-- সেই বড় নয়। পরে তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

বেগম ভাবেন, এত যে নারী এল, কারও সঙ্গে কারও হৃদয়ের যোগ নেই। প্রত্যেকেই যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রেখেছে। সেটা স্বাভাবিক। কারণ তাদের প্রত্যেকের স্বামীর কোন ভ্রাতার প্রতি এতটুকু দরদ নেই যখন, তখন বেগমদের মনে সেই দরদ সঞ্চারিত হবে কি করে? তাদের প্রত্যেকের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার ভাব। তবে লক্ষ্য করা গেল বড় বেগমসাহেবাকে কেউ বিশেষ পাত্তা দিল না। তারা বুঝে গিয়েছে তাঁর আর পূর্বের প্রতাপ নেই। কিন্তু তারা সুলতানের বেগম বলে তাকেও বিশেষ আমল দিল না। এর জন্য নিজেকে একটুও অবহেলিত বলে মনে হয়নি তাঁর। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু? জীবনে আর হয়ত দেখা হবে না কখনো। ফিরোজ বেঁচে থাক, ফিরোজ বড় হয়ে উঠুক, এইটুকুই তিনি চান, মনপ্রাণ দিয়ে চান। এদিকে কেউ যদি হাত বাড়ায় তাহলে তিনি হিংস্র হয়ে উঠতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

দিল্লীবাসী এবং বলতে গেলে তামাম হিন্দুস্থানবাসী একটি বজ্রপাতের ঘটনার কথা জানে, যা ছিল বড়ই মর্মান্তিক। অনেকের হৃদয়ে সেই বজ্রপাত শেলের মত গিয়ে

বিঁধেছিল। কারণ ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দিনের তার ফলে মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু সেই বজ্রপাতের পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল। আকাশে ধীরে ধীরে সেই বৎসরের প্রথম বর্ষণের আয়োজন শুরু হয়েছিল। মেঘের ঘনঘটা। এবং তারপরই রাজধানীর নানা প্রান্তে উচ্চনিনাদে বজ্রপাত। তারই একটি নির্ভুল এবং নির্মমভাবে বিদ্ধ করেছিল গিয়াসউদ্দিনের দারুনির্মিত নয়া প্রাসাদে।

কিন্তু এবারের বজ্রপাত বিনা মেঘে এবং তার শক্তি সহস্রগুণ বেশি। সেবারের বজ্রপাত ছিল বিধাতা নির্দ্ধারিত। কিন্তু এবারের বজ্রপাত স্বয়ং মনুষ্যসৃষ্টি। এই মানুষটি হলেন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক। হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের ইতিমধ্যে জানা হয়ে গিয়েছে যে তাদের সুলতানের সদগুণ ও বদগুণ যদি তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে চাপানো যায় তাহলে প্রায় সমান সমান। তবে বদগুণের প্রাবল্যে তিনি মাঝে মাঝে এত বেশি মরিয়া হয়ে ওঠেন যে সদগুণের পাল্লা আকাশ ছুঁয়ে যায় আর বদগুণের পাল্লা সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে।

এবারে সুলতান যে হুকুম জারি করলেন তাতে দিল্লীর খানদান মুসলমান পরিবারে কান্নার রোগ উঠল। এই সমস্ত পরিবার অতি প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভ্রান্ত। আমীর ভূস্বামী কবি হাকিম এমন কি মৌলানা মৌলবী এবং আল্লার প্রতি নিবেদিত প্রাণ সুফীরা কেউ তাঁর হুকুমের আওতা থেকে বাদ গেল না। এদের অনেকের দুই পুরুষ, তিন পুরুষের বাস দিল্লীতে। প্রত্যেককে নির্বিচারে চিরদিনের জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করে চলে যেতে বলা হ'ল দেবগিরিতে, যার নাম তিনি রেখেছেন দৌলতাবাদ। এই দৌলতাবাদ হবে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের নয়া রাজধানী। দিল্লী রইবে পরিত্যক্ত।

দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার স্বপ্ন বহুদিনের সুলতানের। যখন তিনি রাজা লুদ্দার দেও-এর দেশে ছিলেন তখনই তিনি প্রথম অনুভব করেন যে দিল্লী বড় দূরে। সেখান থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টকর। এর অপর একটি কারণ দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগন্য। মুসলমান রাজাই সেখানে নেই। দৌলতাবাদকে যদি রাজধানী করা যায় তাহলে সমগ্র হিন্দুস্থানের ওপর নজর রাখা অনেক সুবিধা। কারণ স্থানটি মোটামুটি দেশের মধ্যস্থলে।

রাজধানী স্থানান্তরের কথা সুলতান কিছুদিন আগে থেকে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছিলেন। উজির আমলারা ভেবেছিল ওটা খেয়ালী সুলতানের কথার কথা। কিন্তু শেষে একদিন তিনি এই বিষয়ে শুধু আলোচনা করবেন বলে দরবার বসালেন। সবাই সেখানে দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে আসন গ্রহণ করল।

সুলতান সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বললেন সবাইকে। দিল্লীতে রাজধানী রাখার অসুবিধার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার পর দৌলতাবাদের প্রসঙ্গ তুললেন। সেখানে

রাজধানী নিয়ে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সুবিধা হবে সব একে একে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

খাজা জাহাঁ ভাবে দৌলতাবাদের চেয়ে নিকটবর্তী কোন স্থানের কথা বলে দেখলে হয়। সে বলে-- আমি একটি স্থানের কথা বলব সেটা ভেবে দেখতে পারেন খোদাবন্দ।

-- কোন স্থান। পছন্দ হলে নিশ্চয় বিবেচনা করা হবে।

-- সেখানে শুনেছি অতীতে অনেক রাজা মহারাজা থাকতেন। অতি রমনীয় স্থান।

-- বলে ফেল।

-- উজ্জয়িনী।

-- শুনতে ভালই লাগে। তবে অবাস্তব পরামর্শ। ওখান থেকে লক্ষ্মণাবতীর দূরত্বের কথা মাথায় আসেনি তোমার।

সুতরাং দৌলতাবাদ। আইয়াজও জানত নড়ন চড়ন হবে না। তবু শেষ চেষ্টা। দিল্লী থেকে কিছুটা নিকটে ছিল উজ্জয়িনী।

আইয়াজ তখন বলে-- বহু মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে হুজুর। আর একবার চিন্তা করুন।

সবাই লক্ষ্য করল সুলতানের মুখ কেমন কঠিন হয়ে উঠল খাজা জাহাঁর কথা শুনে। বলতে গেলে অত্যন্ত হিংস্র দেখাল তাঁকে। মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজ নিজেই সেই মুখ দেখে ভয় পেয়ে যায়। সে জানে সুলতান তাঁর কাজের বা ইচ্ছার কোন প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে পারেন না। তবু নগরবাসীর অশেষ দুর্গতির কথা ভেবে ঝুঁকি নিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করেছিল। হ'ল না। এখন আর কোন সর্বনাশ না হলে সে বাঁচে।

-- তুমি এইপদে কতদিন আছ আইয়াজ।

-- আপনার সুলতানীর প্রথম দিন থেকে খোদাবন্দ।

-- তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং করিৎকর্মা ব্যক্তি এই দরবারেই আছেন। কুকাজে উসকানি দিয়ে বরাবরের জন্য মানুষের মাথায় চেপে বসে থাকা যায় না।

সুলতানের কথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়। কোন অর্থ খুঁজে পায় না। আইয়াজ লোকটিকে তারা ভাল বলে জানে। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার নীতিজ্ঞান অনেক প্রখর। বহু সৎ কাজ করে নিজের চেষ্টায়।

একজন আমীর কৌশলে কিছু বের করে নেওয়ার ধান্ধায় বলে-- খাজা জাহাঁ অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি হুজুর। উনি কখনো কুকাজে উসকানি দিতে পারেন না। আমি কিংবা এখানে অন্য কেউ হলে না হয় কথা ছিল।

সুলতান চিৎকার করে ওঠেন-- থামুন। মানুষের চরিত্রের কতটুকু আপনি জানেন? আমার সম্বন্ধে আপনারা কি আলোচনা করেন আমি জানি। আমার হাজার চোখ আর হাজার কান। তবে আলোচনায় আমি কিছু মনে করি না। আপনারা কেউ ষড়যন্ত্র করে দেখুন, আমি সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাব। তবু আপনারা ধারণা করতে পারবেন না আমি কতদূর যেতে পারি। আপনারা নিজেরাই নিজেদের কথা ভাবুন না কেন। আপনাদের সম্বন্ধে লোকেদের যে ধারণা তা কি ঠিক ? লোকেরা অন্যের সম্বন্ধে কতটুকু জানতে পারে, বুঝতে পারে?

-- তা --তা যা বলেছেন হুজুর।

আইয়াজ বিমর্ষ চিত্তে ভাবে উচ্চপদের লোভে ওই জঘন্য পাপ কাজটুকু না করলে আজ সে মাথা উঁচু করে থাকতে পারত। কিন্তু পারছে না। আজ সে অতি সহজেই উজিরের পদ পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে। পদের যে অন্ধ মোহে সে এককালে সুলতানের পেছনে পেছনে ঘুরে ছিল, সেই মোহ এখন কেটে গিয়েছে অনেকখানি। এখন সে সাধারণ জীবন যাপন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। নাসরিনের সংস্পর্শে থেকে থেকে কলুষতার কালিমা ধীরে ধীরে ধুয়ে যাচ্ছে। তবু তাকে এখানে থাকতে হবে। নইলে সুলতান বোধহয় তাকে জীবিত থাকতে দেবেন না। তার সন্তান সন্ততি রয়েছে। তারা অসহায় নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। আর রূপসী নাসরিন। হিংস্র মানুষেরা তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এক সময়ে বললেন-- আজকের দরবারে তাহলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছোন গেল যে দিল্লী থেকে রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনদিন সময় দিলে সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি বিবেচনা করে দেখেছি এতদিনের পুরোনো শহর ছেড়ে অপরিচিত স্থানে যেতে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। তবে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে যেন একজন প্রাণীকেও দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াতে দেখতে না পাই। এমন কি গৃহপালিত কুকুর বেড়ালও নয়। সব কিছু দৌলতাবাদে নিয়ে গিয়ে এই একই পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে সেখানে। এই বিষয়ে আমি প্রজাকুলকে বুঝিয়ে বলতে চাই এক জমায়েতে। আইয়াজ, কোথায় ব্যবস্থা করা যায়?

-- প্রাসাদের সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রচার মঞ্চ নির্মাণ করা যেতে পারে।

-- উত্তম প্রস্তাব। তুমি এই বিষয়ে ওস্তাদ। তবে দেখো যেন আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলার সময় সেটি আমাকে নিয়ে ভেঙে না পড়ে।

আইয়াজ তার বুকের ভেতর তীব্র যাতনা অনুভব করে।

সমগ্র রাজধানীতে হতাশা নেমে আসে। প্রথমেই সবাই ভেবেছিল সুলতানের খেয়াল, দু'দিন পরে কেটে যাবে। কিন্তু তা নয়। খোঁজ নিয়ে দেখেছে তারা পুরোদস্তুর

আয়োজন চলছে। সুলতানের পরিবারেও। সেখানে নাকি কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। তবে বৃথাই। আর সিদ্ধান্ত যে অনড় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ প্রাসাদের সম্মুখে মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজের তত্ত্বাবধানে বিশাল একটি প্রচার মঞ্চ নির্মিত হচ্ছে। কেউ বুঝতে পারে না, মুসলমানদের ওপর এতবড় আঘাত কেন দিচ্ছেন সুলতান। বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ওপর। হিন্দুরা মনে হয় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুলতানের সিপাহীরা ঘন ঘন প্রতিটি মুসলমানের দ্বারে গিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে আসছে যাত্রার দিন সমাগত। অথচ হিন্দুদের গৃহে তারা যাচ্ছে না। এর জন্য হিন্দুদেরও অস্বস্তি কম নয়। তারা ভাবছে, চিরকাল তো মিলেমিশে ওঠাবসা করেছি, এখন আবার পৃথক ফল কেন? সুলতানের অন্য কোন মতলব আছে নাকি? ক'দিন পরে হয়ত ফরমান জারি করবেন, হিন্দুরা সব কলিঙ্গের জাজনগরে চলে যাক।

কয়েকদিন পরে অবশ্য হিন্দুদের আতঙ্ক দূর হ'ল। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠল। কারণ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সুলতান যা ঘোষণা করলেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল দিল্লী পরিত্যাগের দিন ঘনিয়ে এসেছে। সুলতান ঘোষণা করলেন-- দৌলতাবাদ হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নগর। সেটি হবে মুসলমানদের শিক্ষা আর সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এসে এই শহর দেখে চমৎকৃত হবেন। আসুন, যারা নাস্তিক, তাদের বিরুদ্ধে আজ আমরা জেহাদ ঘোষণা করি। আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই আল্লার প্রতি অবিশ্বাসী। উত্তরখণ্ডে যেমন ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা ঘুরে ঘুরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মপ্রাণ করে তুলেছেন দক্ষিণেও তেমন করতে হবে। তাই আমি সব চাইতে প্রথমে সেখানে নিয়ে যেতে চাই মৌলানা, মৌলবী, সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি আর কবি লেখকদের। সাধারণ মানুষদেরও নেব, নইলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ফাইফরমাশ কে খাটবে? তাঁরা গেলে তাঁদের পোষ্য জীবজন্তুও যাবে। সমস্ত গরু এবং সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ও নিতে হবে। শিশুদের ও নিজেদের গোদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। এক কথায় আপনারা এখানকার সব কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিছুই ফেলে রেখে যাবেন না। শুধু বাড়িটি এবং বাগান পড়ে থাকবে।

একজন বলে ওঠে-- খেতের ফসল?

চটে গিয়ে সুলতান বলেন-- পড়ে থাকবে। ওখানে আপনারা জমি পাবেন, ফসল ফলাবেন তখন। তাছাড়া রওনা হওয়ার আগে আপনারা পথ খরচা বাবদ অর্থ পাবেন। ওখানে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমি আপনাদের মুশকিলে ফেলার মতলবে কিছু করছি না। শুধু একটা স্বপ্ন সফল করে তুলতে চাই। সেই স্বপ্ন, একা আমি নই, আপনাদের সকলকে দেখতে হবে। তবেই আমরা সফল হব। বহুদিন

এখানে রয়েছেন বলে আপনাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু গিয়ে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

একজন বলতে যাচ্ছিল, ফলন্তগাছ পাওয়া যাবে? আম, বেল, লিচু?

কিন্তু সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। বুঝল, কিছু বলতে গেলে তার গর্দান যাবে। কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তাঁর ওই অভ্যাস রয়েছে। তাই সবাই নীরবে মাথা পেতে মেনে নিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে। তাদের মধ্যে অতি বৃদ্ধ দু'একজন বলাবলি করতে থাকে-- মহম্মদ বিন তুঘলককে আল্লা পাঠিয়েছেন চাবুক করে। দিল্লীর মুসলমানেরা অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। তারা লোভী, স্বার্থপর দুর্নীতি পরায়ণ। তাই আল্লা তুঘলকের মাধ্যমে এদের শাস্তি দিচ্ছেন।

একজন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে--- আপনি বাদ যাবেন নাকি?

-- না, আমাকেও যেতে হবে। দেশে দুর্নীতি এত বেশি ছেয়ে গিয়েছে যে কেউ একক ভাবে ভাল থেকে বাঁচতে পারে না। তাই আমিও শাস্তি পাচ্ছি।

একজন যুবক হেসে বলে-- আপনার কি ধকল সহ্য হবে?

-- না। ঠাণ্ডার সময় হলে তবু সম্ভাবনা ছিল।

সবার মনে যখন দৌলতাবাদ নামটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, তখন মহম্মদ বিন তুঘলক শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার এক বিখ্যাত ভক্ত শেখ শামসউদ্দিন ইয়াহিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে এক অদ্ভুত নির্দেশ দিলেন। তাঁকে দৌলতাবাদে না পাঠিয়ে তিনি বললেন-- আপনি কাশ্মীরে যান।

— কাশ্মীরে? কেন?

— আমার কথা শেষ হওয়ার আগে কোন রকম প্রশ্ন করবেন না। আমি পছন্দ করি না।

শেখ শামসউদ্দিন নীরব থাকে।

-- কাশ্মীরের অধিবাসীরা অধিকাংশই পৌত্তলিক। আপনি তাদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ইসলাম ধর্মপ্রচার করুন।

ইয়াহিয়া ভাবে, নিজামউদ্দিন আউলিয়া সম্প্রতি দেহ রেখেছেন বলে সুলতান এত সহজে একথা বলতে পারলেন। তিনি জীবিত থাকলে সুলতানের মাথার পোকা কখনই এভাবে নড়ে উঠত না। সুলতানের ওপর একটা অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পারতেন তিনি।

যারা শুনল সবাই বিস্মিত হ'ল। এমন কি উজির আমীর সবাই। সুলতান যখন সবাইকে দৌলতাবাদ নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র তখন একা শেখ শামসউদ্দিনকে অতদূরে পাঠাতে চাইছেন কেন? নিশ্চয় কোন গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে।

ইয়াহিয়া নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য সামান্য কয়েকদিনের সময় চাইল। গম্ভীর হয়ে সে গৃহে ফিরল। বয়স হয়েছে তার যথেষ্ট। বেগমের গত বছর মৃত্যু হয়েছে। পুত্রবধুরা তার দেখাশোনা করে। হাকিম বলেছে বহুমূত্র রোগ রয়েছে তার। অতি সাবধানে নিয়মমত থাকতে হবে।

তাকে গম্ভীর দেখে সবার মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। সুলতান নিশ্চয় কোন অসম্ভব কাজের কথা বলেছেন তাঁকে।

শেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করে-- সুলতান কি বললেন?

শামসউদ্দিন বিস্তারিত ভাবে সমস্ত কথা পুত্র ও পুত্রবধূদের কাছে বলে।

-- কি হবে?

-- রাতটা ভেবে দেখি।

পরদিন সকাল হতেই সবাই আবার শামসউদ্দিনের কাছে গিয়ে বসে। তাদের দৃষ্টি তার মুখের দিকে।

-- হ্যাঁ, আমি আদেশ পেয়ে গিয়েছি।

-- কার?

-- সেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া কাল রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন-- চলে আয়। আমি তাঁর কাছে যাব। সুলতান আর তাঁর অনুচরেরা শত চেষ্টা করেও আমাকে অন্য কোথাও নড়াতে পারবেন না।

দু'দিন পরে শেখ ইয়াহিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার দেহ উত্তপ্ত হয়। বক্ষ দেশের এক পাশে দুষিত ক্ষত দেখা দেয়।

ওদিকে সুলতানের তাগাদা। তাই, পরদিন শল্য চিকিৎসককে ডাকতে হয়। সে এসে অস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থানটি কেটে যখন পট্টি বাঁধতে যাবে তখন সুলতানের এক আজ্ঞাবহ এসে বলে-- সুলতান শেখকে স্বচক্ষে দেখতে চান।

শামসউদ্দিনের পুত্র বিনীত ভাবে বলে-- আপনি ভেতরে এসে দেখে যান। তিনি খুব পীড়িত।

-- আমি দেখলে চলবে না। সুলতানকে বোঝাবে কে? শেখকে তিনি সশরীরে দেখতে চান।

শেখ শামসউদ্দিন তখন অত্যন্ত কাতর। তবু সে কথোপকথন শুনতে পায়। পুত্রকে ডেকে বলে-- একটা শকট আন। আমি যাব।

-- এ যে অসম্ভব কথা বলছেন আপনি। এ অবস্থায় গেলে আপনি বাঁচবেন না।

-- বাঁচা মরার কথা পরে ভেবো। আজ যদি আমি নিঃসন্তান হতাম, কিছুতে যেতাম না। কিন্তু তোমরা আছ, তোমাদের ভবিষ্যৎ আছে। শকট আনো।

ওই অবস্থায় শেখ শামসউদ্দিনকে নিয়ে যাওয়া হ'ল দরবারে। সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক নিজের চোখে ভাল ভাবে দেখলেন শেখকে।

-- ঠিক আছে। নিয়ে যাও। তিন দিন বিশ্রামের পরে আবার দেখব।

কিন্তু তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই শেখ চলে গেল সুলতানের রাজত্বের অনেক বাইরে পৃথিবীর সীমারেখার ওপারে যেখান থেকে তার ডাক এসেছিল।

শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার অপর এক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিষ্য হ'ল শেখ সিরাজ উদ্দিন উসমান। সে শেখ শামসউদ্দিন ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিল। ইয়াহিয়াকে অন্তিম শয়ানে শায়িত করে গোরস্থান থেকে সগৃহে প্রত্যাবর্তন করে পরিবারের সবাইকে ডেকে বলে— তোমরা প্রস্তুত হও।

-- কেন?

-- আজ রাতে আমাদের দিল্লী ত্যাগ করতে হবে।

-- হঠাৎ?

-- না হলে আমার দশা ইয়াহিয়ার মত হবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি সুলতানের এখন ঝোঁক হয়েছে আউলিয়ার ঘনিষ্ঠদের দেশের নানা দিকে প্রচারের জন্য পাঠাতে হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা আমি জানি না।

-- তাই বলে এক রাতের মধ্যে?

-- এক রাত তো অনেক বেশি সময়। এই রাত শেষ হওয়ার আগে আমাদের বহু দূরে চলে যেতে হবে।

-- গন্তব্যস্থল?

-- লক্ষ্মণাবতী। দৌলতাবাদ থেকে হাজারগুণ ভাল।

খবরটা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কানে গিয়ে পৌঁছোল দু'দিন পরে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রতিটি গৃহের ওপর নজর রাখার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেন। আর সেই সঙ্গে সুলতান দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ যাওয়ার দীর্ঘ পথে নিয়মিত দূরত্বে সরাইখানা, চটি ও জনবসতি পত্তনের ব্যবস্থা করেন। এতে দল বেঁধে দিল্লী পরিত্যাগ করার পথে পথশ্রম সহ্যের সীমা অতিক্রম করবে না।

প্রথম দল যেদিন দিল্লী পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্য দৌলতাবাদের দিকে যাত্রা শুরু করল তার ঠিক আগের দিন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের নিকট আরজি পেশ করল এক যুবক। নাম তার ইসামি। পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সে। লেখা নিয়ে থাকে। চমৎকার কিতাব লেখে। এই বয়সে বেশ নাম ডাক হয়েছে। মুলতানেও তার নাম গিয়ে পৌঁছেছে। বংশ উচ্চ।

পিতামহ ছিলেন সিপাহ-শালার। এখন অতি বৃদ্ধ। নাম তাঁর আইজউদ্দিন ইসামি।

যুবক ইসামি তার পিতামহের পরিচয় সুলতানকে দিয়ে অনুনয় করে বলে-- এখন তাঁর বয়স নব্বই। এই গ্রীষ্মে পথশ্রম তিনি আদৌ সহ্য করতে পারবেন না। আপনি তাঁকে দিল্লীতে থাকার অনুমতি দিন, পরিবারের অন্য সবাই চলে যাবে। শুধু আমি তাঁকে দেখাশোনার জন্য থেকে যাব কিছুদিনের জন্য। তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

— নাম ডাক তো কিছু হয়েছে তোমার। অথচ এমন অবিবেচকের মত কথা বলছ কেন? পিতামহ ছিলেন সিপাহ-শালার। তাঁরই তো সবার আগে এগিয়ে যাওয়া উচিত। বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে? তাঁর মত বয়স দিল্লীর আর কারও নেই? দেখবে, শুনে শেষ করতে পারবে না। দিল্লীবাসীরা একটু দীর্ঘজীবী হয়। খোদ সুলতানের ছায়ার নীচে থাকে তো। যাও, কালকের জন্য প্রস্তুত হও। তুমি হয়ত জান না, আমার হুকুমের নড়চড় হোক এটা আদপে আমার পছন্দ নয়। যাও যাও, তোমার মত সবার আর্জি শুনলে দিল্লী কোনদিনই ফাঁকা হবে না। দৌলতাবাদও কোনদিন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে না। স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তব রূপ নেবে না। তোমার পিতামহ সবার সঙ্গে আগামী কালই রওনা হবেন। আমি লোক পাঠিয়ে দেখব তিনি চলে গিয়েছেন কিনা।

ক্ষোভে দুঃখে ইসামির মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। সুলতানের দরবারে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পিতামত তাকে বলেছিলেন-- কোন লাভ হবে না। শুধু শুধু বদনাম। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। সেটা না হয় আর একটু ত্বরান্বিত হবে। ওই খ্যাপা লোকটার কাছে গিয়ে কাজ নেই।

তাঁর কথাই সত্য হ'ল।

ক'দিন থেকে সুলতানের দিন আর রাত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কাটছে। অনেক খানদান পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কোনরকম সঙ্কোচ না করে সোজা এসে সুলতানের কাছে হাত পাতছে। বলছে অর্থ নেই। সুলতান রীতিমত বিব্রত বোধ করেন এদের চাওয়া দেখে। তাঁর ধারণা ছিল এরা যথেষ্ট ধনবান। সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলে ওরা হেসে বলে-- নগর জীবনে ঠাটঠমক বজায় রাখতে ধার করে চালায় তারা। নইলে সম্মান থাকে না। সকলে বাঁকা পথে অর্থ উপার্জন করতে পারে না। অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকে উৎপীড়নও চালাতে পারে না। তাঁর মা বড় বেগমসাহেবা ইতিমধ্যে একটি তহবিল খুলেছেন দৌলতাবাদগামী যাত্রীদের সাহায্যের জন্য। বহু লোক নিয়েছে। কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে অনেকে দুবারও নিয়েছে। অনেক হিন্দুও নাকি থুতনিতে নুর লাগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধরা পড়লে চূড়ান্ত শাস্তি। কিন্তু ধরবে কে? সবাই বুঝে গিয়েছে গরজটা সুলতানের। তাই অত দেখাদেখি নেই।

সুলতানের ছটফটানি যাত্রার আগের দিন খুবই বৃদ্ধি পেল। তিনি বলে দিয়েছেন,

তাঁর প্রাসাদের সামনে দিয়ে যাত্রীদের যেতে হবে। অনেক ঢাকা গাড়ি যোগাড় হয়েছে। মহিষ, বলীবর্দ অশ্ব— সব কিছুর শকট। কেউ দ্রুত যানে এগিয়ে যেতে চায় তো যাক। ক্ষতি কিঃ শিবিকা রয়েছে কিছু কিছু। বড় বেগমসাহেবা পুত্রকে বলেছেন তিনি যেদিন রওনা হবেন সেদিন তাঁর শকটের সঙ্গে একটা দোলার ব্যবস্থা থাকে যেন। কারণ তাঁর বাতের ব্যথা। শকটে কিছুক্ষণ চললে ব্যথা হতে পারে। তখন একটু আয়েস করে দোলায় চড়ে যাবেন। কিন্তু সবাই তো আর মখদুমা-ই-জাহাঁ নয়। তাদের দুইরকম যানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অনেক পুরুষ তাদের পরিবারের শকটের পাশাপাশি অশ্বে যাবেন। কেউ কেউ হাতিতে।

উষার আলো ফুটতে না ফুটতে মহম্মদ বিন তুঘলক প্রাসাদ শীর্ষে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর নিজের বেগমের এসব বিষয়ে অদ্ভুত এক নিস্পৃহ ভাব। তাঁর জীবন এখন শুধু পুত্র ফিরোজময়। ফিরোজ যদি কখনো সুলতান হয়, তবে তাকে বলতে হবে সে যেন খেয়ালের বসে অমানুষ না হয়ে যায়। তার অন্তরের করুণার উৎস মুখ যেন শুকিয়ে না যায়। সে যেন সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা নিজের বলে অনুভব করতে পারে। আর তাকে বলতে হবে সে যেন সুলতান হয়েও তার ফিরোজ নামটা পরিত্যাগ না করে।

দৌতলাবাদে যাওয়ার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হলেও সুলতান পরিবারের সবার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বেগমও প্রাসাদ শীর্ষে গিয়ে দাঁড়ান। এটা একটা অভিজ্ঞতা তো'বটেই। মনে মনে ভাবেন, পৃথিবীর আর কোথাও কেউ কখনো এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে কিনা কে জানে। দুনিয়ার অন্য কোন সুলতান কোনদিন হয়ত রাজধানী পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু রাজধানীর প্রতিটি নাগরিককে ভয় দেখিয়ে তাদের কুকুর বেড়াল সমেত অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন বলে মনে হয় না।

দূরের প্রাচীরে সূর্যের প্রথম আলোর অস্পষ্ট রঙের ছোঁয়া। সেই সময় দেখা যায় দুটি হাতি পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। সুলতানের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। প্রথমেই হাতি কেন? গতকালই তিনি একদল সিপাহী পাঠিয়েছেন যারা রাস্তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে করতে দৌলতাবাদ গিয়ে পৌঁছোবে। তাই আজ সাধারণ শকট যাওয়ার কথা। হাতির গতি দ্রুত বলে পরে গেলে চলত। কিন্তু হস্তীদ্বয় থেমে গেল। তারা প্রাসাদের ফটকের দুই পাশে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণে সুলতানের খেয়াল হ'ল। নিশ্চয় প্রাসাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কে করল? কার মাথায় এই বুদ্ধি এল যা তাঁর মাথায় আসেনি? চোদ্দ পুরুষের ভিটে পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময় সুলতানের আবাসস্থল দেখে বিক্ষুব্ধ হতে পারে বৈকি কেউ কেউ। মনে হয় মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজ এই ব্যবস্থা করেছে। লোকটা এক মারাত্মক অপরাধে অপরাধী হলেও, খারাপ বলা যায় না। তাঁর নিজের আর আইয়াজের অপরাধ

বোধহয় পাকেচক্রে ঘটে গিয়ে থাকবে। কিন্তু সেই অপরাধ ঘটেছিল বলেই তো এত তাড়াতাড়ি একটি স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে শকটগুলি। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের হৃদয় নৃত্য করতে থাকে। তিনি প্রথমে নিজের বেগমের দিকে যেতে গিয়ে তাঁর নিশ্চল মূর্তি দেখে থমকে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে নিজের মায়ের কাছে গিয়ে বলেন-- তোমার আনন্দ হচ্ছে না মা?

-- নিশ্চয় হচ্ছে। তোমার এতদিনের স্বপ্ন-- আনন্দ হবে না। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বেঁচে থাকলেও আজ আনন্দিত হতেন।

মায়ের উক্তিতে মহম্মদ বিন তুঘলকের উচ্ছ্বাস কয়েক মুহূর্তের জন্য জমে বরফ হযে যায়। অদূরে তাঁর নিজের বেগমের চোখ দিয়ে তখন দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাঁব নিজের পিতামাতা বহুদিন মৃত। তাঁর নিজের ভাই বোনও নেই। কিন্তু তাঁর খুল্লতাতরা রয়েছে, তাঁর মাতুল রয়েছে। তারা সবাই বযস্ক এবং অসুস্থ। ওইসব শকটের কয়েকটিতে তারাও রয়েছে। বাধ্য হয়ে এগিয়ে চলেছে মৃত্যু গহ্বরের দিকে সেই বৃদ্ধ হতভাগ্যের দল। এবারে যা গরম পড়েছে অনেকেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারবে না। অনেক সময় একান্তে বসে স্বামীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন বেগমসাহেবা। স্বামীর তীক্ষ্ম বুদ্ধি, নানা বিষয়ে অগাধ জ্ঞান। কোথা থেকে এত বিষয় জানতে পারেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শুনেছেন শৈশব থেকেই জ্ঞান আহরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। হয়ত সেই সময় থেকে সব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু কখন করেন? একেই কি বলে প্রতিভা? খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিষয়ে সব কিছু গভীর ভাবে জেনে ফেলা? সাধারণত খুব বুদ্ধিমান মানুষকে যার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়, একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি অনায়াসে তা রপ্ত করে ফেলে। শুধু কিতাবী বিদ্যা নয়, অসি বিদ্যা, বর্শা নিক্ষেপ, অশ্ব চালনা, সৈন্য পরিচালনা প্রতিটি বিষয় স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধহস্ত। উনি তাঁর সঙ্গে অনেক সময় চীন পারস্য মিশর ইত্যাদি নানা দেশ সম্বন্ধে কথা বলেছেন। মনে হয়েছে সেই সব দেশের খুঁটি নাটি সব কিছু তাঁর নখদর্পণে। ওদেশও যেন হিন্দুস্থানের মত হাতের পাঁচ আঙুলের এক আঙুল। সামনের ওই সারি সারি ধীরগতির শকটগুলো দেখে ভাবতে ইচ্ছা করে না অমন একজন ব্যক্তির জন্য আজ এই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাতরাতে কাতরাতে চলা গাড়ির শ্রেণী। গাড়ির কিছু কিছু চাকা শব্দ করছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ। মনে হচ্ছে ওই শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে এইসব যাত্রীর অন্তরের অন্তঃস্থলের অসহায় আর্তক্রন্দন। বেগম একবার আড়চোখে সুলতানের মুখের দিকে চাইলেন। বেশ খুশী খুশী ভাব সুলতানের। তাতে তাঁর মন আরও বিষন্ন হয়ে পড়ে। তিনি জানেন তাঁর স্বামীর মনের মধ্যে

অধিকাংশ সময়ে পরস্পর বিরোধী বৃত্তি কাজ করে। এই খুশী ভাব নিশ্চয় তার একটি লক্ষণ। মহম্মদ বিন তুঘলকের মন যথেষ্ট সংবেদনশীল। ওই গাড়িগুলো চলার আওয়াজ যেভাবে বেগমের মনে কাজ করছে সুলতানের মনেও সেই একইভাবে কাজ করলে খুব স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু আজ তাঁর মনকে তাঁর স্বপ্ন চেপে রেখে দিয়েছে। এই স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তিনি এখন কল্পনায় দেখছেন নতুন রাজধানী দৌলতাবাদের মায়াময় ছবি। চোখের সামনে দেখছেন রাজধানীর মনোরম সব পথঘাট। সেই পথ দুই পাশের তরুশ্রেণী দ্বারা ছায়াসুশীতল। পথিপার্শ্বে মাঝে মাঝে স্বচ্ছ সরোবর অস্তমিত সূর্য কিরণে রঙিন হয়ে উঠেছে। তিনি শুনতে পাচ্ছেন এক সঙ্গে বিভিন্ন দিকের মসজিদ চূড়া থেকে মিলিত আজান ধ্বনি। দেখছেন আমীর ওমরাহ্ ব্যস্ত হয়ে প্রাসাদের দিকে ছুটছে। আরও কত কি তিনি দেখছেন ওই ধুঁকতে ধুঁকতে চলা শকটশ্রেণীর দিকে চেয়ে চেয়ে কেউ বলতে পারবে না। তাঁর স্বপ্ন তাঁকে নির্মম করে তোলে। সেই স্বপ্নে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তিনি হন হিংস্র।

সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ। যাত্রীর দল অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে রাজস্থানের তপ্ত আবহাওয়ার দিকে। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সুলতান বলে দিয়েছেন যাত্রীর দলকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একদল অশ্বারোহী নিযুক্ত রাখতে। তারা রয়েছে। পাহারাও দিচ্ছে। যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। হাকিম বৈদ্য রয়েছে তাদের নিজেদের পরিবারের সঙ্গে। অশ্বারোহীরা জানে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ওদের কোথায় পাওয়া যাবে। পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রত্যেকে নিজেদের মত করেছে। তবু অশ্বারোহীরা সাহায্য করবে। এই পথে কোথায় কি পাওয়া যায় তারা সব জানে। আগে একবার এই পথ দিয়ে দৌলতাবাদ গিয়ে ঘুরে এসেছে তারা। আপাত দৃষ্টিতে ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। অথচ দুর্গতিরও শেষ নেই।

তৃতীয় দিনের পরে দিবাবসানে সিপাহ্ শালার আইজউদ্দিন পুত্র এবং পৌত্রকে ডেকে বলে— আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবে।

পুত্র নীরব থাকলেও পৌত্র বলে— খুনীর রাজত্বে বাস করি বলে আমরাও খুনী হয়ে যাইনি।

আইজউদ্দিন বলে-- তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

— তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনি একথা বলছেন কেন? আপনার শরীর খারাপ?

— শরীর ভাল হ'ল কবে?

— নতুন উপসর্গ?

— না, তেমন কিছু নয়। তবে আমি আর দু'দিনও বাঁচব না।

দুজনাই চমকে ওঠে। তারা ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধের ওপর। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুধু ক্ষীণ। অন্য কোনরকম কষ্ট বেদনার চিহ্নমাত্র নেই।

— ওভাবে দেখে বুঝবে না। এ হ'ল বৃদ্ধ বয়সের মৃত্যু। দিল্লীতে ছিলাম। কোন উত্তেজনা ছিল না, শরীরের ওপর ধকল ছিল না। হয়ত দু-এক বছর বাঁচতাম। এই দু-দিনে প্রাণশক্তি শেষ হয়ে এসেছে। তাতে আফশোষ নেই। শুধু তোমাদের বিড়ম্বনা বাড়ালাম বলে দুঃখ হচ্ছে।

পৌত্র বৃদ্ধের হাত দুহাতে তুলে নিয়ে বলে— আমাদের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। যেদিন দিল্লী ছেড়েছি সেদিন থেকে জানি দুঃখের দিন শুরু হয়েছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি—

পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বৃদ্ধের পাশে এসে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে। শিশুরা বিস্ময়ে নিজেদের মায়ের দিকে চেয়ে কান্নার কারণ খোঁজে। তাছাড়া তাদের মধ্যে একজন এই দুদিনের কষ্টে সুস্থ নেই।

বৃদ্ধ বলে— পথে যেখানে হোক আমাকে গোর দিও। এজন্য মন খারাপ করবে না।

বৃদ্ধের পুত্র এতক্ষণ অটল ছিল। এবারে ভেঙে পড়ে বলে— দিল্লীতে আপনার জন্য একটা সুন্দর জায়গা কিনে রেখেছিলাম। কত আশা ছিল সেখানে আপনার শেষ শয্যার ব্যবস্থা করব। হ'ল না। ওই শয়তানের জন্য হ'ল না। আপনি এই অজানা স্থানে কোথায় থাকবেন সবাই ভুলে যাবে। কার জমি— সে কি করবে কিছু ঠিক নেই।

— এত ভেবে কাজ কি? এখন তোমাদের প্রধান কাজ হ'ল এই শিশুরা যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়ে। আর দেখো এরা যেন মানুষ হয়। ভবিষ্যতে যদি তেমন দিন আসে, সামান্য সুযোগ পেলে দিল্লী ফিরে যাবে।

দু'দিন পরেই বৃদ্ধের মৃত্যু হ'ল। তার মৃত্যু এল ধীরে, খুব ধীরে। ঠিক যেমন শেষ বেলার সূর্য কর্মক্লান্ত পৃথিবী থেকে তার আলোর সর্বশেষ রশ্মিটুকু মুছে নিয়ে ছায়ায় ঢেকে দেয় তেমনি ভাবে তার মৃত্যু নেমে এল। ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল এক দীর্ঘজীবনের কর্মময় দিন।

এক অর্ধোন্মাদ যুবক প্রথম দিন থেকে তার অসংলগ্ন আচরণ আর কথাবার্তায় যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। এই এক ঘেঁয়ে দুঃখদায়ক যাত্রাপথে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করছিল সে। অইজুদ্দিনের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সে দিল্লীর দিকে মুখ করে হাত নাড়িয়ে বলে উঠল — দেখে যা মহম্মদ বিন তুঘলক, তোর হুকুম ইনি মানলেন না। থেমে গেলেন। সাধ্য থাকে নিয়ে যা এঁকে তোর সেই দৌলতাবাদে। অত সস্তা নয়। হাঃ হাঃ হাঃ—

লোকটির নাম কলিমউদ্দিন। দিল্লীর তুঘলকাবাদের সন্নিকটে তিন পুরুষের ভিটে। কলিমউদ্দিনের আগের দুই পুরুষ ভিটে সংলগ্ন জমিতে শুয়ে রয়েছে। তাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। হয়ত সাময়িক কিংবা হয়ত চিরদিনের জন্য। তার পুত্র কন্যা নেই। কিন্তু যুবতী স্ত্রী রয়েছে। সে নীরবে চোখের জল ফেলে চলে। প্রথম দু'দিন স্বামীকে সামলে রাখার চেষ্টা করেছিল। পরে বুঝেছিল কোন লাভ নেই। কলিমউদ্দিন অনেক সময় দূরে চলে গেলে যাত্রীরা তাকে বেগমের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। কারণ তার তৃষ্ণা থাকলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয় বলে মনে হয় না। এর ওর কাছ থেকে কথায় কথায় চেয়ে চেয়ে জল খায় আর বুক ডলতে ডলতে বলে-- তেষ্টা। বুক শুকনো মরুভূমি।

পথে তৃষ্ণার বারির অকুলান। কিন্তু কেউ কলিমউদ্দিনকে ফেরাতে পারে না। কারণ তাবা জানে লোকটার ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। এত পিপাসা, অথচ একবারের জন্যও মুখ ফুটে বলতে শোনা যায়নি-- খিদে পেয়েছে, দুটো খেতে দাও।

কলিমউদ্দিন সবার সঙ্গে আইজউদ্দিনের মৃতদেহের সঙ্গে কিছুদূরে একটি নিমগাছের নিচে এসে পৌঁছায়। সেখানে কবর খনন করা হলে সেও মাটি দেয়। তারপর আবার দিল্লীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে-- তোর হাতের দিকে চেয়ে দেখ। খুন লাগল হাতে। আরও কত লাগবে। বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে মাটিতে পড়বে।

যাদের কানে কলিমউদ্দিনের প্রলাপ গেল তারা বুঝল সত্য কথা বলছে সে। সুদীর্ঘ পথে এই মৃত্যু সূচনা মাত্র। আরও কত মৃত্যু হবে, দুর্গতি বাড়বে। মুখে কেউ কিছু বলল না। তারা তো কলিমউদ্দিনের মত পাগল হয়নি। তারা জানে তাদের ধড়ে একটাই মাথা।

মালিক আবদার রহিমের দুশ্চিন্তা তার পুত্রবধূর জন্য। এক বছর হ'ল সাদি হয়েছে। তিন মাস আগে সুলতান পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন জাজনগরে কাজের ভার দিয়ে। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। অন্য যে কেউ যেতে পারত। কিন্তু সুলতানেব পছন্দ তার পুত্রকে। পুত্রের কথা মনে ছিল, কারণ এক বছর আগে পুত্রের সাদিতে সুলতান নিমন্ত্রিত ছিলেন। পুত্র সুপুরষ বলে সুলতানের মনে ধরেছিল। তাকে ডেকে পাঠিয়ে কাজের কথা বলে শেষে তাকে উৎসাহদানের জন্য সামান্য রসিকতা করে বলেছিলেন যে কাজ শেষ হলে সোজা দৌলতাবাদে চলে যেতে। সেখানে নতুন পরিবেশে নিজের বিবিকে দেখতে আরও ভাল লাগবে। তার পদোন্নতি হবে সেখানে।

পুত্রের মুখে সুলতানের হুকুমের কথা শুনে মালিক আবদার রহিম বুঝেছিল, ব্যর্থ ক্রোধ প্রকাশ করে কোন লাভ নেই। পুত্রকে জাজনগরে যেতে হবে এবং নির্দিষ্ট দিনে পরিবারের অন্যদেরও দৌলতাবাদের দিকে রওনা হতে হবে। মালিক আবদার জানে পুত্রবধূ অন্তঃসত্ত্বা। তাই দুশ্চিন্তা বাড়ল। সেই দুশ্চিন্তা এখন চরম রূপ নিয়েছে। দিল্লী

ত্যাগ করার দিন থেকে পুত্রবধূ অসুস্থ। এখন প্রসবের দিন একেবারে এগিয়ে এসেছে। অথচ শকটের ঝাঁকুনি এতটুকুও সহ্য হচ্ছে না। কাতরতার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে ব্যথা। গর্ভের শিশু মাঝে মাঝে নড়ে উঠে তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। অভিজ্ঞ ধাইমার খোঁজে প্রতিটি শকটের কছে গিয়েছে মালিক আবদার রহিম। মেলেনি। শেষে একজন বওয়াব দ্বাররক্ষীর স্ত্রীকে মিলল। সে ধাই না হলেও তার দুইবারের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মালিক আবদার কিছুটা স্বস্তি পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবে সবাই যখন দিল্লী ছেড়েছে তখন যাদের প্রসব করানো হয়েছে তারা নিশ্চয় কোন না কোন শকটে রয়েছে। তাই নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করে— কাদের প্রসব করিয়েছ?

— কাদের আবার? আমার দুই সতীনকে।

শুনে থ হয়ে যায় মালিক আবদার। ভাবে, সতীনকে কেউ সাহায্য করে নাকি? বরং তাদের মৃত্যুই তো কামনা করে।

—তারা কোথায়?

এবারে তাদের স্বামী বলে— পেছনে রয়েছে। তবে দৌলতাবাদে গিয়েই দুটোকে তালাক দেব।

— কেন? তারা কি অপরাধ করল?

— এ এত উপকার করল আর ওরা কিনা একে সন্দেহ করল? বলল, ওদের খুন করার চেষ্টা করেছিল। আমার এই আওরত দেখতে শুধু খুবসুরত নয়। মনটাও ভারি পরিষ্কার। তাই ওদের রাখব না। আমার কাছে ন্যায্য বিচার।

— ভালই করেছ। আমি আমার গাড়িটা সামনে থামাচ্ছি, তুমি তোমার জেনানাকে নিয়ে সেখানে এসো। রোগিনীকে একবার দেখবে।

দ্বাররক্ষীর স্ত্রী মালিক আবদারের পুত্রবধূকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। তার চেয়ে বয়সে পাঁচছয় বছরের ছোট। এখনো পরিপূর্ণ যুবতী বলা যায় না। কিশোরীর মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । মুখখানা কচি। ওষ্ঠদ্বয় তার শুকিয়ে সাদা কাগজের মত দেখাচ্ছে। খুব কষ্ট হয় দ্বাররক্ষীর স্ত্রী। তার কান্না পায়। কিন্তু কাঁদলে চলবে না।

মালিক আবদারের পুত্রবধূ ধাইকে বলে— আমি আর বাঁচব না। সহ্য হচ্ছে না। ওর সঙ্গে দেখা হ'ল না।

— আমি যদি পারতাম, এখনই তোমাকে প্রসব করাতাম।

— আমার বিষ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু মরতে চাই না আমি, ও আসবে দৌলতাবাদে। ওর সঙ্গে দেখা হবে না।

— নিশ্চয় দেখবে। ঠিক দেখবে। ছেলে হলেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

— বড্ড নড়ছে।

— ওর অসুবিধা হচ্ছে। যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। প্রথম থেকে নিয়মিত

মালিশ করে দিলে এই অবস্থা হ'ত না। আমি আগে জানলে তোমার কাছে এসে থাকতাম।

-- ওঃ, আর পারছি না।

নিজের দুই সতীনের দুই শিশুকে প্রসব করানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে বওয়াবের খুবসুরত আওরত মালিক আবদার রহিমকে একটি স্বাস্থ্যবান পৌত্র জন্মানোয় প্রশংসনীয়ভাবে সাহায্য করলেও জন্মদাত্রীকে বাঁচাতে পারল না। শিশুটিকে জন্ম দিয়ে তার গর্ভধারিণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। নবজাতককে হাতে তুলে নিয়েই ধাত্রী ডুকরে কেঁদে উঠল। আর তার কান্না শুনে মালিকের পরিবারের অন্যান্য রমণীরাও কেঁদে ওঠে। ওদিকে দূরে বহুদূরে উড়িষ্যায় জাজনগরে একজন সতেজ তরুণ সেই সময়ে কী স্বপ্ন দেখছিল কে জানে।

নবজাতক জানল না তার ভূমিষ্ঠ হওয়া তার গর্ভধারিণী দেখে যেতে পারল না। বলতে গেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই সে মাতৃহারা। কিন্তু শিশু তখন মাকে চায় না, চায় খাদ্য। যে মা গর্ভাবস্থায় নিজে খাদ্য গ্রহণ করে সেই খাদ্যের নির্যাস নাড়ির মাধ্যমে সন্তানের শরীরে সরবরাহ করে তার পুষ্টিতে সহায়তা করে আসে জন্মের পর সেই নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তখন নাড়ির টানটা জমে ওঠে মায়ের হৃদয়ে। তাই স্তনদ্বয় টইটুম্বুর হয়ে উঠে টনটন করে। কিন্তু মা মৃত। শিশু পারিত্রাহি চিৎকার করতে থাকে। খাদ্য, খাদ্য চাই তার। বয়স্ক যারা চোখের জল ফেলছিল তাদের কান্না থেমে যায়। বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তারা। শিশুর খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি শকটের কাছে ছোটাছুটি শুরু করে দেয় তারা। কেউ বলে মিছরির জল দিতে কেউ বলে পাশের গ্রাম থেকে ছাগলের দুধ সংগ্রহ করে জল মিশিয়ে খাওয়াতে।

সেই সময় পাগলা কলিমউদ্দিন এক যুবক আর এক যুবতীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাজির। সে যুবতীটিকে দেখিয়ে বলে-- একে দিয়ে দাও বাচ্চাটাকে।

কেউ তার কথার মূল্য দেয় না। কলিমউদ্দিন হেসে ওঠে-- কথাটা শুনতে ভাল লাগল না। এরা চলে যাবে? শিশু বাঁচবে না কিন্তু তাহলে।

যুবক দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে-- এঁরা বড়লোক, আমাদের কাছে দেবেন কেন?

কলিমউদ্দিন ভেংচি কেটে বলে-- তাই নাকি? বড়লোক মায়েদের দুধে পুষ্টি বেশি? ওদের ছেলেরা মহম্মদ বিন তুঘলক হয় আর তোমাদের ছেলেরা এই কলিমউদ্দিন হয়। আর হয় তোমার মত ভিস্তিওয়ালা। তাই না?

মালিক আবদার রহিম কিছুটা আঁচ করতে পেরে বলে-- ব্যাপারটা খুলে বলতো কলিম।

গুছিয়ে বলার মত সুস্থ অবস্থায় কলিমউদ্দিন নেই। তাই ভিস্তিওয়ালা নিজেই বলে--আমার আওরতের মেয়ে হয়েছিল। ক'দিন আগে নাড়ি পেকে মারা গিয়েছে।

হাকিমকে ডেকেছিলাম, তিনি এলেন না। তাই আমরা রসুন ভেজে সেই তেল লাগালাম। মেয়ে কেমন নীল হয়ে যেতে লাগল। শেষে আর বাঁচাতে পারলাম না। আমার স্ত্রীর বুকে অনেক দুধ।

মালিক আবদার রহিম আশার আলো দেখতে পেল। সে বলে-- তোমার গাড়ি, আমার গাড়ির পাশে নিয়ে এস।

কলিমউদ্দিন রুখে ওঠে-- না, ও যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আপনি ইচ্ছে হলে নাতিকে এর হাতে দিয়ে দিন। দৌলতাবাদে পৌঁছে যা ব্যবস্থা হয় করবেন।

আবদার রহিম কলিমউদ্দিনকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলে ভিস্তিওয়ালা বলে ওঠে-- ইনি আমার মেয়ের মৃত্যু দেখেছিলেন। তার মৃতদেহ ইনিই কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কবর দিতে। ইনি জানতেন আমার স্ত্রী দুধের ভারে কাতর। সে এখনো মেয়েব জন্যে কেঁদে চলেছে। তবু উনি বলায় আপনার এখানে এসেছে।

মালিক আবদার রহিম আর একটিও বাক্য ব্যয় না করে সদ্যজাত শিশুটিকে ভিস্তিওয়ালাব স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করে বলেন-- যতদিন পার একে মানুষ করে দাও আমি তোমাদের সাহায্য করে যাব।

কলিমউদ্দিন দিল্লীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে - কি দেখছিস শয়তান?

দৌলতাবাদের দিকে চলতে চলতে অমন অনেক শকট থেকে কখনো চাপা কান্না কখনো আর্তচিৎকাব শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যায় যাত্রীরা। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তো শোনা যায় না। সব দীর্ঘশ্বাসেব মিলিত শক্তি যদি এক করা যেত তাহলে মরু ঝড় উঠতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। নিপীড়িত অসহায় দুনিয়ার নবনারী চিরকালই নিষ্ফল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবহাওযা ভারাক্রান্ত করে তোলে। কোন কালেই প্রতিকার পায় না। ক্ষমতাবান আর হৃদয়হীনদের হৃদয়ের পরিবর্তন খুব কম ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায়। যদি সত্যই কখনো হয় তাহলে সেটা ইতিহাস হয়ে ওঠে। আর না হলে বুঝতে হবে সেটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার মধ্যে বোধহয় দুনিয়ার মালিকের গূঢ় বাসনার চবিতার্থতা।

অবসাদগ্রস্ত হতাশ যাত্রীবা প্রায় প্রতিদিন বেলা শেষে বিশ্রামের সময় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির পাশে সমবেত হয় আশ্বাসেব বাণী শোনার প্রত্যাশায়। কখনো তাঁব শকটের পাশে, কখনো বা কোন বৃক্ষের নীচে, আবাব কখনো সরাইখানার আঙিনায়। এই বৃদ্ধের নাম শেখ ফকরুদ্দিন জারাদি। ইনি শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার ভক্ত। যতদিন নিজামউদ্দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফকরুদ্দিন কখনো কল্পনা করেননি নিজামউদ্দিনের স্মৃতি বিজড়িত দিল্লী তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাই করতে হ'ল। সংসারে তাঁর কেউ নেই। একাই চলেছেন দৌলতাবাদের দিকে।

চলতে চলতে একদিন অবশেষে সবাই এসে পৌঁছোল দেবগিরির দ্বারপ্রান্তে। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তিনি অনেক সময় তাদের নাস্তিক বলেন। সেটা কতটা মনের কথা, কতটা কার্যোদ্ধারের জন্য কারও ধারণা নেই। কারণ হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ কখনো তাঁকে করতে দেখা যায়নি। এমন কি ঝাঁকে ঝাঁকে মুসলমানেরা যখন দিল্লী পরিত্যাগ করে যাচ্ছে, তখন হিন্দুদের দেখা যাচ্ছে নিশ্চিন্তে ঘটা করে পূজা অর্চনা করে কূপ খনন করতে পুষ্করিণী খনন করতে। তবু সাধারণের ধারণা তিনি দৌলতাবাদকে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল রূপে গড়ে তুলতে চান। কারণ তাহলে অনেক মুসলমান এখানে এসে বসতি স্থাপন করবে এবং তাঁব দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর রাখতে সুবিধা হবে। একেবারে মুসলমান না থাকলে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে ঘোঁট পাকাতে পারত। সেটি আর হবে না।

মহম্মদ বিন তুঘলকের স্বপ্ন কিছুটা সফল হ'ল, যখন দেখা গেল দিল্লীবাসীরা দৌলতাবাদে পৌঁছোনোর পরদিন থেকেই নগরীর পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অক্ষত প্রান্তরে কোদালের কোপ পড়তে শুরু হ'ল কবর খননের জন্য। তবু এইসব মৃত ব্যক্তিরা সিপাহশালারের মত অতটা ভাগ্যহীন নয়। সিপাহশালারের সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা বয়সের যারা দিল্লী দৌলতাবাদের পথের মাঝে মাঝে শায়িত রয়েছে বৎসরান্তে সবেবরাতের দিনে কেউ তাদের সমাধিস্থলে গিয়ে চিরাগ বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে না। দৌলতাবাদের পার্শ্বে আপনা হতে গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে যে সমাধিস্থল এখানে দূর থেকে অনেক পথিক বিশেষ দিনে রাতের অন্ধকারে মিটমিট করে জ্বলতে দেখব আলো—টুকরো টুকরো অনেক আলো।

কে যেন রটিয়ে দিয়েছে শেখ ফকরুদ্দিন জারাদি দৌলতাবাদে থাকবেন না। তিনি এখানে থাকার জন্য আসেননি। যেখানে তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন না, সেই স্থান তাঁর কাছে অসহ্য। সুলতানের হুকুম মেনেছেন তিনি। এবারে তিনি নিজের পথে যাবেন। দৌলতাবাদের কাজী কামালউদ্দিন ডেকে পাঠালেন শেখকে। কাজির নাম শুনে শেখের আধ-পাগলা কলিমউদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায়। এখানে এসে ওকে আব দেখতে পাননি তিনি। ইচ্ছা ছিল ওকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে নিরাময় করে তোলাব চেষ্টা করবেন। কিন্তু বোধহয় সেই সুযোগ আর হবে না। কে যে কাজীর কাছে গিয়ে লাগিয়েছে। কাউকে তিনি কিছু বলেন না। তবে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এক আধবার।

কাজী বলেন— শেখ, আপনি নাকি মক্কায় যাওয়ার মতলব করছেন?

তিনি বলেন— মনের ইচ্ছা তাই। তবে বয়স হয়েছে। পারব কিনা জানি না।

— মক্কায় যাওয়ার জন্য আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়নি। আপনি এখানকার

লোকদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রকাশ করবেন। সুলতানের স্পষ্ট আদেশ তাই।

-- এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

— কেন?

--প্রাণবায়ুকে ফেলে এসেছি দিল্লীতে।

--কাফেরদের মত হেঁয়ালী ভরা কথা বলবেন না। যান। আপনার থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে যান আর নিজের কাজ শুরু করুন।

শেখ ফকরুদ্দিন ধীরে ধীরে কাজীর গৃহ ছেড়ে চলে যান। তিনি আর তাঁর আস্তানার দিকে যান না। সোজা নগরীর অস্থায়ী ফটক পেরিয়ে চলতে থাকেন পশ্চিমেব দিকে। তিনি ভালভাবে জানেন এইপথে চলতে চলতে একদিন মক্কায় যাওয়াব পথের হদিশ মিলে যাবে। আগামীকাল যখন তাঁর অনুপস্থিতির কথা কাজী জানতে পারবে তখন তিনি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। কাজী মাত্র একজন মানুষের জন্য একদল অশ্বারোহী পাঠাবে না। নতুন নগরীতে তেমন সম্বলও তার নেই।

দিল্লীর কোতোয়াল মালিক বারহানউদ্দিনের উপাধি ইল আলিম-উল-মুলক্। সুলতান মহম্মদ 'বন তুঘলক তাকে দরবারে ডেকে পাঠালেন একদিন সন্ধ্যায়। অবেলায় ডাক পেযে আলিম-উল-মুলক্-এর বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। এই প্রথম এমন সময়ে তাকে ডেকে পাঠান হ'ল।

সুলতান তাকে সংক্ষেপে মুলক্ বলে ডাকেন। তবে যদি কোন কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তাহলে "কোতোযাল" বলে ডাকেন।

দরবারে প্রবেশ করতেই সুলতান ডেকে ওঠেন-- কোতোয়াল মালিক বারহানউদ্দিন।

সর্বনাশ হয়েছে। একে কোতোয়াল. তার ওপর মালিক বারহানউদ্দিন। আজ আর রক্ষা নেই।

বারহানউদ্দিন ঝুঁকে পড়ে তার শির প্রায় মাটিতে ছুঁইয়ে কুর্নিশ করে বলে-- খোদাবন্দ।

-- আমি আগামীকাল দিল্লী থেকে রওনা হচ্ছি, তুমি জান?

— জান মেহেরবান।

— আমার মা আমার বেগম পুত্র এবং বাঁদীরা সবাই যাচ্ছে আমার সঙ্গে তুমি জান?

— জানি সুলতান।

— তুমি যাতে ভালভাবে কাজ কর তার জন্য তোমায় অনুরোধ রাখতে তোমার

পুত্র কুতলঘ খাঁকে এই বয়সেই দৌলতাবাদের নায়েব উজির করে পাঠাচ্ছি এ কথা তুমি জান?

-- জানি মেহেরবান। হাজার বার জানি। জীবনে কখনো ভুলব না।

--জীবনের মেয়াদ তোমার আর কতদিনের কোতোয়াল?

কোতোয়ালের কণ্ঠস্বর কাঁদো কাঁদো শোনায়-- হুজুর।

-- তোমাকে বলেছিলাম, আমি দিল্লী ছাড়ার আগে যেন একজন মানুষকেও শহরে দেখতে না পাওয়া যায়। একটি কুকুর বা একটি বেড়ালও যেন না দেখা যায়।

-- আমি ঘন ঘন লোক পাঠাচ্ছি। নিজেও অপরাহ্নে টহল দিয়ে দেখে এসেছি। কোথাও কাউকে দেখতে পাইনি।

--পাওনি?

কোতোয়াল ঘাড় নাড়ে।

-- এসো আমার সঙ্গে।

কোতোয়ালের প্রাণ ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা। সে বুঝল, তার হয়ে গেল। কোথাও নিশ্চয় অজ্ঞাতে কেউ বাদ পড়ে গিয়েছে। কিংবা কোন বেড়াল বস্তা থেকে বেরিয়ে পালিয়েছে। অথবা কোন খেঁকী কুত্তা চিৎকার করে ওঠায় ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে কেউ।

প্রাসাদ শীর্ষে উঠে সুলতান দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠেন-- ওটা কী?

কম্পিত কণ্ঠে কোতোয়াল বলে-- আগুন হুজুর।

-- আগুন মানে কি ?

-- আগুন মানে-

--হ্যাঁ, আগুন মানে কি?

— আগুন মানে হুজুর —

-- জান না? অপদার্থ। এই বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম শহরের কোতোয়াল হয়ে বসে আছ? সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক যেদিন তোমাকে দিল্লীর আলিম-উল-মুলক্ এর পদে বসিয়েছিলেন সেইদিনই আমার মনে সন্দেহ ছিল। যার গায়ে এত চর্বি লাগে, তার বুদ্ধিও ভোঁতা হয়ে যায়।

--আগুনের অর্থ হল যা নিজে জ্বলে আর জ্বালায়।

-- চুপ কর বেয়াদপ। তোমার পুত্রটির যদি ক্ষতি না চাও এক্ষুনি গিয়ে ওদের ধর।

--যাচ্ছি মেহেরবান।

প্রবীণ কোতোয়াল ছুটে চলে যেতে চায়।

--দাঁড়াও, আগুনের অর্থ শুনে যাও। একমাত্র দাবানল ছাড়া আগুন মানে হ'ল

মানুষ। যাও ওদের ধর গিয়ে। ওরা কারা এসে আমাকে বলে যাবে।

--যো হুকুম।

ধরা পড়ল একজন বিকলাঙ্গ এবং একজন অন্ধ ব্যক্তি। বিকলাঙ্গকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হ'ল যমুনার জলে। বাঁচার চেষ্টা করার সামান্য ক্ষমতাও ছিল না তার। এক টুকরো পাথরের মত ফেলার সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে ডুবে গেল। ডোবার আগে বোধহয় শেষ প্রশ্বাসটুকু নিতে পারেনি। কারণ বুদবুদও দেখা গেল না। আর অন্ধকে বেঁধে দেওয়া হ'ল দৌলতাবাদগামী এক অশ্বশকটের সঙ্গে। শকটের চালক পরে বলেছিল, অন্ধের বাঁ পায়ের সামান্য এক টুকরো অস্থি গিয়ে পৌঁছেছিল সুলতানের নতুন রাজধানীতে।

এদিকে সুলতান দিল্লী পরিত্যাগের বহু পূর্ব থেকে কোথা থেকে কারা যেন রাতের অন্ধকারে এসে অশ্লীল ভাষায় সুলতানকে গালাগালি দিয়ে দরবার কক্ষে পত্র ছুঁড়ে দিতে লাগল নিয়মিত ভাবে। শত চেষ্টা করেও সুলতান তাদের ধরতে পারলেন না। কোতোয়ালকে অনেক হুমকি দিলেন। আমীর ওমরাহ্ যারা তাঁর সঙ্গে দৌলতাবাদের দিকে রওনা হবে তারা নিজেরা রাতের অন্ধকারে দরবার কক্ষের চারদিকে পাহারা দিয়েও ওইসব কুৎসিত পত্র নিক্ষেপকারীদের হদিশ করতে পারল না। যারা নিক্ষেপ করে তারা নিশ্চয় শহরের বাইরে থাকে। কারণ দিল্লী এখন জনশূন্য।

সুলতানের মনে হয় তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে কেউ এই কাজ করতে পারে। তবে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করে কোন লাভ হবে না। নিজেই দিল্লি ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুলতান প্রাসাদের ওপর থেকে আর একবার শহরের দিকে দৃষ্টি ফেলেন। এতবড় জনপদ এখন খাঁ খাঁ করছে। মনুষ্য কিংবা মনুষ্যেতর কোন প্রাণীই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। কল্পনার মধ্যে অবগাহন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল এমন সময় কে যেন তাঁর পোশাক চেপে ধরে। চেয়ে দেখেন পুত্র ফিরোজ। সে তাঁর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।

-- কি দেখছ?

ফিরোজ বলে-- তুমি কি দেখছ?

সুলতানের মুখে হাসি ফোটে। পুত্রের থুতনি তুলে ধরে বলেন-- দিল্লী শহরকে।

--ও।

--জান, আমরা কাল চলে যাব।

-- জানি, মা বলেছে।

পুত্রের বয়স ছয় সাত হবে। দেখতে সুন্দর হয়েছে। ওকে দেখলে তাঁর নিজের পিতামহের কথা মনে হয়। কোথায় যেন মিল রয়েছে। ভ্রূ যুগলের ঠিক মাঝখানে লাল টকটকে সামান্য উঁচু একটা জায়গা। পিতামহের এমন ছিল। পিতামহের ডান গালের

নীচের দিকে একটা বড় তিলও ছিল। তার কোলে উঠে সেই তিলের ওপর হাত বোলাতো এখনো স্পষ্ট মনে আছে সুলতানের। সেই সময়ে তাঁর চোখে স্নেহ ফুটে উঠত। সুলতান ভাবেন, তাঁর দৃষ্টিও কি এখন অমন কোমল হয়ে উঠেছে? জানেন না তিনি।

-- আমরা সবাই নতুন জায়গায় যাব। তোমার আনন্দ হচ্ছে না!

-- না। একটুও না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

-- সে কি ! সেই শহর কত ভাল।

-- হোক ভাল। সেখানে ওই বড় গাছটা থাকবে না। ওই যে ঘাট বাঁধানো তলাও থাকবে না। কিছুই থাকবে না।

-- থাকবে থাকবে। সব থাকবে।

--এগুলো থাকবে না। আমার কষ্ট হবে।

--বুঝতে পারি। আমারও হয়। কিন্তু তুমি, তোমার পুত্রেরা যাতে দীর্ঘদিন মসনদে বসতে পার তার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। তুঘলক আমলকে দীর্ঘস্থায়ী কবায় পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছি আমি।

-- তুমি কি বলছ?

-- আমি নিজের সঙ্গে কথা বলছি।

-- তুমি পাগল?

সচকিত হয়ে মহম্মদ বিন তুঘলক প্রশ্ন করেন-- সবাই বলে বুঝি ? কাউকে বলতে শুনেছ?

-- কি বলতে?

সুলতান হঠাৎ সম্বিত ফিরে পান। বলেন-- না, কিছু না। চল নীচে যাই। নতুন জায়গায় গিয়ে তোমাকে অনেক কিছু শেখাব। তুমি কিতাব পড়বে। তুমি তলোয়ার ঘোরাবে। কত কি করবে।

-- ওখানে আমি কিছু করব না।

-- ঠিক আছে। এখন চল।

দু'দিন পরে পরিত্যক্ত দিল্লী ছেড়ে শেষ দল চলল দৌলতাবাদ অভিমুখে।

মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীতে প্রায় এক হাজার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী রেখেছিলেন তাঁর সঙ্গীত পিপাসা মেটাবার জন্য। অনেকে সামনে কিংবা নেপথ্যে তাঁর এই সঙ্গীত প্রীতির সমালোচনা করেছে। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যও তাঁকে খুব আকৃষ্ট করে। নর্তকীদের দেহভঙ্গিমা, তাদের নাচের ছন্দ তাঁকে মুগ্ধ করে। তাই তিনি শত সমালোচনা সত্ত্বেও বৃহৎ একদল গায়ক গায়িকা এবং নর্তকীকে পোষণ

করেন দিল্লীর প্রাসাদে। এই বিষয়ে তিনি এতবেশী স্পর্শকাতর যে অন্য কেউ তাঁর শিল্পীদের নৃত্য কিংবা সঙ্গীত তাঁর অজ্ঞাতে দেখলে কিংবা শুনলে তিনি সহ্য করতে পারেন না। দিল্লী থেকে সমস্ত শিল্পীদের তিনি নিয়ে এলেন দৌলতাবাদে। এখানেও দিনের পরিশ্রমের পরে তাদের ডেকে এনে তিনি নিজের শিল্পী মনের তৃষ্ণা মেটাতে শুরু করলেন।

একদিন তিনি সন্ধ্যায় ফিরছিলেন প্রাসাদে। সহসা শুনতে পেলেন প্রাসাদের একটি কক্ষ থেকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গায়িকার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই শিল্পীর সঙ্গীত-রস পান করছে অন্য কেউ তাঁর অজ্ঞাতে? তিনি সোজা গিয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করেন। গাযিকার সঙ্গীত সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ভীত দৃষ্টিতে সে সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সঙ্গীত শুনছিলেন ভগিনী খুদাবন্দজাদার স্বামী মালিক সাদি।

তিনি খুব স্বাভাবিক স্বরে বললেন-- এর সঙ্গীত একদিন শুনতে পেয়েছিলাম। কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর। তাই ডেকে এনে শুনছিলাম।

-- ওর কণ্ঠস্বর পৃথিবীর কেউ আর কখনো শুনতে পাবে না।

-- কেন?

--চিরতরে স্তব্ধ হযে যাবে।

--একি বলছেন সুলতান?

--ওকে জিজ্ঞাসা কর।

গায়িকা সুলতানের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মাথা কোটে। কিন্তু সুলতান নির্মম।

সুলতান মালিক সাদিকে বলেন-- এদের আমি রাখি বলে তুমিও একদিন এই কাজের বিরুদ্ধে বলেছিলে। এখন কেন? আমি চাই না আমার অনুপস্থিতিতে এদের কেউ অন্যের সামনে নাচুক বা গান গেয়ে আনন্দ দিক।

সেই গায়িকাকে আর কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সুলতানের দ্বিতীয় ভগিনীর একটু বেশি বয়সে বিবাহ স্থির হয় আমীর সৈফুদ্দিনের সঙ্গে। সেই উপলক্ষ্যে প্রাসাদে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সুলতানের সমস্ত গায়িকা ও নর্তকী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করল। শহরবাসীরা কোন বিবাহে এই ধরনের উৎসব হতে পারে ধারণা করতে পারেনি। সবাই খুব খুশি। প্রাসাদে গানের অনুষ্ঠান। শহরের অনেক স্থানে নৃত্যের আয়োজন। নয়ন তৃপ্ত হ'ল, কর্ণ তৃপ্ত হ'ল সবার।

অথচ এই আনন্দোৎসবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভগিনীর নতুন স্বামী আমীর সৈফুদ্দিনের ভেদ বমি শুরু হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাব হাত পা

শীতল আর অবশ হয়ে গেল। হাকিমেরা ছোটাছুটি শুরু করে। তারা কিছু বুঝতে পারে না। সুলতান সেখানে ছিলেন না। তাঁর কাছে খবর পাঠানো হ'ল। প্রথমেই এসে এত হাকিম দেখে বিরক্ত হ'ন তিনি।

-- কি দিয়েছ খেতে?

--মেহেরবান পেটে কিছু দাঁড়াচ্ছে না।

প্রচণ্ড জোরে ধমক দিলেন তিনি ওদের। তারপর তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষে নিয়ে একটি পাত্রে পানীয় নিয়ে আসেন। নিজের হাতে প্রথমে একটু একটু করে সৈফুদ্দিনের ওষ্ঠ ফাঁক করে ঢেলে দিতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। রোগীর অস্বস্তি অনেক কমে যায়। সুলতান আর এক পাত্র পানীয় নিজেই নিয়ে আসেন। হাকিমদের বলেন— আমি যেভাবে খাওয়ালাম, সেইভাবে খাওয়াবে। জোর করে দেবে না।

ভগিনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে ভেঙে পড়ে কান্নায়। সুলতান তার পিঠে হাত রেখে বলেন— ভয় নেই। বিপদ কেটে গিয়েছে। ক'দিন খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি দেখে যাব এসে।

হাকিমরা নিশ্চিত হয়। তারা জানে সুলতানের দেশ বিদেশের চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান। তিনি অনেক কিতাব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সেই অল্প বয়স থেকে।

পারস্যের অধিপতি সুলতান আবু সঈদের সঙ্গে সুলতান তুঘলকের সম্পর্ক কতকগুলো অজ্ঞাত কারণে দিনের পর দিন খারাপের দিকে চলছিল। সম্ভবত কোন পক্ষই সম্পর্কের তিক্ততা নিরসনের জন্য কোন চেষ্টা করেনি। যে সব পরিব্রাজক উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত করে তাদের মুখে ভাসা ভাসা খবর পেয়ে আর মন্তব্য শুনে দুই দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আরও বৃদ্ধি পায়। তবু দূত প্রেরণ করে সোজাসুজি আলোচনায় বসার প্রয়োজন অনুভব করল না কোন পক্ষই। অনেকটা মর্যাদার লড়াই। এই ধরনের মর্যাদার সচরাচর কোন ভিত্তি না থাকলেও উস্কানি দাতার অভাব কোন কালে কোন দেশে হয় না।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে পারস্যের খোরাসান অঞ্চল জয় করতে হবে। বিরাট সৈন্যদল নিয়ে অভিযান চালিয়ে ওই এলাকা পদদলিত করতে হবে। আবু সঈদের গর্ব ধূলায় লুটিয়ে দিতে হবে। হিন্দুস্থানের সমকক্ষ হওয়ার স্বপ্ন চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দিতে হবে। তার জন্য চাই বিরাট এক সৈন্যবাহিনী। কিন্তু এই বিরাট দেশ, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কখনো বিরাজ করে না, আর সেই অশান্তির মোকাবিলায় যেখানে দেশের নানান প্রান্তে বাহিনী মোতয়েন রয়েছে সেখানে সহসা বিশালাকায় বাহিনী গঠন করা সুসাধ্য কখনো নয়। তেলেঙ্গানা তো বারুদের স্তূপ। ওদিকে সোনারগাঁও, লক্ষ্মণাবতী কখন যে হিংস্র হয়ে উঠবে কেউ বলতে পারে না।

এদিকে দোয়াব তো রয়েছেই। সৈন্যবাহিনী সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সুতরাং এইসব জায়গা থেকে তুলে তাদেব খোরাসানে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। নতুন বাহিনী গড়তে হবে অস্থায়ীভাবে। খোরাসান অভিযান শেষে ফিরে এসে তাঁদের ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু ওই ক্ষণস্থায়ী নোকরি করতে সম্মত হবে না কেউ। তাই সাধারণ সিপাহী যে বেতন পায়,তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে হবে এদের।

সিপাহশালার থেকে শুরু করে আমীর ওমরাহ সবাইকে ডেকে একদিন আলোচনায় বসবার দিন স্থির করলেন সুলতান। আলোচনার একটাই অর্থ-- তিনি যা বলবেন সবাইকে আগ্রহের সঙ্গে প্রবলভাবে ঘাড় দুলিয়ে তাকে সমর্থন জানানো। হয়ত সুলতান নিজেও সেকথা জানেন। তবু তিনি মনে মনে চান কেউ পরামর্শ দিক, নতুন কিছু বলুক। দূর থেকে এইসব ওমরাহের দলকে যখন পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক অবস্থায় দেখেন-- হয়ত ওদের কেউ অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছে, কিংবা রাস্তা দিয়ে আলাপ করতে করতে চলছে-- তখন সবাইকে বুদ্ধিযুক্ত এবং চপপটে বলে মনে হয়। কিন্তু তারাই যখন এসে দলবেঁধে দরবার কক্ষে তাঁর সামনে এসে বসে তখন চোখের বুদ্ধিদীপ্ত ভাবটা উধাও হয়ে যায। নড়নে চড়নে আড়ষ্টতা। কথা বলতে জিভ শুকিয়ে যায়। তাদের মধ্যে যেন বোকামী প্রদর্শনের ঘটা পড়ে যায়। সুলতান তুঘলক বুঝতে পারেন না, কেন এমন হয়। তবে কি তাঁর ব্যক্তিত্বের ছটা ওদের অমন করে দেয়? তাঁকে কি অনেক কোমল হতে হবে? ওরা মূর্খের মত কথা বললেও আসকারা দিতে হবে নাকি! নিজের বেগমের একটা কথা মনে পড়ে যায় সুলতানের। তিনি বলেছিলেন-- "কারও সঙ্গে কথা বলার আগেই তুমি ধরে নাও অল্প কথায় লোকটা বুঝতে পারবে না। তাকে বোঝাতে তোমাকে অনেক কথা খবচ করতে হবে। ভেবেই তোমার মাথা গরম হয়ে যায়। আর গরম হলেই তোমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। তোমার ওই লাল মুখের তোয়াক্কা আমি প্রথম প্রথম অনেক করেছি। এখন করি না। কিন্তু লোকে ভয় পায়। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে শান্ত থেকো। তুমি সামান্য একটু অসন্তুষ্ট হলেই একটু বেশি লাল হয়ে ওঠো। তোমার ছেলের ঠিক অমন হয় না। তার যাবতীয় লাল দুই ভ্রূর মাঝখানে ছোট একটি চাঁদ হয়ে জমে রয়েছে।"

দরবার কক্ষে আলোচনার জন্য সবাই এসে জমায়েত হয়েছে। সুলতান এসে উপস্থিত হলে সবাই একসঙ্গে আসন ছেড়ে তাঁকে অভিবাদন জানায়। সুলতান হাতের ইশারায় তাদের বসতে বলেন। তারা বসলে সুলতান ধীবে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রায় সবার দিকেই দৃষ্টি ফেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন মুখগুলো ইতিমধ্যেই ভাবলেশহীন হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

— শুনুন আপনারা। ধরুন আমি এখানে নেই। আপনারা খোরাসান নিয়ে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন।

সুলতানের এই অদ্ভুত খেয়ালে সবাই বিস্ময় বিমূঢ় হয়। তারা একটাও কথা বলে না। স্তব্ধতা বিরাজ করে।

— কি হ'ল?

একজন আমীর বলে— আপনি খোরাসান অভিযান নিয়ে অনেকদিন থেকে ভেবেছেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক স্বচ্ছ হবে আলোচনা করলে।

— কত সৈন্য পাঠাব?

সবাই চুপ।

এক আধটা কথায় উত্তর দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বরাবরের মত সুলতান তাঁর নিজের মতামত জানিয়ে যাচ্ছেন এবং সেইগুলোই গৃহীত হচ্ছে। ঠিক হ'ল, অন্তত চার লক্ষের সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে। তার মধ্যে সত্তর হাজার অশ্বারোহী।

নায়েব উজির কুতলঘ খাঁ বলে— আপনি আগে বলেছিলেন এদের বেতন হবে দেড়গুণ। চাপ পড়বে।

—পড়ুক। সেটুকু মেনে নিতে হবে।

—এখন থেকে লক্ষ্মণাবতীর সোনার গাঁও, ওয়ারঙ্গল আর জাজনগরে বলে দেওয়া যায় রাজস্ব পাঠাতে যেন কোনমতে বিলম্ব না করে।

সুলতান মনে মনে কুতলঘ খাঁয়ের তারিফ করেন। দিল্লীর কোতোয়ালের পুত্রের বয়স বেশি না হলেও বুদ্ধি ধরে। তাঁর সামনে পিতার মত সে ঘাবড়ে যায় না। এর দিকে নজর রাখতে হবে।

কথা বলতে বলতে সুলতান এক সময় লক্ষ্য করেন একজন লোক একেবারে পেছনে বসেছে এবং সেই দিকে তিনি যতবার চাইছেন ততবার সে অপর একজনের আড়ালে নিজের মুখ লুকিয়ে ফেলছে। একবার নয়, বারবার। তাঁর কৌতূহল হয়। অন্যদিকে চেয়ে কথা বলার ভান করে চোখের দৃষ্টি রাখেন সেইদিকে। লোকটা ধরা পড়ে যায়। সুলতান তাকে চিনতে পেরে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও খুশি যে একেবারে হননি একথা বলা যায় না। লোকটি মালিক কাসেম। করিৎকর্মা ব্যক্তি হয়েও মোসাহেবীতে পোক্ত।

দরবার শেষ হতে কাসেম উঠে পালাতে পারলে বাঁচে। সুলতান ডাকেন— মালিক কাসেম।

উপস্থিত সবাই বুঝতে পারে না কাসেমকে এই দরবারে কোথায় পাবেন সুলতান। সে তো এখন জাজনগরে রয়েছে। তাকে সুলতান নিজে কতকগুলো কাজের ভার দিয়েছেন। কিন্তু সুলতানের দৃষ্টি অনুসরণ করে তারা দেখে কাসেমই বটে। সুলতান কি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? সবাই ব্যাপারটা বুঝতে দরবার ত্যাগ করতে

করতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কাসেম, আমার তো মনে পড়ে না, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে?

— না, মেহেরবান।

— তবে তুমি দৌলতাবাদে কেন? নিজের ইচ্ছায়?

— না হুজুর।

—হেঁয়ালী ছাড়। আমি তোমাকে জাজনগরে যে জন্য থাকতে বলেছিলাম, তাতে এক বছরের আগে তোমার এদিকে আসার সম্ভাবনা থাকে না। এখনো সাত মাসও হয়নি।

—হুজুর অন্য খবর আছে।

—কি খবর?

—এখানে বলা অসুবিধা।

সুলতান সবাইকে চলে যেতে ইঙ্গিত করেন। তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে একে দরবার কক্ষ ত্যাগ করে। সুলতান কাসেমকে অনেক কারণে পছন্দ করেন। তার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ হ'ল সে কখনো সুলতানকে কোন কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে না। অথচ অন্যান্য প্রায় সবাই সুলতানকে অনেক কিছু মনে করিয়ে দেওয়ায় চেষ্টা করে। তাতে সুলতান অত্যন্ত বিরক্তবোধ করেন। কারণ তিনি কোন কিছুই বিস্মৃত হন না। কাসেমের এটি খুব ভালভাবে জানা আছে।

—এবারে বল।

একটু নিম্নস্বরে কাসেম বলে— সেই মেয়েটি এসেছে।

বিস্মিত সুলতান বলে— কোন মেয়েটি?

—সেই পাহাড়ের কোল থেকে এক রাতের জন্য যে এসেছিল আপনার কাছে।

— কোন পাহাড়?

—সেই রাজমহেন্দ্রীর কাছে। চন্দনা যার নাম।

সুলতানের মনের মধ্যে, দেহের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চন্দনার মুখ মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনার কথাগুলো তাঁর কানে ঝংকৃত হতে থাকে। সে বলেছিল যে দিল্লীতে গিয়েও যদি তার কথা মনে পড়ে তাহলে সে নিশ্চয় তাঁর জন্য দিল্লী যাবে। কিন্তু এতদিনের মধ্যে একদিনও তাঁর মনে পড়েনি। তবু চন্দনা নিজে থেকে এসেছে তাঁর কাছে। এসেছে নিশ্চয় নিজ ব্যয়ে। কেন? মালিক কাসেমকে খুঁজে বের করেছে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য। কেন এত তাগিদ? সে কি সেই এক রাতেই তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল? নাকি অন্য কিছু?

—কোথায় রেখেছ তাকে?

—পাহাড়ে থাকতে ভালবাসে। শহরের ভেতরে আনতে সাহসীও হইনি আমি। তাই ছোট পাহাড়ের একটা পাথরের পরিত্যক্ত বাড়িতে আছে। কতদিনের পুরোনো সেই বাড়ি জানি না। একটি ঘর বাসযোগ্য।

—এভাবে কেউ থাকতে পারে? কোথায় শোবে? কিভাবে শোবে?

—অত কথা ভাবার সময় ছিল না সুলতান।

—আজ সন্ধ্যার পরে এসো। আমি ছদ্মবেশে যাব। ওখানে বাড়ির ব্যবস্থা কর। একজন স্ত্রীলোককে কি ওইভাবে রাখা যায়? আশেপাশে লোকজন আছে?

—দেখলাম না তো।

—কিছুই জান না, এদিকে বাড়িটা তো ঠিক খুঁজে বের করেছ। বরাত ভাল তোমার আজ।

—জানি মেহেরবান। আমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে যেভাবে ছুটে এসে বলল, আপনার কাছে নিয়ে আসতে আমি কিছু চিন্তা করার অবকাশ পাইনি। নইলে এত কাঁচা কাজ আমি করি না।

—কেউ দেখেছে?

—বোরখা পরিয়ে এনেছি। পাহাড়ের ওখানে কেউ দেখতে পায়নি।

—যাও, সন্ধ্যার সময় আসবে।

সুলতানকে একটু গোপনেই বেরোতে হ'ল। ছদ্মবেশ ভাল হয়েছে। দুই অশ্বে দুই অশ্বারোহী। নিঃশব্দে চলেছে পাহাড়ের দিকে। ছোট্ট পাহাড়। আশেপাশে অমন কত পাহাড় রয়েছে, যেগুলো টিলা পর্যায়ের।

—বাতি এনেছ?

—হ্যাঁ মেহেরবান।

—তুমি ওকে সঙ্গীহীন অবস্থায় রেখে এসেছ। খাবে কি?

—সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

—জল?

—ঝর্ণা রয়েছে।

—আশেপাশে ঝর্ণা রয়েছে এমন কথা তো শুনিনি। তুমি জানলে কি করে? আর ঝর্ণা থাকলে সেখানে যেমন মানুষ আসে, বণ্যপ্রাণীও আসে।

—নামেই ঝর্ণা। কোনরকমে তৃষ্ণা নিবারণ হতে পারে।

-তুমি অপদার্থ।

বড় বড় চতুষ্কোণ প্রস্তর নির্মিত বাড়ি। বৃহৎ বেল গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সুলতান আশ্চর্য হয়ে ভাবেন কাসেম স্থানটির সন্ধান পেল কি করে?

অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে চারদিকে। সব গাছে জোনাকীর দরবার। আকাশে চাঁদ উঠবে না আজ।

সুলতান কুটিরটির সামনে এসে অশ্ব থেকে অবতরণ করেন।

—তোমার গর্দান নেওয়া উচিত।

—হ্যাঁ খোদাবন্দ। কিন্তু উপায় ছিল না। নতুন শহরে সবাই সবার পরিচয় জানতে চায়। বোরখা পরিয়ে কোন রমণীকে লুকিয়ে রাখলেও আমি ধরা পড়ে যেতাম। তখন বোরখা পরিহিতার কী পরিচয় দেব? সবাই জানে আমার স্ত্রীর জাজনগরে মৃত্যু হয়েছে।

—স্ত্রী মারা গেলে সাদি করা যেতে পারে।

—তা অবশ্য পারে। মাথায় আসেনি। তখন যদি অন্যদের বেগম পরিচয় করতে চায়?

—বেশি কথা শিখেছ। ভেবো না মোসাহেবী করলে সাত খুন মাপ হয়।

সেই সময় দ্বার প্রান্তে একজন রমণী এসে দাঁড়ায়।

সুলতান বলেন— কাসেম শামা জ্বালাও।

হাওয়া ছিল না। সহজেই আলো জ্বলল। সুলতান অনেকদিন পরে চন্দনাকে দেখলেন এবং আবার মুগ্ধ হলেন। তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন চন্দনার দিকে। চিরাগের আলোয় এমনিতে রাঙা হয়ে উঠেছিল চন্দনার মুখ, তাই সুলতানের দৃষ্টিতে আরও রাঙিয়ে যাওয়া কপোল চোখে পড়ল না।

ছদ্মবেশী সুলতান ডাকেন— চন্দনা।

—সুলতান।

মালিক কাসেম তৎপরতার সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠে বলে— আমি খানাপিনার ব্যবস্থা করতে চললাম।

সে অদৃশ্য হতে সুলতান ছুটে গিয়ে চন্দনাকে বুকের মধ্যে বেঁধে ফেলে বলেন— তুমি বলেছিলে, আমি তোমাকে মনে করলে নিশ্চয় দিল্লী যাবে। কিন্তু এর মধ্যে একবারও তোমার কথা সেভাবে মনে পড়েনি। রাজ্যের নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনে করার অবকাশই হয়নি।

চন্দনা হেসে বলে— আমি জানতাম।

—কিন্তু মনের গভীরে তুমি ছিলে চন্দনা। তাই কাসেমের মুখে তোমার কথা শোনা মাত্র আফশোষে আমার মন ভরে ওঠে। তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি।

দীর্ঘসময় ধরে দু'জনা দু'জনকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তোলে। তবু তৃপ্ত হয় না কেউ-ই। দুজনার গায়ের ওপর অনেক জোনাকী নিঃশব্দে উড়ে এসে বসে। দু'চার পা হেঁটে তারা আবার উড়ে যায়। ওরা দু'জনা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

আকাশে অসংখ্য তারকা, নীচে অজস্র জোনাকী। তারই মধ্যে চন্দনা আর সুলতান।

—তুমি এভাবে এলে কেন চন্দনা। কাসেমকে একটু সময় দিলে আরও কত ভাল হত।

—সময় ছিল না সুলতান।

—আমি তোমার থাকার জন্য ভাল ব্যবস্থা করছি। তোমাকে আমি ছাড়ব না।

চন্দনা একটু চুপ করে থেকে বলে— তা হয় না সুলতান।

সুলতানের চোখে বিস্ময়— কেন?

—আমি থাকতে আসিনি।

—এত কষ্ট করে এতদূর ছুটে এলে চলে যাওয়ার জন্য?

—চলে যাব বলে শেষবারের মত দেখতে এলাম আপনাকে।

—কবে যাবে?

—পরশু।

—এত দূর থেকে এসে এত তাড়াতাড়ি ?

—হ্যাঁ সুলতান।

—তাহলে এলে কেন?

—বললাম তো আপনাকে দেখতে।

—কেন?

—বুঝতে পারছেন না?

—না

—আমরা যে শ্রেণীর নারী তাদের সহজে মরণ হয় না। কিন্তু আমার হয়েছে।

—এ কথার অর্থ?

—আপনাকে, একমাত্র আপনাকেই আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম।

—আমাকে? কিন্তু আমি খারাপ কাজ করি। সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তুমি নিজেই তো জান।

— আপনি ভাল কি মন্দ, তা তো জানি না। আমি আপনাকে ভালবাসি।

সুলতান গভীরভাবে ভাবতে বলেন।

চন্দনা বলে— আর একটা কথা বলব?

—বল চন্দনা।

—আপনারও আমার প্রতি বিশেষ এক দুর্বলতা রয়েছে।

—আজ প্রথম সেটা অনুভব করছি। তাহলে চলে যাচ্ছ কেন? পরিপূর্ণ বেগমের মর্যাদা নিয়ে থাক আমার কাছে।

—না।

—এলে কেন তবে? না এলেই ভাল ছিল। বেশ ভুলে ছিলাম।

—জানি। আমি অবশ্য ভুলিনি। তবে ভালই ছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলাম কোথায়?

—আসল কথা তুমি বলছ না কেন?

—হ্যাঁ, এবারে বলব। ভনিতার দরকার ছিল নিজেকে সামলানোর জন্য। এখন বলতে পারব।

—বল।

—আমরা হিন্দু। আমার গুরুদেব বলেছিল, আমি দেবকন্যা ছিলাম। অভিশাপে মর্ত্যে জন্মেছি। তিন জন্ম শেষ হয়ে এটাই শেষ জন্ম। এ জন্মে বাইজি হয়েছি আমার বাসনা কামনা নিঃশেষ করে দেবার জন্য। সামান্য বাসনা কামনা অবশিষ্ট থাকলে তো আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। কাসেমকে আমার খোঁজ গুরুদেবই দিয়েছিলেন। গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাকে পরীক্ষা করে দেখেন আর ভাবেন আমার পিছুটান কিসের? কেন আমি বাসনা কামনার ঊর্ধ্বে উঠে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারছি না। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন, আপনিই তার কারণ। আপনার প্রতি আমার মোহ এখনো কাটেনি। তাই যেভাবে হোক আপনার কাছে আসার আদেশ দিলেন। আমি খুব খুশি হলাম, ভাবলাম, এবারে এসে থেকে যাব আপনার কাছে।

সুলতানের মুখে হাসি ফোটে। তিনি বলেন— ভালই হ'ল। আমার জীবনের রসটুকু দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল।

—কিন্তু তা তো হবে না সুলতান। আপনাকে দেখে আপনার স্পর্শ পেয়ে আমি শিহরিত হয়েছি এবং শেষ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে মোহমুক্তি ঘটেছে আমার। গুরুদেব আগেই বলেছিলেন, একবার দর্শনেই মুক্তি। তাই হয়েছে সুলতান। আমাকে বিদায় দিন।

সুলতান চন্দনার মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলেন— এভাবে তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

— উপায় নেই সুলতান। গুরুদেবকে বলব তিনি যেন আপনাকে শান্তি দেন। তাঁকে আগেও বলেছি। তিনি বলেন, আপনাকে নাকি কোন এক পাপের ফল ভুগতে হবে। পাপ তো সবাই করে। তবু তাঁকে বলব আপনার ভোগান্তি যেন সহ্যাতিরিক্ত না হয়।

চন্দনার পাশে গা ঘেঁষে বসে তার কথা শুনতে শুনতে সুলতানও শান্ত হয়ে যান ধীরে ধীরে। চন্দনাকে আর উপভোগের সামগ্রী বলে মনে হয় না। শুধু মনে হয় অতি কাছের একজন কেউ।

অনেকক্ষণ পরে মালিক কাসেম প্রচুর খাদ্য ও পানীয় নিয়ে এল। সে দেখে সুলতান গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন আর চন্দনা তাঁকে শান্তস্বরে কি যেন সব বলছেন।

—সব এনেছি হুজুর। আপনারা খেয়ে নিন।

চন্দনা বলে— আমি একটু জল খাব শুধু।

—কেন? এত সব আনলাম। সারাদিনে কিছু খাওয়া হয়নি।

সুলতান বলেন— জোর করো না কাসেম। কাল প্রত্যুষে এঁকে নিয়ে রওনা হবে। রাজমহেন্দ্রী কিংবা বোধন শহর যেখানে উনি যেতে চাইবেন পৌঁছে দিও।

মালিক কাসেম অবাক হয়ে যায়। কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সুলতান কি চন্দনার ওপর বিরক্ত? পৌঁছে দিতে বলছেন কেন? এর মধ্যে কী এমন ঘটল? প্রথম দর্শনে তো উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেখে স্থানত্যাগ করেছিল সে।

সে সুলতানকে বলে— আপনিও কিছু খাবেন না?

— না।

— আমি তাহলে শহরে চলে যাই? ভোর বেলায় আসব। আপনারা বিশ্রাম করুন।

চন্দনা বলে— অত কষ্ট করতে যাবেন কেন? এত খাবার রয়েছে, খেয়ে নিন।

—— রাত কাটাতে হবে তো?

-- এখানে থাকবেন। এত বড় ঘরে দুজনে স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারব। সুলতান চলে যাচ্ছেন।

মালিক কাসেমের বুক কেঁপে ওঠে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। হঠাৎ তার ওপর পরীক্ষা শুরু হ'ল নাকি? সে সুলতানের মুখের দিকে চায়।

সুলতান বলেন — তাই ভাল। তোমার অশ্বটিকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

মালিক কাসেম স্তব্ধ হয়ে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

খোরাসান অভিযানের জন্য বিপুল সৈন্য সংগ্রহ হলেও অভিযান আর শুরু হ'ল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ওই সৈন্যদল বসে বসে খেতে লাগল। কোন কাজ নেই। অর্থ ভান্ডার নিঃশেষিত হতে থাকে। এদের অন্য কোন কাজেও ব্যবহার করা যায় না। সাধারণ লোকেরা প্রথম প্রথম মুখ ফুটে কিছু বলেনি। তারপর এটা ওটা মন্তব্য করতে শুরু করে। বলে পারস্যের সুলতান আবু সঈদকে তিনি আক্রমন করতে ভয় পাচ্ছেন। তারমাশিরিন এলেও ভয় পেয়েছিলেন। সেবারে বলেছিলেন, প্রস্তুত ছিলেন না বলে অমন অপমানজনক শর্তে সম্মত হয়ে তারমাশিরিনকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে? নিজের দেশে ওয়ারঙ্গলের পতন ঘটিয়ে সেখানকার রাজাকে বন্দী করে দিল্লী পাঠিয়ে কেরামতি দেখিয়ে লাভ কি? তাও সেই সমস্ত ঘটেছে তার পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমলে। তিনি নিজে কি করলেন?

শুধু শুধু আবালবৃদ্ধবণিতা অগণিত মানুষকে দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ টেনে এনে বাহাদুরী দেখিয়েছেন। কত প্রাণ যে চলে গেল তার জন্য!

সুলতান বধির নন। সব কথা তাঁর কানে আসে। অথচ সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে পারেন না। কারণ বাহিনীতে অনেক বিদেশী হোমরা-চোমরাকে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। তাঁর খোরাসান অভিযানের জন্য এককালের শত্রু তারমাশরিনের জামাতা আমীর নউরোজ তাঁর নিজস্ব সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিয়েছেন। অন্য সব বিশিষ্ট মঙ্গোলীয় আর আফগানদের মধ্যে রয়েছে ইসমাইল আফগান, গুল আফগান, শাহ্ আফগান এবং আরও অনেকে। তারা সবাই আবু সঈদের ওপর বিরক্ত বলে তাদের তাতিয়ে নিজের দলে টানতে পেরেছেন সুলতান। এখন সৈন্যদল ভেঙে দিলে তাদের কাছে মুখ থাকবে না। তারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। এখানে নিশ্চিন্তে বসে বসে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে তারা মেনে নেবে না।

অথচ ইতিমধ্যে পারস্যের সুলতান আবু সঈদ তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করেছেন সদিচ্ছার অভিপ্রায় জানিয়ে। তিনি আগ্রহভরে অতীতের সমস্ত বিদ্বেষ এবং ভুল বোঝাবুঝির পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছেন। লিখেছেন যে জীবনের প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে এসেছে। বাকী রয়েছে সামান্যই। এই কয়টা দিন একটু শান্তিতে আল্লার চিন্তা করে দিন কাটাতে চান। তিনি লিখেছেন , অনেক মসজিদ ভেঙে পড়ে রয়েছে, অনেক মসজিদে আজান ধ্বনি শোনা যায় না। এই ক'টা দিন সেদিকে একটু নজর দিতে চান।

সুলতান সঈদের পত্র পেয়ে মহম্মদ বিন তুঘলকের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের কোন এক সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত লাগল। তিনি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি বৈঘসানকে পাঠালেন পারস্যের সুলতানের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত দূত রূপে। সঙ্গে দিয়ে দিলেন দশ লক্ষ টাকা। লিখলেন, ওই অর্থ যেন তাঁর দেশের পবিত্র উপাসনাগুলোর উন্নতি কল্পে ব্যয় করা হয়।

এরপর আর খোরাসান বিজয়ের জন্য সৈন্যদল পুষে রাখার কোন যুক্তি থাকে না। চার লক্ষের মধ্যে তিনলক্ষ সৈন্যকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে। বাকী এক লক্ষ রেখে দেওয়া হ'ল।

সুলতানের বিশেষ দূত বৈঘসান পারস্যে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে সুলতান আবু সঈদের মৃত্যু হল। সুতরাং খোরাসানের অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। যে ব্যক্তি এতদিন তাঁর ঘোরতম শত্রু ছিলেন, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য এত বিপুল অর্থ ব্যয়ে এতবড় বাহিনী গড়ে তুললেন, তাঁর মৃত্যু সংবাদে আঘাত পেলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ভাবলেন, পৃথিবীর সব কিছুই বিচিত্র। আজ যাঁর মৃত্যুকামনা করছিলেন, কাল

তাঁর মৃত্যু সংবাদে বেদনাহত।

পুত্র ফিরোজ বেশ বড় হয়ে উঠেছে। এখানো কিশোর বলা না গেলেও, কিশোরের মত বড়সড় দেখতে হয়েছে। প্রশাসনের বিষয়ে ছোটখাটো প্রশ্ন করতে শুরু করেছে পিতাকে। প্রশ্নগুলো নিরেট মোটেও নয়। জবাব দিতে গিয়ে ভাবতে হয় সুলতানকে এবং জবাব দিতে ভাল লাগে। পুত্রের প্রতি অদ্ভুত মমতায় হৃদয় ভরে ওঠে। তাঁর নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পিতার কথা মনে পড়ে যায়। তখন এক তীব্র বেদনা তার বক্ষকে বিদীর্ণ করে। কতবার যে এমন হয় তার ঠিক নেই। তাঁর শৈশব পিতৃস্নেহের মোড়কে আবৃত। নিজের পুত্র ফিরোজকে সেভাবে তিনি সঙ্গদান করতে পারেন না। পিতা স্বহস্তে তাঁকে সব কিছু শিখিয়ে ছিলেন। পিতৃঋণ চমৎকার ভাবে শোধ করেছেন। শয়তান ভর করেছিল তাঁর মাথায়। মনে হতো নিজের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ বুঝি তিনি জীবনে আর পাবেন না। পিতা জীবিত থেকে অহেতুক এক অনভিপ্রেত বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। পুত্র ফিরোজও কি কিছুদিন পর থেকে সেইরকম ভাবতে শুরু করবে? পুত্রের সরল মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তাঁর মুখও ফিরোজের মতই সরল দেখাত নিশ্চয় শৈশবে।

সেই ফিরোজ একদিন এসে আবার তাঁকে প্রশ্ন করে-- সবাই বলে আপনি এক লক্ষ সৈন্য এখনও রেখে দিয়েছেন, তার পেছনে কারণ আছে। কি কারণ?

এমন সোজাসুজি প্রশ্নের সম্মুখীন জীবনে কখনো হতে হয়নি সুলতানের। সেই স্পর্ধা কারও হয়নি। আজ পুত্রের এই প্রশ্নকে ধৃষ্টতা বলে আদৌ মনে হচ্ছে না; বরং তিনিই যেন কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন।

--কাজেও তো লাগতে পারে। সৈনাদল গড়ে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার। তাই সহজে তাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়না। কাজে লাগতে পারে তো। তোমাকে একথা কে বলেছে?

-- কেউ বলেনি। তবে শুনেছি।

-- তারা কি বলে?

-- কিছুই বলে না। তারা ভাবে এটা বোঝা।

সুলতান গম্ভীর হন। বলেন-- না, বোঝা নয়। কিছুদিন পরে সবাই বুঝবে।

আসলে তখন সুলতানের মনে চীন-তিব্বতের নিকটবর্তী করাচিল অধিকারের পরিকল্পনা। চীন সম্রাট অনেকদিন পূর্বে হিমালয়ের করাচিল সংলগ্ন মনোরম স্থানে একটি মন্দির নির্মানের অনুমতি চেয়েছিলেন এবং সেই অনুমতি সুলতান দিয়েছিলেন কিছু না ভেবে। তিনি যখন শুনলেন, সেই দেবালয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তখন

থেকে তাঁর মনের মধ্যে খুঁতখুত করছিল। ধর্মবিষয়ে তাঁর তেমন উগ্র মনোভাব না থাকলেও মনে হতে লাগল চীন সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে দৃঢ়ভাবে পা রাখলেন। এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া সব দিকের সীমান্ত মোটামুটি সুরক্ষিত, কিন্তু ওদিকটায় তাঁর বজ্রমুষ্টি কিছুটা আলগা রয়েছে এখনও। চীন-তিব্বতের দিক থেকে শত্রুরা এলে তাদের বাধা দেওয়ার মত উপযুক্ত সৈন্যনিবাসও নেই উপযুক্ত কোন স্থানে। তাই ওদিকটা আয়ত্তে রাখতে নগরকোটের পুরোনো কেল্লা নিজের দখলে আনা খুবই জরুরী।

একদিন দরবারে সুলতান ঘোষণা করলেন তিনি কাংড়ার নগরকোট কেল্লা দখলে যাবেন এবং সেখান থেকে করাচিল অভিযান শুরু হবে। সুলতানের এই আচমকা ঘোষণা অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। কারণ আগে থেকে কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি এই অভিযানের কথা। সুলতান বললেন যে খোরাসানের বাকী এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তিনি আক্রমণে যাবেন। সৈন্যদলকে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য যে সমালোচনার গুঞ্জন উঠেছিল, মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে গেল।

নগরকোট কেল্লা মাত্র একবার অন্যের দখলে এসেছিল প্রায় তিনশো বছর আগে। গজনীর মহম্মদ এটি সেই সময় দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপুতরা এটি আবার পুনর্দখল করে নেয়।

সুলতান তুঘলক লক্ষ্য করছিলেন তাঁর পুত্র ফিরোজ সময়ে অসময়ে প্রায়ই তাঁর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। তিনি তাকে ডেকে প্রশ্ন করেন— কিছু বলবে ফিরোজ?

--হ্যাঁ, আমি সঙ্গে যাব।

-- আর একটু বড় হও। আমি নিজে নিয়ে যাবো।

-- আর কতদিন?

-- তিন চার বছর। তখনো তুমি খুব একটা বড় হবে না যদিও তবু নিয়ে যাব। খুসরব তোমার চেয়ে অনেক বড় বলে এবারে ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

খুসরব মালিক হচ্ছে সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত। ফিরোজ তার সঙ্গে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে আর কিছু বলতে পারে না। কারণ পিতার নির্দেশে খুসরব তাকে কিছু কিছু অস্ত্রবিদ্যা আন্তরিকতার সঙ্গে শিখিয়েছে। তাকে ফিরোজ পছন্দ করে। পছন্দ করে তার মিষ্ট অথচ বলিষ্ঠ স্বভাবের জন্য।

ইতিমধ্যে সুলতান জাজনগরে মালিক কাসেমের কাছে বার্তা পাঠালেন রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য। কোথাও কোন অভিযানে কাসেমের কথা তাঁর স্বতঃ মনে পড়ে। কারণ বরাবর সে তাঁর সঙ্গে থেকেছে। অনেক পরিশ্রম, অনেক চিন্তা, অনেক কঠোরতার মধ্যেও সে একটা সরসতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রাখতে পারে। একঘেঁয়েমীর মধ্যে তার এই বিশেষ গুণ যথেষ্ট বৈচিত্র্য এনে দেয়।

আমীররা ঘন ঘন সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করে। একটা যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি বিরাটাকার। আর এই অভিযান নিকটবর্তী কোথাও নয়। পর্বতময় হিমালয়ের দেশে, যার ওপারে তিব্বত আর চীন রয়েছে। এই মঙ্গোলীয়রা এমনিতে চুপচাপ থাকে। কিন্তু সামান্য সুযোগ পেলে হিন্দুস্থানের দিকে থাবা বাড়ায়। কারণ তারা জানে হিন্দুস্থান হচ্ছে ফলবৃক্ষসমৃদ্ধ বিরাট উদ্যান। সেখানে একবার পৌঁছাতে পারলে নিস্ফলা ফিরে যেতে হয় না। কিছু না কিছু মিলবে। তাদের ওদিকে বৎসরের অনেক সময় তুষারাবৃত থাকে, বৃক্ষাদিও নেই সর্বত্র। হিন্দুস্থানেও দুর্ভিক্ষ রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচুর্যও রয়েছে। কিন্তু ওদের প্রাচুর্য বলে কিছু নেই। অই অশ্বপৃষ্ঠে চেপে মরিয়া হয়ে মাঝে মাঝে সম্পদ ও খাদ্য আহরণের জন্য দেশ বিদেশ ঢুঁড়ে বেড়ায় অসি আর বর্শা হাতে।

যাত্রা শুরুর তিন দিন আগে কাসেম এসে উপস্থিত হয়। সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা অভিবাদন জানায়।

—এসে গিয়েছ?

—হ্যাঁ, খোদাবন্দ্।

-- প্রস্তুত ?

—অবশ্যই।

-- চন্দনার খবর কি ?

— তিনি তো গেরুয়া পরে গুরুদেবের সঙ্গে হিমালয়ের দিকে চলে গিয়েছেন।

—আমরাও ওদিকেই যাচ্ছি।

-- তাঁরা কোথায় আছেন জানি না । তবে লোকালয়ে নয় নিশ্চয়। নির্জনে। তবু ভাগ্যে থাকলে দেখা হয়ে যেতে পারে।

— আচ্ছা, তুমি মাঝে মাঝে যে সব কথা বল , সেগুলো না বুঝে বল? না ইচ্ছা করে বল?

-- কেন হুজুর?

—এই যে বললে, দেখা হয়ে যেতে পারে— সত্যই কি তোমার বিশ্বাস তাই?

-- আমার মনের একান্ত কামনাকে অনেক সময় ওভাবে বলে ফেলি। ওঁর সঙ্গে যদি আপনার দেখা হত তাহলে দেখতাম গেরুয়ার কতখানি জোর।

—— গেরুয়ার কতটা জোর আমি জানিনা। তবে ওর মনের জোর যথেষ্ট। তোমাকে একই ঘরে ঘুমোতে দিয়েছিল।

--হ্যাঁ, তবে আমার এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি।

— জানতাম শয়তান, ঘুম তোমার একফোঁটাও হবে না। কিন্তু চন্দনা?

-- তিনি অকাতরে ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর মুখে অনেক মশা বসে রক্ত খাচ্ছিল। আমি বসে বসে তাড়াচ্ছিলাম। আমি শয়তান নই সুলতান। আমার মায়া হচ্ছিল। শুধু আপনার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসে বলতে গেলে অভুক্তই ছিলেন সেদিন। পরের দিনেও অতি সামান্য আহার করেছিলেন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যান। তারপরে বলেন--তুমি সাদি করেছো তো?

-- না খোদাবন্দ।

--এখনও করনি? এতদিন ওখানে কি করছিলে তবে? ওদেশে মেয়ে পাওয়া যায় না?

-- যায়, অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু রক্তমাংসের একটা পুতুলকে সাদি করতে ইচ্ছা হয় না।

-- তবে কি রকমের ইচ্ছা হয়?

-- অনেক মেয়ের সঙ্গে তো মিশলাম হুজুর, ঘনিষ্টভাবেই মিশলাম। কিন্তু তেমন তো দেখিনা।

--কি রকম?

--ওদের সঙ্গে মিশলে, ঘাঁটাঘাঁটি করলে ওরা ফুরিয়ে যায়। ওদের নিয়ে কি করব?

কাসেমের কথা শুনে এতবড় দেশের দোর্দন্ড প্রতাপ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের মুখেও কথা সরে না।

কোনরকমে বলেন-- কি রকম চাও তাহলে?

-- যে ফুরিয়ে যাবে না।

-- যেমন?

অনেক ভেবে চিন্তে অস্ফুট স্বরে বলে ফেলে মালেক কাসেম-- যেমন চন্দনা।

সুলতান সজোরে হেসে ওঠেন। এমন হাসি তাঁর মুখে শোনাই যায় না। দ্বাররক্ষীরা প্রবেশপথের ওখান থেকে উঁকি দেয় সেই হাসি শুনে।

সুলতান বলেন-- তুমি পাগল। পৃথিবীতে দশলক্ষ নারীর মধ্যে একজন চন্দনা থাকে। তোমার কোনদিনই তেমন কেউ হবে না। আমাদের মত বেগম আন হারেমে। একজন না হয় দশজন আন। ক্ষতি কি? এমনিতেও কেউ মনের হদিশ রাখেনা ওমনিতেও রাখবে না।

--ভেবে দেখি খোদাবন্দ।

--আর ভেবে লাভ নেই। চট্‌পট্‌ ঠিক করে ফেল। তোমাকে সেইজন্যই সঙ্গে নিচ্ছি। তুমি নিশ্চয় জান করাচিলের নারীরা অত্যন্ত রূপসী হয়। তুমি ওখানে গিয়ে আমার

জন্য কয়েকজন নির্বাচন করবে। সেইসঙ্গে তোমার জন্যও বেছে নিও। এখানে এনে হারেমে রাখবে।

—তাদের ভাষা জানিনা।

—— জানবে। ধীরে ধীরে তারাও তোমার ভাষা জানবে। তুমিও বুঝতে পারবে তাদের কথাবার্তা। একটুও অসুবিধা হবে না। নারীরা পুরুষকে তুষ্ট করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। ওরা এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

ভ্রাতুষ্পুত্র খুসরব মালিককে তার শৈশব থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের পছন্দ। তার চলনের মধ্যে যেমন ঋজুতা রয়েছে, তার মনকেও তেমন মনে হয়। তার চোখমুখ দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কোনরকম কুটিলতা তাকে স্পর্শ করেনা। অথচ সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সবচেয়ে বড়গুণ সে বিশ্বস্ত। তার ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়।

যাত্রাপথে খুসরব মালিককে সব সময় কাছাকাছি রাখেন সুলতান। তার সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। দেখেন, যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে খুব পরিস্কার মাথা। সব কিছু সহজে বুঝে ফেলে। অনেক পরিকল্পনার কথা সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে। ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র ফিরোজের উপযুক্ত সিপাহ্‌শালার হবে। ফিরোজকে তৈরীও করে নিতে পারবে। তবে একটা বিষয়ে ওকে সংযত হতে হবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে ও অতি উৎসাহী। ওর মধ্যে যুদ্ধের নেশা রয়েছে বোঝা যায়। সেটা ভাল লক্ষণ নয়। কোথায় থামতে হয় জানা খুব জরুরী। কোথায় শুরু করতে হয় আর কোথায় শেষ করতে হয়, এই দুটি জিনিষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা একজন সেনানায়কের প্রধানতম গুণ। এই দুটি বিষয়ে যার ভাবসাম্য নেই শত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সেনানায়ক রূপে তাকে সফল বলা যায না। এবারের অভিযানে তাঁর সেনানায়ক হ'ল মালিক ইউসুফ বাঘরা এবং তাব সহকারী হচ্ছে মালিক নকবিয়া। এরা দু'জনাই খুব দক্ষ। খুসরব এদের সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

নগরকোটের দ্বারপ্রান্তে বলতে গেলে করাচিল। সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাওয়ার পথে নানা কাজে ব্যস্ত স্থানীয় অধিবাসীদের দিকে চোখ পড়ে। তারা কাজ করতে করতে এক আধবার মুখ তুলে বাহিনীর গমন পথের দিকে চেয়ে দেখেছে। তবে আদৌ ঘাবড়ে গিয়েছে বলে মনে হ'ল না। কারণ তারা জেনে গিয়েছিল সুলতান নগরকোট দূর্গ দখল করতে যাচ্ছেন। খবর অনেক আগে থেকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাজা কিংবা সুলতানদের গতিবিধির ওপর সাধারণ মানুষের ভরসা খুব কম থাকে, তাই একটু সন্ত্রস্ত থাকে তারা। কখন কি খেয়াল হয়, কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে স্ত্রী কন্যাদের তারা

আড়ালে রাখে। কিন্তু কতটুকুই বা আব্রু রয়েছে তাদের? তাই দেখতে পাওয়া যায় তাদের স্ত্রীলোকদের এবং সত্যই স্ত্রী-পুরুষ সবাই সুদর্শন এই অঞ্চলের। আর রমনীদের তো সুদর্শন বলে না কেউ, বলে রূপসী।

সুলতান মালিক কাসেমকে ডেকে বলেন,— কি রকম দেখছ কাসেম?

—আপনি ঠিকই বলেছেন। হারেমে রাখার উপযুক্ত।

নগরকোট কেল্লা অতিসহজে অধিকার করলেন সুলতান।

সেখানকার দুর্গাধ্যক্ষ একজন রাজপুত। সেই বহুকাল পূর্বে গজনীর সুলতান মহম্মদ এটি দখল করার পর আর এক মহম্মদ এটি দ্বিতীয়বার দখল করলেন।

রাজপুত দুর্গাধিপতি বলে— আপনি দেশের ভেতর থেকে এসেছেন সুলতান। এই কেল্লা বাইরের শত্রূদের রুখতে। কিছুদিনের জন্য তাদের রুখে দেওয়া যায়।সেই সময়ে দেশের ভেতরে খবর পাঠিয়ে প্রস্তুত হওয়া যায়। কিন্তু আপনি বাইরে থেকে আসেন নি। আপনাকে রুখব কিভাবে? রাজার কাছে খবরই বা পাঠাবো কখন?

মহম্মদ বিন তুঘলক বুঝলেন দুর্গ অধিকার করলেও এটি দখলে রাখা কঠিন হবে। আশে পাশে সবই রাজপুত রাজা। তার পরে আবার দখল করে নেবে। বিশেষ করে রাজা চাঁদের বংশধরেরা পাশে যখন রাজত্ব করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেল্লাটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ করাচিলের ওপর নজর রাখার জন্য এটিকে ব্যবহার করা যাবে।

নগরকোটায় সুলতান বেশ কিছুদিন থাকবেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র খুসরবকে করাচিলের সীমান্ত পর্যন্ত মাঝে মাঝে ঘাঁটি নির্মাণ করতে বললেন। খুসরব বেশ উৎসাহের সঙ্গে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই কাজে চলে যায়!

সুলতান সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক ইউসুফ বাঘরাকে ডেকে খুসরব সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাইলেন।

ইউসুফ বলে— খুব ভাল। বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। কৌশলী এবং সবচেয়ে বড় গুণ সাহসী।

সুলতান তখন মালিক নকবিয়াকে প্রশ্ন করেন — তোমার মত কি?

— সিপাহশালার যা বললেন সব সত্য। তুলনা হয়না। তবে মনে হয় একটু একরোখা। কিছু মনে করবেন না খোদাবন্দ, আমি ওঁকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পেয়েছি। এক এক সময় যুক্তির চেয়ে ওঁর ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। সেটি কি ভাল?

— না। কখনো ভাল না। এই দোষ কি করে যাবে বলে মনে কর?

—আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়লে মনে হয় এই দোষ আর থাকবে না। উনি এখনও ব্যর্থ হন নি। একবার ব্যর্থ হলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবেন।

মালিক ইউসুফ বাঘরার ঠিক পছন্দ হ'ল না তার সহকারীর মন্তব্য। সে বলে,

ওসব কিছু নয়। ভুল করতে করতে সবাই শেখে। শুধু দেখতে হবে সেই ভুল প্রাণ হানিকর না হয়। আমরা সবাই তো পেছনে আছি। ভুল করলে শুধরে দেওয়া যাবে। এই সুযোগ কতজন পায়? আপনার পুত্র সঙ্গে এলে খুব ভাল হ'ত।

-- তার বয়স হয়নি এখনো। তবে এরপর থেকে তাকেও পাঠাব।

মালিক খুসরব ঘাঁটি নির্মান করতে চলে গেল। ইউসুফ বাঘরারা করাচিল সম্বন্ধে আরও ওয়াকিবহাল হতে দু'একদিনের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

কেল্লা দখল হলেও সুলতান সেখানে থাকেন না। তিনি নিজের ছাউনিতেই থাকেন। কেল্লা সংলগ্ন ফাঁকা প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেছেন তিনি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদিন সেখানে আনমনে বসে ছিলেন তুঘলক। সম্মুখে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী। কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ ঠিক নেই তার। কোথাও ঢেউ খেলানো কোথাও মনে হয় গগনচুম্বী, দূরের কোন কোন চূড়া তুষারাবৃত। শেষ বেলার সূর্যের আভায় সেই চূড়াগুলো সোনালী অলঙ্কারের মত ঝকঝক করছে।

মালিক কাসেম ধীরে ধীরে নিকটে আসে। বুঝতে পারে সুলতানের কল্পনায় এখন রাজত্ব সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই। আত্মীয় পরিবার পরিজন কারও কথা তাঁর মাথায় নেই। জীবনে অনেক ফাঁকা মুহূর্ত মাঝে মাঝে আসে যখন কোন চিন্তাই মনের মধ্যে স্থান করে নিতে পারেনা। এখনই যদি তাঁকে প্রশ্ন করা যায়, কী ভাবছেন তিনি? বলতে পারবেন না।

কাসেম একটু কাশে। কাশির শব্দ সুলতানকে বাস্তবে টেনে আনে। তিনি বলেন— ও তুমি।

—হ্যাঁ মেহেরবান, আপনি অন্যমনস্ক ছিলেন। রাজধানী থেকে এত দূরে এমন নিঃসঙ্গ জীবন। এখন তো দুর্গ দখল হয়ে গিয়েছে। অবশ্য করাচিল রয়েছে।

— হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। ওটা খুব দরকার। নইলে এর পরে চীন সম্রাট আরও মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে। তারপর পূজারী আসবে; সঙ্গে পরিবার পরিজন। তারপর ওদেশ থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রী আসবে এই সব স্থান পরিদর্শন করতে। তারপর তাদের মধ্যে কিছু কিছু এখানে থেকে যাবে। তারা বসতি স্থাপন করবে। তারপর তাদের সংসার হবে। পুত্রকন্যা জন্মগ্রহন করবে। ফিরোজ সুলতান হওয়ার আগেই দেখা যাবে ওরা ওই অংশ পাকাপাকি ভাবে ভোগদখল করছে। ফিরোজের লোক গেলে অবাক হয়ে বলবে বংশ পরম্পরায় তারা ওখানে রয়েছে। ওটা তো তাদেরই দেশ। তাই করাচিল অভিযান। আমার অধীনে থাকলে চীন তার রাজ্যসীমা বাড়াতে পারবে না।

— আপনি যথার্থ বলেছেন সুলতান। আপনার দূরদৃষ্টির কথা সবাই বলাবলি করে। মিথ্যে বলব না, আপনার বদনাম অনেকেই দেয়। বিশেষ করে রাজধানী বদলের জন্য।

কিন্তু আপনার শৌর্য আর বুদ্ধি, আপনার জ্ঞানের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। তবে সুফী আর হিন্দদের প্রতি আপনি কিছুটা নরম একথা অনেকেই বলে।

—সেটা মস্ত অপরাধ বুঝি ?

-- না, তা নয়। আমি ওসব আলোচনা করতে আসিনি। আপনি একা একা দিন কাটাচ্ছেন, রাত কাটাচ্ছেন, তাই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। পেয়েছি।

--কী পেয়েছ?

--একজন সুন্দরী। এখানেও অমন পাওয়া যায় হুজুর।

-- কি রকম?

-- ওই যারা নাচে গায়, রাতে থাকে। সাময়িকভাবে ভুলিয়ে দেয়।

-- বাঃ সুন্দর কথা শিখেছ দেখছি। হিমালয়ের গুণ নাকি ?

-- হতে পারে। ভাবছি করাচিলে গেলে আরও কত কথা শিখব। নিয়ে আসব তাঁকে?

-- কাছে থাকে ?

-- খুব দূরে নয়।

--গান জানে বলছ?

-- হ্যাঁ, এদেশের গান! নাচও এখানকার। একজন নাচল। বেশ ভালই লাগল দেখে।

-- তুমি এত কথা জানলে কি করে?

-- কাল রাতে আমি যে ছিলাম ওদের একজনের কাছে।

-- না না, কাসেম। ওসব এনে দরকার নেই। আমার ওসব ভাল লাগে না। আমি সুন্দরী চাই হারেমের জন্য। যদি পার করাচিলে গিয়ে চেষ্টা করো।

হতাশ মালিক কাসেম বলে--আনব না তাহলে?

-- না। তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাও বরং। মনে রেখো দশ লাখেও একজন চন্দনা হয় না। হারেমে সুন্দরী রাখতে চাই কারণ মাঝে মাঝে আমিও পশু হয়ে যাই। এখন আমার মাথায় অনেক চিন্তা। তাই এই মুহূর্তে আমি পশু নই।

সুলতানের চিন্তা পরদিনই দ্বিগুণ হ'ল। রাজধানী থেকে দুই অশ্বারোহী পত্রবাহক খাজা জাঁহার পত্র নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তাতে জানা গেল করাচিল অভিযানের জন্য তিনি এখানে অনেক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত থাকার সুযোগ নিয়েছে বঙ্গভূমি। সেখানে ফকরুদ্দিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ওদিকে মেব্যারে আর মুলতানেও আবহাওয়া রীতিমত্ত উত্তপ্ত। তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সুলতান সবাইকে ডেকে পাঠালেন। ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক খুসরবকেও ডেকে আনা হ'ল। দু'দিন পরে সবাই তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেন-- করাচিল অভিযান বন্ধ হবে না। তবে আমি থাকতে পারব না। খুসরবের সঙ্গে বাঘরা আর নকবিয়া রইল। করাচিল

আমাদের চাই। দেশের নিরাপত্তার জন্য চাই। এখানকার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুসরব এখান থেকে দৌলতাবাদে না গিয়ে সোজা দিল্লীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি ওখানেই থাকব। কারণ দেশের ট্যাকশাল এখনো দিল্লীতে রয়েছে। প্রয়োজন হলে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। আমি আশা করি এখানকার সমস্যা মিটে গেলে প্রয়োজনীয় সৈন্য রেখে মালিক ইউসুফ আর নকবিয়াও এখান থেকে চলে যাবে দৌলতাবাদে। কারণ দক্ষিণ ভারত চিরকালের সমস্যা।

নগরকোটের আবহাওয়া অনেক শীতল। আলোচনার পর সুলতান অশ্ব নিয়ে একা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। কতদিন একা একা ঘোরেননি। অনেকে মানা করে একা যেতে। সুলতান বলেন-- ক্ষতি হলে তাঁর সৈন্যবাহিনীর কারও দ্বারা হতে পারে। স্থানীয় কারও দ্বারা নয়। এরা অন্য ধাতুতে গড়া।

এখানকার পার্বত্য পরিবেশ সুলতানকে মুগ্ধ করে। তাঁর মনে হয় পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকে যেন কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তিনি সেখানে গেলে সেটি প্রথম আবিস্কৃত হবে। তাঁরই দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে যেন তারা। কত বনফুল, কত নাম-না-জানা লতা, কত বৃক্ষ, সবই নতুন। দক্ষিণ ভারতেও অনেক পাহাড় রয়েছে। কিন্তু এ যেন স্বতন্ত্র। চলতে চলতে নিজের সাম্রাজ্যের কথা, করাচিলের কথা বিস্মৃত হন তিনি। তাঁর মনে হতে থাকে এই নির্জন পরিবেশে যদি পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে দেখতে পেতেন তাহলে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। মনে হয় সেই সব দিনগুলোই ভাল ছিল। পিতা পাশে ছিলেন, কতখানি নির্ভরতা ছিল। আজ বড় একা একা লাগে। পাশে কেউ নেই। পরিবর্তে সবাই তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

চলতে চলতে এক জায়গায় হঠাৎ অশ্বের রাশ টেনে ধরেন সুলতান। কিসের গন্ধ? খুব পরিচিত। খুবই আপন। এই গন্ধ তাঁর মনের গভীর থেকে কোন এক মধুর পুরোনো স্মৃতি উপহার দিতে চাইছে। এই গন্ধ কোথায় যেন পেয়েছিলেন? অশ্ব থেকে অবতরণ করেন তিনি। সাবধানে এগিয়ে যান একটি বড় পাথরের পাশে। সেখানে ফুটে রয়েছে এক গুচ্ছ ফুল। হ্যাঁ, এইবারে মনে পড়ে যায়। এই ফুল দিল্লীর পাশের ওই নদীর ধারের টিলার সামনে একদিন লায়লা তুলে এনে তাকে উপহার দিয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে যায় সব। সেদিন লায়লার পরনে কী ছিল, তার মাথার চুল কিভাবে উড়ে এসে সামনে গালের ওপর ভেঙে পড়ছিল, সব মনে পড়ে যায়। সে ফুলের গুচ্ছ তুলতে গিয়েও থেমে যায়। না থাক। তুললেই শুকিয়ে যাবে। তার চেয়ে আগামী কাল আর একবার এসে দেখে যাওয়া ভাল। লায়লার জন্য মনের ভেতরে হু হু করে ওঠে। ওকে ক্ষুদ্র বালিকা বলে মনে হয় না। কিংবা নিজেকে তাঁর প্রৌঢ়ত্বের পথে পা বাড়ানো কোন পুরুষ বলে মনে হয় না। নিজেও তিনি যেন বালক। নইলে ছোট্ট একটি মেয়েকে সমবয়সী বলে মনে হবে কেন?

পেছনে পিঠে মৃদু স্পর্শ। চমকে ওঠেন সুলতান। ঠিক এইভাবে লায়লা তাঁর পিঠে হাত দিয়ে ডাকত নদীর দিকে যাওয়ার জন্য। তিনি ঘাড় ফেরাতে চান না। জানেন, এই স্পর্শ লায়লার মেহেদী রাঙানো হাতের স্পর্শ নয়। তবু দেখতে চান না তিনি। ভাবতে তো পারছেন এটা তারই স্পর্শ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেছনে ফিরতেই হয়। একটা লতা গাছের নরম শাখা তাঁর পিঠ ছুঁয়ে রয়েছে। শাখাটিকে তিনি সযত্নে হাতে নিয়ে পরম আগ্রহে গালে স্পর্শ করেন। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দেন। সেটি ঝুলতে থাকে। তিনি তার মধ্যে অভিমানে ঠোঁট ফোলানো লায়লা দেখতে পান। তিনি আবার তাকে তুলে নিয়ে বলেন-- ভুলিনি লায়লা। ভুলব না।

নগরকোট থেকে পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে সৈন্য সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করার কয়েকদিনের মধ্যে মালিক জাদা আহমেদ বিন আইয়াজ খবর পাঠায় মুলতানে বহরম আইবা কিচলু খাঁ বিদ্রোহ করেছে। আইয়াজ আরও জানিয়েছে যে এই বিদ্রোহের পেছনে রয়েছে উলেমা আর সুফীদের ক্রমাগত উসকানি। তারা কিচলু খাঁকেঅনেকদিন থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে নানা জঘন্য কথা বলে তাতিয়ে চলেছে।

সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মালিকজাদা আইয়াজকে নির্দেশ পাঠালেন মুলতানের পথে সৈন্য পাঠাতে। তারা তাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেবে। তিনি দিল্লী থেকে সৈন্য নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে যাত্রা করছেন। কিচলু খাঁকে একেবারে খতম করে দিতে হবে। লোকটা নিজের মঙ্গল বুঝল না। ভবিষ্যৎ তার খুব ভাল হতে পারত। দেশের পশ্চিম সীমান্তে সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের শাসনকর্তা করা হয়েছিল তাকে। সইল না। ব্যক্তিত্বের অভাব আর সেইসঙ্গে কান পাতলা। চূড়ান্ত ফলভোগ তাকে করতে হবে। আর ফলভোগ করতে হবে ওই সব নোংরা উস্কানি দাতাদের। উলেমা আর সুফী সেজে ধর্মের পরিমন্ডল সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ভোলানো যায়, তাঁকে নয়। ওসবে তাঁর অত গোঁড়ামিও নেই। ধার্মিক হওয়ার অর্থ গোঁড়া হওয়া নয়। কিচলুর যে পরিণতি হবে সেই একই পরিণতি ওদের ভাগ্যেও রয়েছে। সুলতান বুঝতে পারেন নি তাঁর এই মনোভাবের জন্যই সুফী উলেমা আর সুন্নি সৈয়দরা বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে এসেছে। তারা শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে ধর্মান্ধ করে তুলতে পারেনি। সুফীরাও দলে টানতে পারেনি। তিনি একনিষ্ঠ মুসলমান, কিন্তু অন্ধ নন, তিনি সুফীদের প্রতি অনুরক্ত অথচ তাদের দলে নন। সৈয়দরা চিরকাল যে কারণে শ্রদ্ধা ও সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করে আসছে তিনি সেই সব প্রথার প্রতি আদৌ বিশ্বস্ত নন।

ওদিকে লক্ষ্মণাবতী আর সোনার গাঁ থেকে খবর আসে সেদিকের অবস্থা আপাতত আয়ত্তে। সুলতান সেই খবর পেয়ে মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। দৌলতাবাদ থেকে প্রেরিত বাহিনী যথাস্থানে তাঁর নিজস্ব বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

মুলতানে কিচলু খাঁ বেশ শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। তাকে দমন করতে সুলতানেরও কিছু শক্তিক্ষয় করতে হ'ল। তাঁর নিজস্ব পাঁচশজন সৈন্য নিহত হ'ল। আহতও হ'ল বেশ কিছু। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক বন্দীদের সামনে আস্ফালন করতে ঘৃণাবোধ করেন। কারণ তিনি জানেন, যারা দুর্বল, কোন কিছু করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, তাদের মুখের বড়াই বেশী হয়।

বন্দী অবস্থায় তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয় বহরম আইবা কিচলু খাঁকে। তিনি শুধু জানতে চাইলেন যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঠিক কাজ করেছে কিনা।

কিচলু খাঁ নীরব থাকে।

মহম্মদ বিন তুঘলক বলেন -- তুমি উঁচুদরের এমন কেউ নও, যাকে শাস্তি দিতে ভাবতে হয়। তাই তোমাকে মরতে হবে।

সুলতান হাতের ইশারায় তাকে তাঁর সামনে থেকে নিয়ে যেতে বলেন।

কিচলুখাঁ বলে ওঠে-- আমার ভুল হয়েছিল।

নির্দেশ দানের পরই সুলতান তার কথা মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছেন। তাই কিচলু খাঁয়ের শেষ কথা তাঁর কানে যায় না। ইতিমধ্যে তাঁর সামনে অপর এক বিদ্রোহীকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

কিচলু খাঁ এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের গর্দান সেইদিন অপরাহ্ণেই নেওয়া হ'ল। তারপর সন্ধ্যা নামতেই বাছাই এক দল সৈন্যকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল শহরে। তারা উলেমা সুফী সৈয়দদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে তাদের গৃহ থেকে টেনে বের করে নিয়ে কচুকাটা করতে লাগল। তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যার ক্রন্দন ওইসব নরপশুদের প্রাণে একটুকুও অনুকম্পার সৃষ্টি করতে পারল না। তারা সুলতানের পছন্দ করা সৈন্য। এই কাজের পরে তাদের ইনাম মিলবে প্রচুর।

শহরের চারদিকে বুকফাটা ক্রন্দন আবহাওয়া ভারী এবং অসহনীয় করে তুলল। তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে হতে ভোর রাতে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রভাতে দেখা গেল নগরীর পথে ঘাটে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কোথাও স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। দেখা গেল, সৈন্যরা তাদের পা ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে একত্রিত করছে কোথাও বড় গর্ত করে মাটি চাপা দেবে বলে। কারণ এদের আত্মীয়-স্বজন কিছু কিছু বেঁচে থাকলেও ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে সাহস করছে না। শিশুরা যারা মাতৃস্তন্য পান করে তারা হয়ত ততটা অভুক্ত নয়, কিন্তু তাদের চেয়ে আর একটু বড় যারা, তারা

এবং বাকী সবাই অনাহারে রইল সারাদিন। যে সমস্ত শিশু বা বালকেরা কিছু বোঝে না তারা তাদের সদ্য মৃত পিতা কিংবা পিতামহের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষিদেয় কান্না কাঁদতে শুরু করে। মুলতানকে সুলতান টুঁটি চেপে হত্যা করেছেন। সেই হত্যাকান্ড পরিদর্শনের জন্য সুলতান তুঘলক শহরের পথে বের হলেন। তিনি উপস্থিত হলেন সদ্য মাটি চাপা দেওয়া বৃহৎ গোরস্থানের দিকে। সেখানে অনেক হাত অনেক পা মাটি ভেদ করে নিশানের মত বেরিয়ে রয়েছে। হাত গুলো যেন বিধাতার কাছে আর্তি জানাচ্ছে। সুলতান আরও মাটি চাপা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। দু'দিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিয়ে তিনি দিল্লীর পথে অগ্রসর হলেন। বুঝলেন, আশু আর কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনা নেই।

মুলতান থেকে ফিরে সুলতান সুসংবাদ পেলেন। তাঁর নির্দেশ মত ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক খুসরব হিমালয়ের পাদদেশে জিদিয়া শহর অধিকার করেছে। শত্রুদের অনেক ধনসম্পত্তি তার হস্তগত হয়েছে। অনেক রত্নালংকারও রয়েছে তার মধ্যে। তারপর আরও উঁচুতে আর একটি শহর দখল করেছে।

সুলতান খবর পেয়ে মহাখুশী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একজন কাজী এবং একজন খাতিবকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন এই দু'জনকে যেন ওখানেই রেখে দেওয়া হয়।

ওদিকে সুলতানের অত্যাচারের বীভৎসতার কথা সারা দেশের মানুষ জানতে পারে। তারা শিউরে ওঠে। দিল্লীতে মুষ্টিমেয় যে ক'জন রয়েছে তারাও মুলতানের ঘটনার কথা শুনল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু উচ্চারণ করতে সাহসী হ'ল না। অন্যান্য স্থানের উলেমা, সুফী, সৈয়দরা দেখল সুলতানের কাছে তাদের কোন কদর নেই. অথচ বিদেশ থেকে আগত উলেমা সুফীরা উচ্চ সম্মান পেয়ে যাচ্ছে। তাদের সবাইকে যথাযোগ্য ভাতা দেওয়ারও ব্যবস্থা করলেন সুলতান। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইজউদ্দিন. রয়েছেন সিরাজের কাজী মজদউদ্দিন, প্রচারক বরহানউদ্দিন ওয়াইজ। রয়েছেন মালিক নাজিবউদ্দিন, সামসউদ্দিন, বদলখশানের মালিক সঞ্জর ইত্যাদি আরও অনেকে। এই দেশের সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের মন এই সব কাণ্ড দেখে বিষিয়ে উঠল।

আর ঠিক এই সময়ে এসে পৌঁছোল করাচিল অভিযানের ভয়ঙ্কর পরিণতির খবর। সুলতানের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল করাচিল বিজয়ের পর লোভের বশবর্তী হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেন আর এক পাও অগ্রসর না হয় মালিক খুসরব। কিন্তু অত সহজে যে করাচিল অধিকার করা যাবে খুসরব স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই বিজয়ের উন্মাদনায় ঠিক সময়ে থামতে ভুলে গেল। তার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ যারা ছিল তারা বারে বারে মনে করিয়ে দিল সুলতানের নির্দেশের কথা। কিন্তু সে তখন বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত। আরও

এগিয়ে যেতে হবে। আরও। সম্মুখে যে চীন মহাদেশ সুপ্ত সিংহের মত থাবা বিস্তার করে রয়েছে সেকথাও ভুলে গেল। সিপাহীদের নিয়ে সে পর্বত অতিক্রম করে চলে গেল তিব্বতের মানস সরোবরে। আর ঠিক তখনই দুর্ভাগ্যক্রমে শুরু হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত প্রবল বর্ষণ। সিপাহীদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেই সঙ্গে প্রবল বায়ুর তাড়না। ওরা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। তারা দলে দলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুরু হয়ে গেল মড়ক। প্রতিদিন তাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল। মালিক খুসরব বাহিনী নিয়ে তাড়াতাড়ি পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করল। কিন্তু পর্বতের অধিবাসীরা তখন প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তারা সুলতানের বাহিনীকে পেছনে হটে যেতে দিল না। প্রথমে তারা সুলতানের বিরাট বাহিনী দেখে সন্ত্রস্ত ছিল। তেমন বাধা দিতে সাহস পায়নি। কারণ তাদের অত হাতিয়ার নেই, অস্ত্র নেই, মানুষ নেই। কিন্তু এবারে তারা হাতিকে ফাঁদে পেয়েছে। ক্লান্ত রোগগ্রস্থ সৈন্যদল কোনরকমে পেছনে হটে গিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পর্বতের মানুষেরা অনেক সয়েছে। তারা আর ওদের বাঁচতে দেবেনা। তারা ওইসব দুর্বল অভুক্ত সেনাদের ওপর উঁচু পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলতে লাগল। নীচে যাদের ওপর পড়তে লাগল, তাদের চিৎকার করার ক্ষমতাও নিঃশেষিত হয়েছিল।

করাচিলের জন্য সংগৃহীত এই বিরাট বাহিনীর মাত্র তিনজন প্রাণী অবশেষে ফিরে এল সুলতানের কাছে। তাদের মধ্যে কোন সেনাধ্যক্ষ নেই, নেই তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রও।

এদিকে মুলতানের বিদ্রোহ, ওদিকে করাচিলের মর্মান্তিক ব্যর্থতা, দেশের নানা স্থানে অজন্মা, অভুক্ত অসংখ্য নরনারী মৃত্যুপথযাত্রী-- এই পর্বতপ্রমাণ সমস্যা অথচ অর্থভাণ্ডার শূণ্য। এই মুহূর্তে যদি কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয় তাহলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ব্যতীত গত্যান্তর নেই। এত স্বর্ণ বা রৌপ্য নেই যে মুদ্রা তৈরী করা যায়। তাই সুলতান চিন্তা করতে থাকেন প্রচলিত মুদ্রার কোনরকম পরিবর্তনে ঘটানো সম্ভব কিনা। চীন আর পারস্যের প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা রয়েছে। খিলজী বংশের রাজত্বের সময়ের মুদ্রা-প্রচলনের দুর্বলতা এবং অস্থিরতা সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান রয়েছে। কোন পথে অগ্রসর হবেন ভাবতে থাকেন। মনে মনে তিনি চীন দেশকে আদর্শ বলে মনে করেন। তবু একটু সময় নিতে চান।

সুলতান আলাউদ্দিনের সময় রৌপ্য মুদ্রার ওজন ছিল একশত পঁচাত্তর রতি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই রৌপ্য মুদ্রার ওজন কমিয়ে দেওয়া হ'ল। এমন কি কোন কোন মুদ্রায় রৌপ্যের সঙ্গে তাম্র মিশ্রিত করা হ'ল। সুলতান কুতবউদ্দিন মুবারক শাহের সময়ে দক্ষিণ ভারত থেকে অনেক সম্পদ এসেছিল। তাই রৌপ্য মুদ্রার ওজন অবার

বাড়িয়ে করা হল একশত সত্তর রতি। খুসরবের স্বল্প রাজত্বকালে ওজন করা হ'ল একশত পঁয়তাল্লিশ। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সময়ে অর্থভাণ্ডারের অবস্থা ভাল হ'ল। তাই রৌপ্য মুদ্রার ওজন আবার বৃদ্ধি পেয়ে হল একশত সত্তর রতি। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে রৌপ্যের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেল। সাম্রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি পেল। দেশের নানা স্থানে টাঁকশাল নিষিদ্ধ হওয়ায় রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। সুলতান তখন স্বর্ণমুদ্রার ওজন বাড়িয়ে রৌপ্য মুদ্রার ওজন কমিয়ে দিলেন। তবু অর্থভাণ্ডারে স্বর্ণের পরিমাণ অনেক বেশী হয়ে যাওয়ায় রৌপ্যের সঙ্গে সমতা রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। মঙ্গোলীয় সম্রাট কুবলাই খাঁ যে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন তা সেই দেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাওয়ায় সফল হয়েছিল। কিন্তু কুবলাই খাঁকে অনুকরণ করতে গিয়ে পারস্যের সম্রাট কইখাতু খাঁ একেবারে ব্যর্থ হন। তাঁর অর্থভাণ্ডারের স্বর্ণ একেবারেই ছিল না বলে প্রতীক মুদ্রা প্রচলনে বাধ্য হন। কিন্তু প্রতীক মুদ্রা প্রচলন করতে হলে সমমূল্যের স্বর্ণ মজুত রাখতে হয়, যাতে চাহিদা মত প্রতীক মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ পেতে পারে যে কেউ। চীনের অধিবাসীরা জানে তারা ইচ্ছা করলে তাদের প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে যখন খুশি সমমূল্যের স্বর্ণ পেতে পারে। তাই সেখানে যা সফল, পারস্যে তা একেবারে ব্যর্থ।

মহম্মদ বিন তুঘলক ভাবলেন তাঁর ভাণ্ডারেও স্বর্ণ রয়েছে। সুতরাং প্রতীক মুদ্রা প্রচলনে বাধা কোথায়? তিনি কইখাতু খাঁয়ের মত অনন্যোপায় হয়ে এ পথে যাচ্ছেন না। প্রতীক মুদ্রার বিনিময়ে সমমূল্যের স্বর্ণ দেওয়ার ক্ষমতা তিনি রাখেন। তাছাড়া কইখাতু খাঁ চীন দেশের মত পত্রমুদ্রার প্রচলন করে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। কাগজের তৈরী মুদ্রায় অভ্যস্থ হতে হলে মানকিসতার পরিবর্তন প্রয়োজন। পারস্যের সাধারণ মানুষের তা ছিল না।

মহম্মদ বিন তুঘলক তাই ভেবেচিন্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করলেন। এবং সাধারণ মানুষেরা সেই মুদ্রা সহজভাবে গ্রহণ করেছে দেখে তিনি খোশমেজাজে অতিবাহিত করলেন কিছুদিন। কিন্তু তারপরই শুরু হল নানা সমস্যা। যাদের ওপর সুলতান অনেক অত্যাচার অবিচার করেছেন, বিশেষ করে দেশীয় সুফী সৈয়দরা, তারা প্রচার করতে লাগল সুলতান এতদিন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনদের প্রতারিত করেছেন, এবারে সাধারণ মানুষদের প্রতারণার মতলব করেছেন। সুলতানদের রাজত্বের আবার স্থায়িত আছে নাকি? আজ আছে কাল নেই। আজ এই সুলতান এই নিয়ম করলেন তো কাল আর একজন এসে সব পালটে দিয়ে অন্য নিয়ম চালু করলেন। আজ তামার মুদ্রা সচল তো কাল অচল। একবস্তা তাম্রমুদ্রায় এক রতিও সোনা মিলবে না।

কথাটা সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে গেল। এদিকে সবাই লক্ষ্য করল সারা দেশে

তাম্রমুদ্রা খুব দ্রুত ছেয়ে যাচ্ছে। সবাই জেনে গেল সরকারী টাঁকশাল ছাড়াও আরও অনেক বে-আইনী টাঁকশাল গজিয়ে উঠেছে এবং সেই সব টাঁকশাল থেকে অজস্র তাম্রমুদ্রা বেরিয়ে আসছে নদীর স্রোতের মত। সাধারণ মানুষের আস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। সুলতানের বিরোধীরা তাদের বোঝাতে শুরু করল সুলতান কৌশলে তাদের শেষ কপর্দকটুকু হরণ করার মতলবে আছেন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সৎ এবং আধুনিক। কিন্তু লোকে বুঝছে না। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যুগের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের সেখানে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায়। কখনো শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়। সুলতান মর্মাহত হলেন, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। তিনি ঘোষণা করলেন সমস্ত তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হবে। তুঘলাবাদে তাম্র মুদ্রার পাহাড় জমে উঠল। লোকে দলে দলে এসে সেইসব স্তূপীকৃত মুদ্রা দেখতে লাগল। ক'দিন পূর্বেও এই মুদ্রার কত মূল্য ছিল, এখন কানাকড়িও নয়। পথে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই বিপর্যয়ের মধ্যে একটা জিনিষ প্রমাণিত হ'ল যে কাউকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য সুলতানের ছিল না। লোকের মনে সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা সঞ্চারিত হ'ল। তাই এত বড় কাণ্ডের পরেও কোনরকম উচ্চবাচ্য আর শোনা গেল না। সবাই এই পর্বটি কিছুদিনের মধ্যে একেবারে বিস্মৃত হ'ল।

মা মাখদুমা-ই জাহাঁ বহুদিন পরে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শুনেছেন,সুলতান দিল্লী থেকে ফিরেছেন অনেক দিন হ'ল। হ্যাঁ , দিল্লী থেকে ফিরে এসেও মায়ের সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠেনি। অথচ জানেন, মায়ের শরীর ভাল নেই। বয়স তো কম হ'লনা। দৌলতাবাদ ছেড়ে গিয়েছিলেন সেই কবে। তখনই মা সুস্থ ছিলেন না।

আসলে তিনি তাঁর শৈশবকে অনেক দিন আগে হারিয়ে ফেলেছেন। শৈশব তো কয়েক বছরের জন্য। কিন্তু মনের মধ্যে সেটি থেকে যায়। যাদের মনের মধ্যে যত বেশী দিন থাকে তারা তত ভাগ্যবান। তিনি ভাগ্যবানদের দলে নন। তাঁর শৈশব তো সতেজ ছিল, খুব সজীব এবং নধর। সেই শৈশবের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হওয়ার কথা। কিন্তু সেই যে দারুনির্মিত মঞ্জিল উঠল নদীর তীরের সুন্দর পরিবেশে, তারপর একটি বজ্রের পতন ঘটল কি ঘটল না , মঞ্জিলের একাংশ ভেঙে পড়ল। হ্যাঁ, সেই থেকে তাঁর অন্তরের শিশুত্ব শুকিয়ে যেতে লাগল। আর বাঁচানো গেল না। তারপর থেকে একটা একাকীত্ব তাঁকে পেয়ে বসেছে। পিতার সেই কষ্টোচ্চারিত কথা কয়টি মনে পড়ে। তিনি অভিশাপ দিতে চাননি। তবু নির্গত হয়েছিল অনেক সংযত অভিশাপ। একমাত্র তাঁর নিজের বেগম কী যেন একটা খোঁজার চেষ্টা করত তাঁর মধ্যে। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে

একটা দূরত্ব গড়ে ওঠার সূচনা। যা আজ সাগর সমান। তবু উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে রয়েছে তরুণ ফিরোজ। বেগমের সঙ্গে দেখা হয়,কথা হয়। একেবারে বিচ্ছেদ হয়ে যায় নি।

কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোন সূত্র নেই। তাই অনেকদিন দেখা হয় না। মায়ের সামনে দাঁড়ালেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। মা কিন্তু তাঁকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেন নি। তাঁর প্রিয়তম পুত্র যে এই জঘন্য কাজ করতে পারে স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি। তবে স্ত্রীরা কখনো অন্ধ হতে পারে না। তাদের সুখে ভাগ বসাতে যে কেউ যে কোন সময়ে আসতে পারে বলে অন্ধ হলে চলে না। কিন্তু মায়ের হৃদয়ের পুত্র-স্নেহ-জাত নিঃসার্থ সুখে ভাগ বসাবার কেউ থাকে না। থাকতে পারে না।

মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে সুলতান দেখেন তাঁর চক্ষু নিমীলিত। বোধহয় নিদ্রা যাচ্ছেন। বাঁদী বলেছে তিনি জেগে আছেন। হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। আজকাল সুলতান বুঝতে পারেন অনেক সময় চোখকেও বিশ্রাম দিতে হয়। চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত। চোখের সঙ্গে বোধহয় মনের সংযোগ আছে। মন ক্লান্ত হলে চোখ বুঁজলে আরাম বোধহয়।

সুলতান লক্ষ্য করেন, তাঁর মা এর মধ্যে অনেক বৃদ্ধা হয়েছেন। তাঁর মাথায় চুল প্রায় সবটাই সাদা। হাতের ত্বক কুঁচকে হাড়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। দেখে কষ্ট হয় খুব। তিনি জানেন, বার্দ্ধক্য বেশীর ভাগ সময় মানুষের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। তবু সেই পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখতে ভাল লাগে না। বিশেষত যাঁকে তাঁর যৌবনের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চেহারায় দেখেছে কেউ।

সুলতান ডাকেন নিম্নস্বরে। বৃদ্ধাবেগম চোখ উন্মীলিত করেন, পুত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তারপর বলে ওঠেন-- জউনা, কী চেহারা হয়েছে তোমার? এ যে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছ।

সুলতান হেসে বলেন-- বয়স তো কম হ'লনা। বৃদ্ধ হতে আর কতই বা বাকী।

-- না না, এভাবে চলবে না। আমার কাছে এলে আরও বেগম আনার পরামর্শ দিতাম। সাদি হোক বা না হোক হারেম অমন খাঁ খাঁ থাকবে কেন?

-- কি লাভ হত?

--অনেক লাভ হত। সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকলে পুরুষেরা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। এত বড় সাম্রাজ্য, তাতে কত ঝামেলা। মনকে তরতাজা রাখতে হলে হাসিখুশী থাকতে হয়। আর আমীর উজিরের মধ্যে বসে থাকলে হাসিখুশী থাকা যায় না। তখন হারেমে আসতে হয়। কিন্তু হারেম ফাঁকা পড়ে রইলে মনের খোরাক কোথায় পাবে? সাদি কর।

--এখন?

--হ্যাঁ, সুলতান হয়েছ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাদি করতে পার।

-- সুলতান গিয়াসউদ্দিন সাদি করলে তোমার কি মনে হ'ত ? তুর্কী বেগমের সঙ্গে তো ভালভাবে কথা বলতে না।

--সে তো বলবই না। নিজের স্বার্থ দেখব না? তাই বলে পুরুষেরা থেমে থাকবে? না , তা হয় না।

--সুলতান গিয়াসউদ্দিন থেমে গিয়েছিলেন।

-- হ্যাঁ, সেটাই ভুল করেছিলেন। তাঁর যদি আরও বেগম থাকত, আরও অনেক সন্তান থাকত, তাহলে অমন অকালে চলে যেতে হ'ত না। আমার কেন যেন একথা বারবার মনে হয়।

সুলতান নীরব হয়ে যান। পরে মায়ের বাঁ হাত তুলে নেন নিজের হাতে। নাড়ি দেখেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে। মায়ের জিহ্বা পরীক্ষা করেন। দুই চোখের পাতা টেনে তার নীচটা দেখেন।

মা শুকনো হাসি হেসে বলেন-- এখনো হাকিমি কর?

--করি বৈকি। এ কি ছাড়া যায়? কত কষ্ট করে শিখেছি। কত পরিশ্রম করেছি।

-- কেমন দেখলে আমার অবস্থা। বাঁচার আকুলতা নেই আমার। তবে সব সন্তানের হাতের মাটি যেন পাই।

--পাবে।

-কাদের চিকিৎসা কর?

-- যারা সাহস করে সামনে আসে। আর যাদের কেউ নেই, পথের ধারে পড়ে গড়াগড়ি খায়। তাদের অবশ্য রাতের অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করি।

--খুব খুশী হলাম। পড়াশোনা?

--চলছে সিকান্দার নামা, আবু মুসলিম নামা আর তারিখি মহমুদি মুখস্ত বলতে গেলে।

--আহা, শুনেও আনন্দ।

সুলতান মায়ের নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বক্ষণে বৃদ্ধা আবার বলেন-- সাদি কর। নইলে মনটা শুকিয়ে যাবে। সুলতান হলে মনের ওপর যে চাপ পড়ে তার একমাত্র পরিত্রাণ নারীসঙ্গ। আমি নারী হয়ে একথা বুঝেছি বলে তোমাকে বলছি। নিজের ভাইকে দেখে বুঝতে পার না?

-- কোন্ ভাই?

-- বহ্‌রম খাঁ।

সুলতান হেসে ফেলেন। শেষে বলেন-- অন্য ভাইরা থাকতে শেষে তার কথা বললে? সে আবার কাজ করে নাকি ? ভাই না হলে কবে বিদায় করে দিতাম। বড়

বেশী আরাম প্রিয়। এদিকে শুনি একগাদা বেগম। অথচ নিঃসন্তান।

বৃদ্ধা বেগম আর কিছু বলেন না। সুলতান বুঝতে পারেন, এইভাবে একদিন তাঁর মা চলে যাবেন। পুত্রের সামনে নিজের বার্ধক্য জনিত অসুবিধা আর কষ্ট চেপে রাখার চেষ্টা করলেও পারেন নি। সুলতান বুঝেছেন, আরও অন্তত ছয় মাসের জন্য নিশ্চিন্ত। তার পরের কথা বলা যায় না। কারণ ধীরে ধীরে হলেও দিন দিন তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। কোন দাওয়াই বা খাদ্য সেই দৌর্বল্য প্রশমিত করতে পারছে না। এ হলো অবধারিত মৃত্যুর হাতছানি।

খাজা জাহাঁ মালিক জাদা আহমেদ বিন আইয়াজ একবার তার অতীতের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। সেই যমুনার কুলে নাসরিনের মা এবং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একদল পশু। সেখান থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে দুই সুফী ফকিরের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। সেই আশ্রয়ে নাসরিনের মায়ের মৃত্যু। সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছিল দিল্লী থেকে নাসরিনকে দৌলতাবাদে নিয়ে আসার সময়ে। একটি শকটে তাঁর বেগম এবং দুই শিশুপুত্র, কিছুটা দূর অন্য শকটে নাসরিন। সারাটা পথ তাকে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়েছে। ওদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে সুলতানের সহস্র ফাইফরমাশ । অনেকের সন্দেহ খাজা জাঁহা অশ্ব নিয়ে বারবার ওই বিশেষ শকটের দিকে কেন যাচ্ছে? পর্দা তুলে কার সঙ্গে কথা বলছে? এইভাবে অবশেষে দৌলতাবাদে পৌছেও শান্তি নেই। নাসরিনের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে?

এত গোপনীয়তা, এত প্রচেষ্টার পরও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল নিজের বেগমের কাছে এবং তার জন্য চূড়ান্ত অশান্তি। বাইরের কেউ জানে না, তার বেগম একদিন বিষের কৌটো হাতে তুলে নিয়েছিল। সামান্য একটু মুখেও দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ে যায় বলে সেই যাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়। তবু যেটুকু মুখে গিয়েছিল তার জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত। সারারাত পাশে বসে থেকে লবন জল পান করিয়ে বমি করানোর চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত সফল হওয়ায় হাকিমকে ডাকতে হয়নি। তাহলে বেইজ্জত হতে হত। তবে এরপরে আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি বেগম। ওইটুকুতেই বুঝেছিল যে আত্মহত্যা বড় যন্ত্রণাদায়ক।

শেষে কোন একদিন সোজাসুজি নাসরিন সম্বন্ধে কথা বলতে চায়।

-- তুমি ওকে ছাড়তে পারবে না?

--অসম্ভব।

-- আমাকে ?

-- অসম্ভব। দেখো, আমি প্রথমে সত্যিই চাইনি ও আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু ও আমাকে বরাবর ভালবেসে এসেছে। বড় গভীর সেই ভালবাসা।

--এমন সুযোগ পেলে সব মেয়েই ভালবাসার ভণিতা করে।

--ভণিতা নয় বেগম। তোমাকে সব কথা খুলে বলব।

-- বল।

মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজ তখন আনুপূর্বিক সব কিছু একে একে বলে যায়।

বেগম স্তব্ধ হয়ে শোনে। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে -- ও কোথায়?

-- কাছেই আছে।

-- নিয়ে এসো।

-- এ বাড়িতে?

--হ্যাঁ, সাদি কর।

-- আমি?

বেগম হেসে বলে-- ওর প্রতি তোমার যে গভীর প্রেম শত চেষ্টাতেও আমি তা ছিনিয়ে নিতে পারব না। তাই ওর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রেখে লাভ নেই। সত্যকে সহজভাবে মেনে নেওয়া ভাল। আমার দুর্ভাগ্য তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি কোনদিন।

--ভুল বললে বেগম। তোমাকে আমি একসময়ে যথেষ্ট ভালবেসেছি। তোমার ওপর আমার টানও খুব। আমার জীবনের সঙ্গে তুমি আর আমার দুই পুত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছ। আজ তুমি কোথাও চলে গেলে আমার জীবনের একটা দিক একেবারে শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে এত উন্মাদনা রয়েছে আগে কখনো অনুভব করিনি। নাসরিনের কাছে শিখেছি। হয়ত সে আমার জন্যে অত আকুল হয়ে পড়ে বলে। তুমি আমাকে সহজভাবে পেয়েছ বলে হয়ত সেই আকুলতা কখনো ছিল না। ও তো সেভাবে পায় নি।

-- আর বেশী ব্যাখ্যা করে আমার মনকে বিষিয়ে তুলতে হবে না। সবই বুঝতে পেরেছি। যাও ওকে নিয়ে এসো।

আইয়াজ নিয়ে গেল একদিন নাসরিনকে তার বেগমের সামনে। বেগমের মুখ দিয়ে কথা সরেনি।

নাসরিন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

--বসো।

নাসরিন বসে।

-- কোথায় থাক?

নাসরিন জানে না কোথায় থাকে। সে ঘরের বাইরে যায় না কখনো। যেতে চায় না। বুঝতে পারে সে রাস্তায় বের হলে অনেক প্রশ্ন জাগবে অনেকের মনে। তাই উত্তর

দিতে পারে না। উত্তরের জন্য আইয়াজের মুখের দিকে চায়।

আইয়াজ বলে-- কাছেই।

-- এখন থেকে এখানে থাকবে।

-- কোন্ পরিচয়ে?

-- তোমার বেগম, এই পরিচয়ে। ও অনেক কষ্ট করেছে। আর কেন?

কৃতজ্ঞতায় আইয়াজের হৃদয় ভরে ওঠে। আর নাসরিনের নয়নদ্বয় হয় অশ্রুপূর্ণ।

--তোমার ওপর আমার খুব হিংসে হচ্ছে নাসরিন, তুমি এভাবে ওকে ভালবাস দেখে। ও এমনিতে তোমার কাছে ধরা দেয়নি। তবে সেই সঙ্গে তোমার রূপকে বাদ দেওয়ার মত মূর্খ আমি নই।

সুলতান জননী বেগম মাখদুমা-ই-জাহাঁ বুঝতে পারেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। শুয়ে থাকতে থাকতে অতীতের নানা কথা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। মিলিয়ে যেতেও বিলম্ব হয় না। অনেক সময় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা হারিয়ে ফেলেন। ডেকে ওঠেন বহু পুরাতন কোন বাঁদীর নাম ধরে যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল অথচ পনেরো বছর পূর্বে যার মৃত্যু হয়েছে। কখনো আপন মনে কথা বলেন, হাসেন। ঘুমের মধ্যে শিশুদের দেয়ালার মত কখনো কাঁদেন ,কখনো হাসেন। আর মাঝে মাঝে জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ধরে ডাকেন। পরিচারিকারা এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত। তারা জানে এই সব নাম ধরে ডাকা, কথা বলা, সবই মুহূর্তের জন্য । সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যান।

একদিন তিনি কিন্তু ভুললেন না। পরিচারিকাদের উপেক্ষায় তিনি জ্বলে ওঠেন। বলেন-- তোমরা ভেবেছ কি? আমি বেগম মাখদুমা-ই-জাহাঁ হুকুম করছি সুলতানকে ডেকে দিতে, তোমরা আমল দিচ্ছ না? জানো তোমাদের গর্দান নিয়ে নিতে পারি? আসকারা পেয়ে মাথায় চড়েছ?

সবাই ভয় পেয়ে যায়। তারা লক্ষ্য করে যিনি বরাবর অধিকাংশ সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন, তিনি রীতিমত সজীব। তারা সুলতানকে খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

সুলতান সমস্ত কাজ ফেলে রেখে মায়ের কক্ষে এসে প্রবেশ করেন।

--ডেকেছ কেন মা?

--সুলতান গিয়াসউদ্দিন বড় একা। এই একাকীত্ব তিনি সইতে পারছেন না। তাই বারবার আমাকে ডাকছেন। আমি যেন তাঁর কাছে ফিরে যাই।

সুলতান একটু গম্ভীর হয়ে যান। ভাবেন। এ তো প্রলাপ নয়। আজ পীড়িতা বৃদ্ধাকে আদৌ দুর্বল বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর মস্তিষ্ক রীতিমত সক্রিয়। তবে কি ওষুধের গুণ; নাকি শেষবারের মত জ্বলে ওঠা?

-- উনি কি করে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন?

-- কি করে আবার? তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছ, সেইভাবে। দেখলাম একাকীত্ব ওঁকে কাতর করেছে খুব। তুর্কী বেগমের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিষণ্ণ হন। তবু বলেন, তিনি আশেপাশে নেই। আমি না গেলে তাঁর চলবে না। আমাকেই চাই। আমি দিল্লী যাব, ব্যবস্থা কর।

-- তুমি খুব অসুস্থ।

-- জানি। এ কথা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। তবু।

--এই শরীর নিয়ে পৌঁছোতে পারবে তো?

--আমার দেহকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে না?

সুলতান নীরব থাকেন।

বেগম আবার জ্বলে ওঠেন-- বল, পারবে না?

--পারব।

--তাহলে আজই ব্যবস্থা কর। আজ তোমাকে একটা কথা বলি। এই শহর আমার কখনো ভাল লাগেনি। দিল্লীর আবহাওয়ায় একটা অন্য ধরনের সুঘ্রাণ পেতাম। এখানে পাইনা। তবু তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাকে উৎসাহ দিতে মনের টুঁটি চেপে ধরে এখানে এসেছি। আমাকে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কাছে ফিরিয়ে দাও। আমার দেহকে অন্তত।

--তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার এই আকাঙ্খার পথে বাধা হব না।

পরদিনই বেগমসাহেবাকে দিল্লীতে প্রেরণের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক সিপাহী এবং একজন সেনাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে তাঁর যাত্রা শুরু হ'ল। সুলতান ভালভাবেই জানেন, মায়ের সঙ্গে তাঁর এই শেষ দেখা। শকটে উঠে মা নিজেও সেকথা বললেন, পুত্রের অঙ্গে হাত রেখে। কিন্তু তাতে তাঁকে বিষাদগ্রস্থ বলে মনে হ'ল না। মুখ তাঁর হাসি হাসি। যাচ্ছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কাছে। সেই কবে হরিয়ানার এক প্রান্তরে সজীব সতেজ সুদর্শন এক যুবকের সঙ্গে হয়েছিল তাঁর প্রথম চারচক্ষুর মিলন। প্রথম দর্শনেই মনে মনে আত্মনিবেদন। তাঁর কাছে শেষ যাত্রার শুরু আজ।

দুই মাস পরে মৃত্যু সংবাদ এল, তিনি অফুরন্ত জীবনীশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাই জীবিত অবস্থায় দিল্লী গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হ'ল এবং স্থান করে নিলেন স্বামীর ঠিক পাশটিতে।

ফিরোজ এখন প্রায় যুবক। পিতার সঙ্গে এদিকে ওদিকে যায় রাজনীতি, বিষয়ে আলোচনা করে। সুলতান বুঝতে পারেন পুত্র যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কোন কোন ক্ষেত্রে তার

মতামতকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আর সেজন্য সুখ অনুভব করেন সুলতান। তবে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল ঠিক ততটা ঘনিষ্ঠতা তাঁর আর পুত্রের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এর অন্যতম কারণ তাঁর নিজের বেগমের সঙ্গে দূরত্বটা অনেক বেড়ে যাওয়া। তাঁর সময়ে এমন হয়নি, তাঁর আর পিতার মধ্যে যত কথা, যত আলোচনা সব কিছু হ'ত মায়ের কক্ষে । যত হাসিঠাট্টা রাগ বিরাগ সবই মায়ের সামনে। সেখানে কখনো তাঁর অন্য ভ্রাতারা এবং ভগিনী উপস্থিত থাকত আবার থাকতও না। সেখানে সব কিছুর সালিসী করতেন মা। সেখানে তাঁর স্থান সুলতানের চেয়েও উঁচুতে । গিয়াসউদ্দিন ছিলেন দ্বিতীয়, ফিরোজ সেই সব মধুর পরিবেশের আস্বাদন পায়নি কখনো। সে যে তার পিতা ও মাতার স্নেহ মিলিতভাবে উপভোগ করার মত ভাগ্য করেনি একথা সুলতান মর্মে মর্মে অনুভব করেন। তাই পুত্রের প্রতি তাঁর সমবেদনা রয়েছে।

তবে এখন পুত্র অনেক বড় হয়েছে। সে বলতে গেলে স্বয়ং সম্পূর্ণ । পিতা বা মাতা কারও অভাব সে আর অনুভব করেনা নিশ্চয় । এখন বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তার অভাব হওয়ার উচিত অন্য দিকে।

তবু পুত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বেগমের ঘরে। বেগম পুত্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সময় তাঁর অপ্রত্যাশিত প্রবেশে বেগম অপ্রস্তুত। মধ্যাহ্নের এই সময় শেষ কবে এসেছিলেন সুলতান মনে নেই তাঁর।

-- তোমার দু'জনাই আছ। ভালই হ'ল। আমি ভাবছি একবার দোয়াবে যাব।

পুত্র বলে-- আপনি কেন? আমাকে পাঠান।

--কেন যেতে চাইছি বলতো?

-- ওরা খুব তেতে রয়েছে। ওদের বরাবরের ধারণা করের বোঝা ওদের ওপর সব সময় বেশী চাপানো হয়।

—হ্যাঁ, অদ্ভুত মনগড়া ধারণা। রাজপুতরা চিরকাল চড়া ধাতের। ওদের সন্তুষ্ট করা কঠিন।

সুলতানকে হতবাক করে দিয়ে পুত্র ফিরোজ বলে— দোষ ওদের নয়, আমাদের। ওদের জমি উর্বর ঠিকই, কিন্তু ওরা অত ফসল ফলায় কঠিন পরিশ্রম করে। এটা ওদের দোষ নয়। তাই ওদের ওপর বেশী খাজনা চাপানো ঠিক হয়নি। এর পরে আরও চাপালে ওরা বিদ্রোহ করবে।

সুলতানের অভিপ্রায় ছিল আগামী বছর থেকে খাজনা বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু পুত্রের কথায় চিন্তিত হন। অর্থভাণ্ডারের যা সঙ্গীন অবস্থা। খোরাসান আর করাচিলের ধাক্কা যেন এত বছরেও কাটিয়ে ওঠা য়ায়নি। তারপর সেই তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্য দিতে দিতে ফতুর। ওদিকে বঙ্গভূমি থেকে বেশী রাজস্ব আসেনা। অথচ সেখানে সদিচ্ছা থাকলে বহুগুণ আদায় হতে পারে। দিল্লী আর দৌলতাবাদ থেকে অনেক দূরে বলে

ওখানকার শাসকরা রাজস্বের মোটা অংশ নিজেরাই কুক্ষিগত করে। বলতে গেলে ওরা যেন ওখানকার এক একজন স্বাধীন সুলতান। তাই দোয়াব ছাড়া গতি নেই।

সুলতান বলেন— তবু দোয়াব ভরসা।

—আমার মনে হয়, সেটা ভুল হবে।

বেগম পুত্রের নির্ভীক আলোচনায় গর্ব অনুভব করেন। সুলতান তাঁকে কখনো ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য না করলে কি হবে তাঁর গর্ভের সন্তানের বিরুদ্ধে সহসা কিছু বলতে পারছেন না।

ফিরোজ কক্ষত্যাগ করলে বেগম বলেন— হঠাৎ অসময়ে?

-- কেন,আসতে নেই ?

— আসতে কোন বাধা নেই। তোমার অবশ্য প্রবেশাধিকার। কিন্তু অদ্ভুত লাগল তুমি যখন এলে।

--কেন?

--এমনিতেই তো কখনো আসো না। অবশ্য তোমার হারেম শূন্য। তাই আমার কোন অভিযোগ নেই।

--হারেম পূর্ণ থাকলে অভিযোগ থাকত ?

—অল্প বয়সে হয়ত থাকত। কিন্তু এই বয়সে থাকবে কোন্ মুখে? বলতে গেলে যৌবন আমার অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। আকর্ষণ শুধু ডুবন্ত সূর্যরশ্মির দ্বারা উদ্ভাসিত রঙিন আকাশটুকু।

— তোমাদের একটা ধারণা থাকে, যাকে একবারে মিথ্যা বলব না, আবার পুরোপুরি সত্য কখনোই বলব না। তোমরা নিজেদের দেহকে একশো ভাগ প্রাধান্য দাও।

— সত্যিই কি নয়? বিশেষ করে তোমাদের বেলায়?

— মিথ্যা নয়। কিন্তু একেবারে সত্য বলতে পারিনা। দেহ ছাড়াও আর একটি জিনিষ রয়েছে, সেটি হল মন। সেই মনকে যারা প্রত্যাখান করে তারা অভাগী।

--আমিও বুঝি সেই দলে?

--হ্যাঁ। মানুষের সহস্র দোষ থাকতে পারে। তবু সে এক জায়গায় সমর্থন না চাইলেও সহানুভূতি চায়। যে নারী তা দিতে পারে সে সার্থক। একটা বিরটা দেশের ভার আমার এপর। কতশত পদস্খলন হতে পারে এতে। কখনো হিংস্র হতে হয়, কখনো প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হতে হয়। কিন্তু একটা জায়গা থাকে যেখানে একটা উপদেশ, একটু মৃদু ভর্ৎসনা, অনেক সহানুভূতি এবং ভালবাসা আশা করে পুরুষ।

—আমি সেটা পূর্ণ করতে পারিনি তো?

—সে কথা তুমি ভাল জান।

-- আজ কি তোমার মন আশ্রয় খুঁজতে এসেছিল আমার কাছে?

-- বোধহয় তাই। অনেক দিন আগে যখন তুমি প্রথম এলে আমার জীবনে, তখনকার কথা ভুলিনি। তখন আশ্রয় পেতাম। তাই এখনো ভুল করে চলে আসি। আজ যেমন এসে গিয়েছি । আমি চলি।

-- না, যেও না।

বেগমের অনুরোধে সুলতান একটি আসনে বসেন। বেগম এগিয়ে যান তাঁর কাছে। নিবিড় ভাবে পাশে বসে বলেন---- তোমাকে খুব ভালবেসেছিলাম। চিরকাল বাসতে চেয়েছি। তোমাকে আমি দেখেছি কত উদার, কত মধুর। আবার দেখেছি কী নৃশংস তুমি। তখন সভয়ে দূরে সরে এসেছি। ভালবেসেও সেভাবে কাছে আসতে পারিনি। তখন নানা ভাবে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। ওই পথ থেকে যাতে তুমি সরে আসতে পার।

সুলতান হাসেন। বলেন-- কোন্‌টা ঠিক আর কোনটা বেঠিক এই প্রশ্নের মীমাংসা করার ভার বোধহয় মানুষের ওপর দেওয়া হয়নি। মানুষ এ যাবৎ চিরকাল ভুল করে এসেছে, ভবিষ্যতে করে চলবে। জীবন ভুলে ভরা। তুমি নিশ্চয় সেটা উপলব্ধি করেছ।

--হ্যাঁ।

-- তবে? শুধু শুধু----

--হ্যাঁ, শুধু শুধু। শুধু শুধু জীবনটা নিস্ফল করে ফেললাম। আমি জানি তুমি আমাকে আর সেভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। পারবেই বা কি করে! সেভাবে নিজেকে তো মেলে ধরতে পারব না তোমার কাছে।

--তোমার দিন ফুরিয়ে যায়নি এখনো। সার্থক বেগম না হতে পারলেও মা তো হতে পেরেছ। সার্থক মা হও, কিন্তু কখনো পুত্রের সব কাজে কথায় কথায় বাধা দিওনা। তাকে উৎসাহ দিয়ে যাও। যদি মনে কর সে ভুল করতে যাচ্ছে, তাহলে সেটা সোজাসুজি না বলে.অনেক ঘুরিয়ে মিষ্টি করে বলবে। তাহলে সে তোমার মধ্যে একই মা খুঁজে পাবে। বেগম রূপে তুমি যেমন হারিয়ে গিয়েছ, মা রূপে হারিয়ে যাবে না। আমার মা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মধ্যে ছিলেন, এখনো রয়েছেন।

সুলতান ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন না তাঁর বেগমের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেই অবস্থাতেই তিনি সুলতানকে বিদায় দিতে দরজার দিকে এগিয়ে যান। চোখ মুছতে মুছতে ভাবেন, সুলতান নারী নন---- পুরুষ। তাঁর চরিত্র রমনীদের মত নয়। যারা শুধু দঃখ ভোগ করে আর সেই দুঃখের সান্তনা খুঁজে পায় চোখের জলে।

ভ্রাতুষ্পুত্র খুসরব মালিকের কথা এতদিন পরেও হামেশা মনে পড়ে সুলতানের। আর তখন মন খুব খারাপ হয়ে যায়। তাকে ঘিরে একটা কল্পনা ছিল তাঁর। সেই

কল্পনা,সেই স্বপ্ন টুটে গিয়েছে। বেগমের কাছে গিয়েছিলেন সান্ত্বনার আশায়। বৃথা আশা। তাঁর বেগম তাঁকে কোনদিন স্বপ্ন দেখাতে পারেননি। রূঢ় বাস্তবের মধ্যে থেকে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে বেগমের কাছে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন। স্বপ্নের পরিবর্তে বাস্তবকেই বেগম বারবার বেশী করে টেনে এনেছেন তার দিনের বিশ্রাম আর রাতের শয্যায়। ফলে মোহভঙ্গ হয়েছে বারবার। তখন বেগমকে রক্তমাংসের সীমা ছাড়িয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। তাঁকে মনে হয়েছে কুৎসিত এক দলা মাংস পিণ্ড। প্রথম যৌবনেই বেগমের প্রতি তেমন আর আকর্ষণ অনুভব করতেন না। আসক্তি উধাও হয়েছিল। তবু অভ্যাসের বশে আসতেন।

খুসরব মালিক মস্ত ভুল করে ফেলেছিল তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে, না করলে বড় ভাল হত। ফিরোজও সৈন্য চালনায় পরিণত হয়ে উঠছে। তবে সুলতান হয়ে সে একা তো সারা দেশকে সামলাতে পারবে না। তার আমলে সারা দেশে শান্তি বিরাজ করবে এই আশা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। মানুষের শিরা-উপশিরায় যতদিন শোণিত প্রবাহিত হবে ততদিন যুদ্ধ বিগ্রহ খুনোখুনি সবই চলবে। তবে সেই শিরা-উপশিরায় বিধাতা যদি কোনদিন শোণিতের পরিবর্তে হিমালয়ের শীর্ষের তুষার গলানো জল ভরে দেন, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু তা তো হয় না। ফিরোজের জন্য এখন থেকেই কয়েকজন রণকুশলী তরুণের খোঁজ করতে হবে।

আচ্ছা মালিক কাসেমকে ডাকলে কেমন হয়? বহুদিন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। তিনি লক্ষ্য করেছেন সে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দরবারের আশেপাশে হামেশা ঘুরঘুর করেছে। কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা ততটা ভাল না থাকায় তাকে ডাকেন নি, একবার ডেকে দেখা যাক।

ডেকে পাঠালে সে ছুটে আসে। তখনো দরবার বসেনি। সুলতান দরবার সংলগ্ন একটি কক্ষে বসে অন্য কিছু কাজ করছিলেন। মালিক কাসেম তাঁকে উৎসাহব্যঞ্জক কুর্নিশ করে দাঁড়ায়। বহুদিন পরে বলে তার মধ্যে একটা আড়ষ্ট লক্ষিত হয়।

--কেমন আছ কাসেম।

-- আপনার রাজত্বে কেউ খারাপ থাকে না খোদাবন্দ। ভাল আছি।

সুলতান ভাবেন, সুযোগ দিতেই কথা ফুটতে শুরু হয়েছে কাসেমের কণ্ঠে। আর একটু সুযোগ দিলে তুবড়ি থেকে আগুনের ফোয়ারা ছুটবে।

—তুমি তো দৌলতাবাদে আছ দেখছি। কাজ কি তোমার? জাজনগরে এককালে যে জন্য থাকতে বলেছিলাম, সেই কাজ তো বহু বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমাকে কি আমি কোন কাজ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম?

অপ্রতিভ দেখায় কাসেমকে। সহসা উত্তর দিতে পারে না। সে শুধু ভাবে সুলতান যদি এখন তাকে দৌলতাবাদ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেন, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তাহলে এতদিন যা গোপন রেখেছে তাকে প্রকাশ করে দিতে হবে।

সুলতান গম্ভীর হয়ে বলেন---- ব্যাপার কি বলতো? তুমি আমার সঙ্গে থাক জেনে সিপাহশালার তোমাকে কোন কাজ দেন না। তুমি সুযোগ নিচ্ছ।

--আমার কসুর হয়েছে খোদাবন্দ। আমি রোজ নিয়মিত দরবারে আসি কাজের জন্য। আপনি বিশেষ কোন কাজ দেননি।

-- কোন কাজ করছ না, অথচ দেখে মনে হচ্ছে কত চিন্তাগ্রস্ত। তুমি কি এর মধ্যে সাদি করেছ?

-- না খোদাবন্দ। সাদি করলে আপনি জানতেন।

-- কেন, যতদূর মনে পড়ে করাচিল থেকে সুন্দরীদের নিয়ে আসার ভার ছিল তোমার। তার থেকেই তো তোমার পাওয়ার কথা ছিল।

--হ্যাঁ, কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনি নির্বাচিত করে নেওয়ার পরে তবে তো আমি নেব। খুসরবের মৃত্যু আপনাকে নীরব করে দিল। আমিও সাহস করলাম না ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে । ওদের আমি রেখে দিয়েছি। যতটা সম্ভব যত্নেই রেখেছি।

বিস্মিত সুলতান বলেন---- তার মানে? তুমি ওদেশ থেকে সত্যিই এনেছ নাকি ?

--তেমনই হুকুম ছিল আমার ওপর। তাই চারজনকে এনে রেখেছি।

----বল কি! তুমি নিয়ে এসেছ অথচ আমি জানতে পারলাম না? বললেও না একবারও? আশ্চর্য!

--সযোগ পেলাম কোথায়? আপনি চলে গেলেন মুলতানে। তারাপর সর্বনাশ ঘটে গেল মানস সরোবরে।

--তুমি একটা অদ্ভুত জীব। এই কয় বছর ওদের একা রেখে দিয়েছ আর ওদের যৌবনকে একটু একটু করে ঝরে যেতে দেখছ?

--হ্যাঁ হুজুর। ওরা কান্নাকাটি করে। তবে যত্নের ত্রুটি করিনি।

-- তুমি সাদি না করে আমার জন্য বসে রয়েছ?

--হ্যাঁ, হুজুর।

-- তোমার গর্দান নেওয়া উচিত। তুমি হারেমের জিনিষ বাইরে রেখছ।

কাসেম নীরব।

-- কোথায় রেখেছ?

--মিনারের পাশ দিয়ে গিয়ে প্রাচীরের তৃতীয় বুরুজের ডান দিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেখানে গোরস্থান শুরু হয়েছে তার একটু আগে একটি গৃহে।

--অতদূরে ?

--হ্যাঁ, স্থানটি নির্জন।

-- কেউ দেখেনি?

--হয়ত দেখেছে। দৌলতাবাদ রাজধানী হওয়ার পরে অমন অনেক গৃহে অনেকে আছে।

-- আজ সন্ধ্যার পরে আমাকে নিয়ে যাবে।

-- আপনার হারেমে ঠাঁই হবে তো খোদাবন্দ? ওদের অনেক আশা দিয়ে এনেছিলাম। আপনি ওদের দিকে না চাইলে আমার কথার খেলাপ হয়ে যাবে।

--বেশ। তবে একটা শর্তে।

--আমার সঙ্গে শর্ত? আমি আপনার নফর মাত্র। আপনার হুকুমের বান্দা আমি।

--আজ সন্ধ্যায় এসো।

সন্ধ্যায় এসে মালিক কাসেম সুলতানকে কঁরাচিলের সেই সুন্দরীদের বাসস্থানের দিকে নিয়ে যায়। যেতে যেতে দূরে দু'তিনটি প্রদীপকে মিটিমিটি জ্বলতে দেখেন।

--কিসের আলো কাসেম?

--গোরস্থানের। অনেকে তাদের প্রিয়জনের কবরে বাতি দিয়ে যায়। একটু পরেই নিভে যাবে।

--কেন?

-- হাওয়ায় কিংবা তেল ফুরিয়ে গেলে।

সুলতানের মন খুশীতে ভরে ওঠে। ভাবেন, দেশের এই অংশটাও এখন আপন আপন বলে মনে হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা এখানে বাস করছে। কবরও রয়েছে। সবেবরাতে অনেক চিরাগ জ্বলতে দেখা যাবে।

--এসে গিয়েছি হুজুর।

ভেতরে গিয়ে সুন্দরীদের দেখে সুলতান চমৎকৃত হন। তিনি কাসেমের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন-- তুমি এদের স্পর্শ করনি?

-- কি করে করব? আপনার হুকুম তো পাইনি।

মনে মনে মালিক কাসেমকে তারিফ করে তিনি বলেন --এরা আমার কথা বুঝতে পারবে?

--হ্যাঁ, বলতেও পারে।

-- কি করে?

--আমি শিখিয়েছি দিনের পর দিন অনেক পরিশ্রম করে।

--তুমি শিখিয়েছ!

-- কি করব হুজুর। আপনার জন্য গড়ে দিতে হবে তো।

--এদের বলেছ নাকি কোথায় এদের যেতে হবে?

সুন্দরীদের মধ্যে একজন সুমিষ্ট ঝঙ্কার তুলে বলে-- না, উনি সেকথা বলেন নি তো? বলেছেন আমাদের খুব ভাল ব্যবস্থা হবে।

সুলতান খুশী হয়ে কাসেমকে দেখিয়ে বলেন--এই লোকটা তোমাদের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেছে?

-- সবাই বলে, এক মুহূর্তের জন্যও নয়।

-- স্পর্শও করেনি?

-- না। আমরা নিজেরা অবাক হই। আমরা যেন টাটকা ফুল। স্পর্শ করলে শুকিয়ে যাব।

আর একজন বলে-- উনি শুধু আমাদের এখানকার কথা বলতে শিখিয়েছেন।

সুলতান তখন বলেন— আমাকে তোমরা চেন?

-- না, তবে মনে হচ্ছে আপনি এঁর মালিক। উনি আপনাকে খুব খাতির করছেন।

--ঠিক। তোমাদের যদি বলি একে স্পর্শ করতে তোমরা রাজি হবে ?

মালিক কাসেম উত্তেজনা বশে কিছু বলে উঠতে চায়। সুলতান হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন-- কি হ'ল? তোমরা রাজি হবে?

চারজনের মধ্যে দু'জনার মুখ আনন্দে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সুলতান তাখন ওই দু'জনাকে বলেন--এই কাসেম খুব ভাল কাজ করে। কোন দিন কোন অভাব হবে না তোমাদের। এ খুব বিশ্বাসী। তোমাদের কখনো অবহেলা করবে না। তোমার দু'জনা একে সাদি কর।

ওদের মুখ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। এই প্রস্তাব অভাবিত ওদের কাছে।

মালিক কাসেম বলে ওঠে--এ কি করলেন সুলতান? এদের দু'জনার মধ্যে একজন যে সব চাইতে সুন্দরী।

--সে তোমার ভাগ্য। ওর মুখ এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। চেয়ে দেখ।

--কিন্তু আপনি?

-- তোমার বয়স কত?

-- দু'বছর হ'ল চল্লিশ ছাড়িয়েছে।

--আমি তোমার চেয়েও বড়।

--তবু সুলতানের হারেমে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর স্থান।

--সব সময় নয়।

সুন্দরীরা এতক্ষণে বুঝতে পারে। ওদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সারা হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা স্বয়ং মহম্মদ বিন তুঘলক। যাঁর কথা কতবার কতভাবে শুনেছে ওরা। কিন্তু তাঁকে দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। তিনি এত সহজ। এতটুকুও আত্মাভিমান আছে বলে মনে হচ্ছে না। বাকী দু'জনা বুঝতে পারল তাদের স্থান সুলতানের হারেমে। তবে কি তারা সুলতানের বেগম হতে পারবে? কে জানে?

সবাই শুনল ,অনেকে দেখল। মোমের পুতুলের মত দুই নারীকে নিয়ে আসা হ'ল সুলতানের হারেমে। বেগম তাঁর বুকের মধ্যে তীব্র যাতনা অনুভব করলেন। তিনি কখনো কল্পনা করেন নি, এতদিন পরে সুলতান তাঁর হারেমকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করবেন। আবার ভাবলেন, কোনো দিক দিয়েই তো তিনি সুলতানের অভাব পূর্ণ করতে পারেন নি। অনেক আগেই যদি সুলতান হারেম ভরিয়ে ফেলতেন তাহলেও বলার কিছু ছিল না। পুত্র ফিরোজ মায়ের কক্ষে এসে মুচকি হেসে চলে গেল। তাতে বেগম মনে আরও বেশী আঘাত পেলেন। ফিরোজ অন্তত মৃদু বিরক্তি প্রকাশ করতে পারত। আসলে ও নিজেও যে পুরুষ। তার ওপর তরুণ। সুতরাং পিতার কর্মের প্রতি বোধহয় প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। যা হোক, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

হারেম পরিপূর্ণ করে ফেললেই বা তাঁর কি এসে যায়। তবে সম্মানের প্রশ্ন তো রয়েছে। মনটা তাই ঈর্ষা কাতর হয়ে ওঠে। সবাই সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইবে। ভাববে এই বয়সেও স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারল না। প্রাকারান্তরে এতে তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণিত হল।

সুলতান বেগমের কক্ষে প্রবেশ করেন।

-- তুমি! এখানে?

-- হ্যাঁ বেগম। খবর পেয়েছ নিশ্চয়।

-- না পাওয়ার কি আছে? এক দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে একই ছাদের নীচে সবাই থাকছি, খবর পাব না? এখানে এক জনের নিঃশ্বাসের শব্দও অন্যে শুনতে পায়। ওই ঘর থেকে তোমার উত্তেজিত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাবে, যে শ্বাস প্রথম যৌবনে আমার মুখের ওপর মরুর ঝড়ের মত আছড়ে পড়ত।

সুলতান বুঝতে পারেন বেগম ক্ষিপ্ত। এঁকে এখন প্রবোধ বাক্য শোনাবার প্রশ্ন ওঠে না। তাই একটু চুপ করে থাকেন।

-- তুমি এসেছ কেন? আমাকে দেখতে ? দেখে মজা পেতে ?

-- না বেগম। তুমি আমার পুত্রের জননী। তোমার সঙ্গে তো আমার সম্পর্ক টুটে যাওয়ার নয়। অনেক কারণে তোমার কাছে আমাকে আসতে হবে। একটি ক্ষেত্রে আমাদের স্বার্থ অভিন্ন।

বেগম একটু শান্ত হন। বলেন--ওরা তো অনেক ছোট বলে মনে হ'ল।

-- হ্যাঁ, আমি জানতামই না ওদের এনে রেখেছে কাসেম।

-- তুমি জানতে না?

-- না ।

--কাসেম তোমার অনেক উপকার করে দিল। এবারে এর পদোন্নতি হোক।

-- ও চারজনকে এনেছিল। তাদের মধ্যে দুজনকে ওকে দিয়েছি। দেখলাম তারা

ওকে খুব ভালবাসে। অনেকদিন তাদের দেখাশোনা করেছে। আমাকে জানায় নি। ওই দু'জনার একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সুতরাং পদোন্নতির চেয়ে বেশী পেয়ে গিয়েছে।

-- তুমি ওকে দিয়ে দিলে? ছিনিয়ে নিলে না?

-- ছিনিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি।

-- তা অবশ্য ঠিক। নারী হলেই হ'ল। সুন্দর অসুন্দরের বাছবিচার উগ্র প্রবৃত্তির কাছে চাপা পড়ে যায়।

-- তুমি একটু বেশী বিচলিত। স্বাভাবিক। তবু ওদের কক্ষে প্রথমবার যাওয়ার আগে তোমাকে জানিয়ে যেতে এসেছি।

-- এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে?

-- জানিনা। হয়ত অপমান।

-- ওদের একটা করে নাম আছে? আমিও ডাকতে পারি। কথা বলতে পারি। মেয়েদের কৌতুহল---

--নিশ্চয় আছে। তাহলে তো ওরা নিজেদের ভাগ্যবতী বলে মনে করবে।

-- নাম কি?

-- দুটো নাম বলেছে কাসেম। কার কি নাম আজ জেনে নিতে হবে।

-- কি কি নাম?

-- নন্দা আর পার্বতী। নামের অর্থ আছে নিশ্চয়।

-- ওরা হিন্দু?

-- হতে পারে। ঠিক জানি না।

-- হিন্দু হলে নামের অর্থ আছে।

-- ওই অর্থের প্রয়োজন হবে না। কারণ যার নাম পার্বতী, এখন থেকে সে হবে রাজিয়া, আর যার নাম নন্দা তাকে ডাকা হবে রেহানা বলে।

--বাঃ, এই নামের মধ্যে তোমার হৃদয়ের স্পর্শ রয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

সুলতান বুঝলেন, বেগমের এখন বিক্ষিপ্ত মন। খুব স্বাভাবিক। তিনি কক্ষ ত্যাগ করেন।

বেগম আকু[illegible] কাঁদতে থাকেন। এতক্ষণ সুলতানের সামনে সমস্ত আবেগ সংযমের বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। তিনি চলে যেতে বাঁধ ভেঙে গেল।

অনেকের পরামর্শ, এমনকি নিজ পুত্র ফিরোজের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও সুলতান দোয়াবের কৃষক ও কৃষিজীবীদের ওপর খাজনার বোঝা সহসা দ্বিগুণ করে দিলেন। উপায় ছিল না । তাঁর অনেক হঠকারিতার বোঝা বইতে বইতে অর্থ ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত।

দৌলতাবাদ, নামে রাজধানী হলেও কার্যতঃ অধিকাংশ সময় তিনি দিল্লীতে বসে শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। আমীর ওমরাহেরা তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে রয়েছে। ওদিকে তাদের স্ত্রীপুত্র পরিজন পড়ে রয়েছে সেই দৌলতাবাদে। এক বিশৃঙ্খল অবস্থা চারদিকে। তিনি দেখলেন পূর্ব কিংবা দক্ষিণ ভারত থেকে অর্থ প্রাপ্তির আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। তাই সহজতম পন্থা হল উর্বরা দোয়াব অঞ্চলের কৃষিজীবীদের ওপর চাপ দিয়ে অর্থভাণ্ডার কিছুটা পূর্ণ করা। প্রজারা অনেক সয়। কৃষকরা তো আরও সহনশীল। তারা প্রতিবাদ করার উপায়ও জানে না, পন্থা পদ্ধতিও জানে না। তবু সহ্যের একটা সীমা রয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক যেখানে খাজনার পরিমাণ নিৰ্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন শতকরা দশ ভাগ, সেখানে তিনি করলেন শতকরা বিশভাগ। ফলে, যে সমস্ত রায়ত দুর্বল, তারা বলতে গেলে ধ্বংস হয়ে গেল। যারা তাদের চেয়ে একটু সবল তাদেরও মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। আর বাকীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এমনিতেও মরতে হবে, ওমনিতেও মরতে হবে। তাদের বিদ্রোহের খবর শুনে দেশের অন্যান্য অংশের কৃষিজীবীদেরও টনক নড়ল। তারা বুঝতে পারল তাদের ভাগ্যেও ওই একই দশা হতে চলেছে। ঘুঁটে পুড়ছে দেখে গোবর হয়ে হেসে লাভ নেই। খেয়ালী সুলতানের মাথায় নতুন দুষ্ট বুদ্ধি গজিয়েছে। সুতরাং অস্ত্র নাও, সুলতানের লোকজনদের ওপর যত্রতত্র আক্রমণ চালাও। সিপাহী দেখলে মেরে ফেলো, শস্যভাণ্ডার লুট কর।

পুত্র ফিরোজ এসে বলে-- এ আপনি কী করলেন? ইচ্ছা করে আগুন জ্বালালেন? এবারে পুড়তে হবে।

--পুড়বে কেন? ওদের দমন কর।

--আপনার কত সেনা রয়েছে যে সারা দেশকে দমন করবে?

--তাও করা যায়। আমি দরবারে ডাকছি সবাইকে।

সেইদিনই দরবার বসল। দেশের সব অঞ্চলের শাসন কর্তাদের খবর পাঠানো হ'ল হুঁশিয়ার থাকতে, কোন বিক্ষোভের আঁচ পেলেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে।

আমীর মালিক আলম বলে-- খোদাবন্দ, বিক্ষোভ কঠোর হাতে দমন করতে গেলে বিপরীত ফল হতে পারে। তার চেয়ে ওদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা মনে হয় ভাল।

দরবারে যেন বজ্রপাত হ'ল। সুলতান তার দিকে জ্বলন্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন-- তাহলে আপনি দোয়াবে যান মালিক আলম।

--দোয়াবের কথা স্বতন্ত্র। তারা এখন কিছুই বুঝতে চাইবে না। অন্যত্র একটু নরম হলে ফল ফলতে পারে।

--আপনাকে যখন একবার বলেছি দোয়াবে যেতে তার নড়চড় হবে না। কালই রওনা হন।

মালিক আলমের জন্য অনেকে দুঃখবোধ করে। সে সৎপরামর্শ দিতে গিয়েছিল

সুলতানকে। দোয়েবর মধ্যে সে এতদিন দেখেও সুলতানকে চিনতে পারেনি। তাঁর সব কথায় সম্মতির ঘাড় নাড়া ছাড়া অন্য কিছু করতে গেলেই বিপদ। আলম তাই করতে গিয়ে ফেঁসেছে।

সুলতানজাদা ফিরোজ বলে--ওঁর সঙ্গে আমাকেও পাঠান।

-- তুমি!

-- হ্যাঁ। কাজটা গুরুভার। তাই আমি গেলে ওঁর পক্ষে সহজ হবে। আমি গিয়ে প্রথমেই বলব যে তাদের খাজনা কমিয়ে আবার দশ শতাংশ করা হয়েছে।

সুলতানের মুখ লাল হয়ে ওঠে নিমেষের জন্য। কিন্তু বক্তা স্বয়ং তাঁর পুত্র। তাই গম্ভীর হয়ে বলেন-- টাকা আসবে কোথা থেকে ?

-- জানিনা। এই মুহূর্তে জানা সম্ভব নয়। তবে সমস্ত দেশ শান্ত হবে ধীরে ধীরে এই ঘোষণার পরে।

মনে মনে আমীর ওমরাহেরা ফিরোজকে বাহবা দেয়। সদ্য তরুণের মস্তিষ্ক বেশ পরিণত এটা তারা বুঝতে পারে।

--বেশ । তুমি যখন ভবিষ্যৎ সুলতান তখন তোমার মতবাদকে মর্যাদা দিতেই হবে। আমাকে ভেবে দেখতে দাও।

খুব তাড়াতাড়ি সেদিন দরবার শেষ হয়ে যায়।

দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে অনেক প্রজা সুলতানের অনেক কর্মচারী ইতিমধ্যে প্রাণ দিয়েছে। ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে। যেখানে বীজ বপনের কথা সেই ক্ষেত অকর্ষিত থেকে গিয়েছে। সবাই আতঙ্কিত যে কিছুদিনের মধ্যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়বে সেই অঞ্চল। ঠিক এই সময় পুত্র ফিরোজ আর মালিক আলমের কথা গ্রাহ্য করে সুলতান দমন নীতি থেকে সরে আসায় বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এল ধীরে ধীরে। কেউ অশান্তি চায় না। খেয়ে পরে শান্তিতে জীবন কাটাতে চায়। এমনিতেই তা হয়ে ওঠে না। তার ওপর সুলতান যদি অবস্থা না বুঝে খেয়ালের বশে অশান্তির সৃষ্টি করেন, তাহলে তাঁর ওপর কারও শ্রদ্ধা থাকে না। আস্থাও থাকে না।

চাষীরা আবার লাঙল কাঁধে তুলে নিল। বলদের দড়ি ধরে টানল।

দিল্লী যেন বিষাদ-নগরী। একে রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম। তার ওপর সুলতানের সঙ্গে যারা এসেছে তারা সব সময় মন-মরা। একা একা বিশাল বিশাল অট্টালিকায় তিনচার জন করে উচ্চপদের কর্মচারীরা থাকছে। এক কালে তারা যে বাড়িতে থাকত, যে বাড়ি তাদের অনেকের পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটা সেগুলো খাঁ খাঁ করছে। আশেপাশের অধিবাসীরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ,তারা নিজেদের বসত বাটির জন্য এই সব বাড়ির মালমশলা অবাধে কাজে লাগিয়েছে। নইলে সেগুলো উধাও

হয় কি করে? রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে এরা অনেক দীঘি ও কূপ খনন করেছে। সুলতান নিজেও অনেক ক্ষেত্রে গিয়ে দেখে এসেছেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ পথচারীদের জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমীর ওমরাহদের গাত্রদাহ হয়। নিজেদের শৈশব যেখানে কেটেছে সেই সব স্থান জনশূন্য। তারা তো অনেকের মত দু এক পুরুষের আরব, তুরস্ক আর পারস্য থেকে আসা নবাগত নয়। তারা বেশ কয়েক পুরুষের। এদেশের জল হাওয়া মাটি তাদের মজ্জায় মজ্জায়।

তারা একদিন দরবারে কথাটা উত্থাপন করে। যে মালিক আলমকে সুলতান একদিন দোয়াবে পাঠাবেন বলে শাসিয়েছিলেন, সে আবার স্বভাবদোষে বা গুণে সুলতানকে ফস্ করে বলে ফেলে-- মেহেরবান, এখন তো বলতে গেলে রাজধানী হিসাবে দৌলতাবাদের কোন ভূমিকা নেই। দিল্লী আবার তার প্রাধান্য পাচ্ছে। শুধু শুধু এতদিন আমরা এই বয়সে একা একা কি করে পড়ে থাকি ? আমাদের সবাইকে দৌলতাবাদে নিজেদের পরিবারের মধ্যে ফিরে যেতে অনুমতি দিলে আমরা আপনার কাছে এমনিতেই ক্রীত রয়েছি, আরও কৃতজ্ঞ থাকব। আর সেটা যদি একান্তই অসম্ভব হয় তাহলে তাদের এখানে নিয়ে অসার ব্যবস্থা করতে বললে বাকী জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

সুলতান কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে মালিক আলমের দিকে চেয়ে রইলেন। সে বুঝল পাশার চাল চেলে ফেলেছ, ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। কপালে যা ঘটে ঘটুক। তার এই মুখ ফসকে কথা বের হয়ে যাওয়ার স্বভাবের জন্য সবাই তাকে বারবার সাবধান করেছে। দোয়াবের বেলায় ফিরোজ বাঁচিয়েছিল। তার আগে একবার এই স্বভাবের জন্য এক রাতের মধ্যে রওনা হতে হয়েছিল বিহারে। আর একবার হিমালয়ের পাদদেশে। তবু স্বভাব না যায় মলে।

সবাই দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে আর মনে মনে মালিক আলমকে অভিশম্পাত দিয়ে চলে। তারা লক্ষ্য করে সুলতান এখনও আলমের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তবে সেই দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা যেন হ্রাস পেয়েছে। কেমন যেন ভাসা ভাসা। মনের মধ্যে যেন অন্য চিন্তা।

সুলতান মালিক আলমকে তাঁর নিকটে ডাকেন। সবাই ভাবল, হয়ে গেল। আলমের পা কাঁপে। সে ধীরে ধীরে সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

— কতদিন এখানে আছেন?

সুলতান কখনো আমীর ওমারহদের খুব সম্মান দেখান আবার কখনো তাদের সঙ্গে অতি সাধারণ স্তরের সিপাহীদের মত ব্যবহার করেন। সব নির্ভর করে তাঁর মর্জির ওপর।

--দু'বছর পার হয়ে গেল।

--আমারও তো তাই।

মনে মনে ভাবে আলম, কার সঙ্গে কার তুলনা। আপনার পুত্র রয়েছে। বেগম ছাড়াও দু'জন নতুন সুন্দরীকে নিয়ে এসে তো দিব্যি আছেন। মুখে বলে--হ্যাঁ মেহেরবান।

সুলতান একবার দরবারের সবার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলেন। তারা তাঁর চোখে যাতে চোখ না পড়ে তার জন্য যতগুলো কৌশল জানা আছে সব প্রয়োগ করে। তবু সুলতানের কাছে তাদের মনোভাব স্পষ্ট হয়।

তিনি মালিক আলমকে জিজ্ঞাসা করেন-- এখানে আপনার নিজস্ব বাড়ি আছে?

-- একটা ছিল। কিন্তু আপনি মূল্য ধরে দিয়েছেন কিছু, আর দৌলতাবাদে গৃহনির্মানের জন্য সাহায্য করেছেন। সুতরাং ঐ বাড়ি নিজের বলে দাবী করি কি করে।

--আপনার পুরোনো বাড়ি আপনি ফিরে পাবেন। পরিবারের সবাইকে গিয়ে নিয়ে আসুন।

দরবারে বিরাট আলোড়ন শুরু হয়। মালিক আলম একা সুযোগ পেয়ে গেল। উল্টোপাল্টা বললে মাঝে মাঝে কাজেও লেগে যায় দেখা যাচ্ছে।

সবাই কিছু বলার জন্য উস্‌খুস্‌ করে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

সুলতান তাদের দিকে চেয়ে বলেন-- আপনাদের কারও কিছু বলার আছে?

সবাই সব কিছু ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে কথা বলে ওঠে। সুলতান প্রচণ্ড ধমক দিতে সবাই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে বসে পড়ে।

সুলতান বলেন--সবার লোকজনই ফিরবে। একে একে। আইয়াজ, তুমি একটা ফর্দ তৈরী কর তো। তুমি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। তুমি খাজা জাহাঁ হয়েও দৌলতাবাদে পড়ে ছিলে। সবে এসেছ। সেই থেকে দেখি তোমার মুখে হাসি নেই। ব্যাপার কি বল তো?

মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজ কোন কথা বলতে পারে না। তার পুত্রদ্বয়ের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে নাসরিনের কথা।

-- যা হোক, এক মাসের মধ্যে সব পরিবারকে একে একে নিয়ে এস। তুমি ব্যবস্থা কর।

সবাই বুঝল, দৌলতাবাদকে নতুন রাজধানী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন টুটে গিয়েছে সুলতানের। নিজের ব্যর্থতা কার্যত তিনি মেনে নিলেন। কিন্তু এর ফলে কত যে সর্বনাশ গোচরে অগোচরে ঘটে গিয়েছে তার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না কোনকালে।

দৌলতাবাদে যখন সংবাদটা গিয়ে পৌঁছলো, তখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। যাদের শৈশব আর যৌবন দিল্লীতে অতিবাহিত হয়েছে, তাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তাদের চোখের সামনে আগের স্মৃতিগুলো ভেসে ভেসে ওঠে। কোন্ রাস্তায় কোন্ বাড়ি, কোন গাছ কোথায় দাঁড়িয়ে থাকত, কোন্ মরশুমে কোন্ ফল কোথায় ফুটে থাকত সব মনে পড়ে তাদের। কত স্মৃতি বিজড়িত ওই দিল্লী শহর। আবার তারা সেখানে ফিরে যেতে পারবে। এতদিন তারা যেন নির্বাসিত ছিল কোন গুরুতর অপরাধ করার জন্য।

কিন্তু অল্প সংখ্যক অন্য কিছু মানুষ আছে, যাদের এখনো পরিপূর্ণ মানুষ বলা ঠিক হবে না, কারণ তাদের কেউ রয়ে গিয়েছে বাল্যাবস্থায়, কেউবা সবে কৈশোর কিংবা যৌবনে পা দিয়েছে। তারা দৌলতাবাদকে ভালবেসে ফেলেছে শৈশব থেকে দেখতে দেখতে। এখানকার জলবায়ুর সঙ্গে তাদের সখ্যতা। দিল্লী তাদের কাছে অপরিচিত। যারা বাল্যাবস্থায় এখানে এসেছে তাদেরও দিল্লীর ওপর তেমন আকর্ষণ নেই। সুলতানের নতুন হুকুমের কথা শুনে তারা মনঃক্ষুন্ন হয়। এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্থানটি ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরকালের জন্য। অনেকে আছে যারা সুলতানের কর্মচারী নয়, তাদের সংখ্যা তুলনায় অনেকগুণ বেশী। তারা এককালে দিল্লীর সাধারণ নাগরিক ছিল। সুলতানের হুকুম তাদের এখানে চলে আসতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এখন তো ফিরে যাওয়ার জন্য জুলুম নেই। তাদের মধ্যে অনেকে ঠিক করেছে, আর দিল্লী নয়, এখানেই থেকে যাবে বংশ পরম্পরায়। বিশেষ করে যারা এখানে এসে তাদের পিতা মাতা এবং অন্যান্য প্রিয়জনদের হারিয়েছে। সেই সব মৃতেরা শায়িত রয়েছে পাশের বিস্তীর্ণ গোরস্থানে। তাদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলে নতুন করে আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা বুকে বাজবে। তার চেয়ে কাজ নেই দিল্লীতে গিয়ে। সুখে দুঃখে জীবিত মৃত সব প্রিয়জনদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাল।

যারা চলে যাচ্ছে, তাদেরও কি প্রাণ কাঁদছে না? তারা কি শুধু শুধু বিনা কারণে বারবার সমাধিস্থলের দিকে যাচ্ছে? মা হয়ে ওই এক টুকরো জমির নীচে সন্তানটিকে কি করে ফেলে রেখে যাবে? শত অশ্রু বিসর্জনেও কি শান্তি পাবে সে? তবু যেতে হবে। তেমনি পত্নী হয়ে স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া কি অত সহজ? সেই স্বামী মাটির নীচে শুয়ে রয়েছে বলে কি সম্পর্ক চলে গিয়েছে? স্বামীর সেই স্পর্শ, সেই সুখানুভূতি কি ভুলে যাওয়ার? তবু চলে যেতে হচ্ছে, কারণ স্বামীর দেওয়া উপহার একমাত্র পুত্রটি সুলতানের অধীনে নতুন কাজ পেয়েছে দিল্লীতে। তার ভবিষ্যৎ রয়েছে , সেই ভবিষ্যৎকে কি জলাঞ্জলি দেওয়া যায়? স্বামীকে ছেড়ে তাই পুত্রের সহযাত্রী হতে হচ্ছে।

কত শত প্রদীপ জ্বলল সমাধিস্থলে। কত অশ্রুজলে ধৌত হ'ল পাষাণ-বেদী। কিন্তু মানুষের অশ্রুর কি শেষ আছে? অশ্রু বিসর্জনের জন্যই এই দেহের সৃষ্টি। সারা জীবনে

হাসির ভাগ আর কতটুকু? আসলে হাসি ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী। মানুষের মুখে যে হাসি সবাই দেখে সেই হাসির আড়ালে অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত ঘটে চলেছে। বাইরে থেকে কেউ টের পায় না। নিজের প্রিয়জনেরাও নয়।

সুদূর দিল্লী থেকে বৎসরান্তে একবার এখানে এসে আপনজনের কবরের পাশে বসা, তার সঙ্গে নীরবে নিভৃতে কথা বলা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? হয়ত সুযোগ পাবে আটদশ বছর পরে। অধিকাংশ মানুষ একবারও সুযোগ পাবে না জীবনে। দিল্লীতে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে শুধু। সেই দীর্ঘশ্বাসের এত জোর নেই যে দৌলতাবাদে পৌঁছে প্রিয়জনের কবরের ওপরের তৃণে একটু কাঁপন ধরাবে।

তবে কিছু কিছু সমাধি রয়ে গেল এখানে, যেখানে আত্মীয় অনাত্মীয় অনেকে আসবে। এখানে রইল আমীর খসরুর সঙ্গী কবি আমীর হাসানের সমাধি। রইল শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য শেখ বারহানউদ্দিন গরীবের সমাধি। এখানে নিদ্রিত রইলেন কাজী সরফউদ্দিন। আরও অনেকে রইলেন যাঁদের সমাধিস্থল দেখতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসবে বিনম্র চিত্তে তীর্থ যাত্রীর মত। সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মহম্মদ বিন তুঘলকের উদ্দেশ্য সফল। তাঁর স্বপ্ন সার্থক।

সবার পরিবার এল। এল মালিকজাদা আইয়াজের দুই পুত্র , পত্নী এবং নাসরিন। সুলতান নিশ্চিন্ত হয়ে এবারে শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের দিকে মনোনিবেশ করলেন। দেশে অশান্তি চিরকাল থাকবে। বিদ্রোহ এদিক ওদিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। তাই বলে রাজধানীর উন্নতি থমকে থাকবে না। থমকে থাকার একই অর্থ— সাম্রাজ্যের দুর্দশা। রাজধানী হ'ল দেশের মুখচ্ছবি। পর্যটকরা রাজধানীতে এসে দেশের নাড়ির গতিক বুঝতে পারে। অল্প কিছুদিনের জন্য দৌলতাবাদে গিয়ে শহরটিতে রূপসী করে তুলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত থাকতে পারলেন না। এবারে দিল্লীকে সজ্জিত করে তুলে আপশোষ মেটাবেন।

সুলতানের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অন্যের অন্যায় যেমন সইতে পারেন না, নিজেও তেমনি অন্যায় করেন না। তাই তিনি আদিল। তিনি শহরের প্রান্তে কেল্লা নির্মান শুরু করলেন। স্থানটির নাম হল আদিলাবাদ। ওদিকে নির্মিত হতে থাকল সহস্র স্তম্ভ যুক্ত বিরাট অট্টালিকা। নাম তার হাজার সুতুন। সুলতানের কেন যেন মনে হতে থাকে জীবনে যত কিছু করার ছিল কিছুই হ'ল না। হয়ত অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই একটি মসজিদ নির্মাণে ব্রতী হলেন। সবার মুখে মুখে তার নাম হ'ল বেগমপুরী মসজিদ। দেশে কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে। তিনি কয়েকটি শস্যভাণ্ডার নির্মাণ করলেন যেখানে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখা যায় অসময়ের জন্য। এগুলোকে প্রয়োজনে অস্ত্রাগারেও পরিবর্তিত করা যাবে।

এত কিছু করেও মনে শান্তি নেই। আর মন অশান্ত হয়ে উঠলে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারী তক্তা-চাপা তার পিতার সেই মুখ। যন্ত্রণায় চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি সেভাবে অভিশাপ দিতে পারলেন না নিজের প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু যেটুকু বলতে পেরেছিলেন ততটুকুই তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাঁকে সেদিনের পর থেকে।

এই রকম তাড়া খেয়ে একদিন অস্থির হয়ে সব কিছু ভুলে যাওয়ার জন্য প্রবেশ করেছিলেন হারেমে করাচিল-সুন্দরীর কক্ষে। সময়টা অসময় বলা যেতে পারে। দরবার শেষ হওয়ার একটু পরেই। কারণ হ'ল, বজ্রপাত। অতি নিকটে কোথাও বজ্রপাত হয়েছিল। দরবার চলাকালে নিমেষে সেই শব্দ তাঁর চোখের সম্মুখে হাজির করেছিল সেই বীভৎস দৃশ্য। তাঁর দম আটকে আসছিল। প্রথমেই মনে পড়েছিল পুত্র ফিরোজের জননীর কথা। কিন্তু বেগমের সঙ্গে তো সেই সম্পর্ক আর নেই। করাচিল সুন্দরীরা আসার পর থেকে প্রায় বিচ্ছেদের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। পিতার মৃত্যুর আগে থেকেই বেগমের মুখে সব সময় একটা ভর্ৎসনার রেখা ফুটে থাকতে দেখতেন। খুব খারাপ লাগত।

বেগমের কক্ষে প্রবেশ না করে তাই তিনি আরও এগিয়ে করাচিল সুন্দরীদের একটিতে প্রবেশ করেন। কক্ষটি নন্দার অর্থাৎ রেহানার। স্বয়ং সুলতানকে প্রবেশ করতে দেখে বেগম কি করবে ভেবে পায় না। একবার ভাবে ছুটে গিয়ে কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানায়। কিন্তু সুলতানের বিষাদাক্রান্ত মুখ দেখে বুঝতে পারে সেটা শোভনীয় হবে না। কিন্তু কিভাবে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত? ক্ষণেকের জন্য বুঝতে পারে না। এমন অসময়ে তো তিনি আগে কখনো আসেন নি। হারেমে থাকতে হলে আদব কায়দার কিছু প্রয়োজন আছে বৈকি। সেই সব শেখাতে একজন রমনীও নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু যেদিন মহম্মদ বিন তুঘলকের বেগম প্রথম তাদের দৌলতাবাদের হারেমে প্রবেশ করতে দেখেছিল সেই দিনই ওই রমনীকে বলে রেখেছিলেন, দুই সুন্দরীকে যেন কোন কিছু শেখানো না হয়। তারা যেন বন্য থাকে, যাতে অহরহ সুলতানের মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়। অসূয়া বেগম জানেন, বংশ মর্যাদায় করাচিল রমনীদের চেয়ে তিনি অনেক উঁচুতে। কারণ ওরা পাহাড়ের নারী। ওদের বংশ পরিচয় বলে কিছু নেই। তবু একটি বিষয়ে তারা বেগমকে অনেক বেশী ছাপিয়ে গিয়েছে। তাদের তাজা যৌবন রয়েছে, আর রয়েছে রূপ। বেগম তাদের ভালভাবে দেখেছেন আর মনে মনে জ্বলেছেন। দেহের ত্বক তাদের অসাধারণ মসৃণ এবং কোমল। মনে হয় ত্বকের নীচ থেকে একটা গোলাপী আভা ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অবাক হয়ে দেখতে হয়। পুরুষের এই সৌন্দর্যের মোহে পড়তে এক মুহূর্তও সময় লাগে না। তাই তারা যাতে তাদের আচার-আচরণে সভ্য হয়ে না ওঠে তারা যাতে অজ্ঞাতে সুলতানের মনে সর্বদা

বিরক্তি আর ঘৃণার সৃষ্টি করে সেই ব্যবস্থা করতে তিনি তৎপর হন এবং হারেমের সেই রমনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওরা যেন তরিবতের ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায়।

বেগম সাহেবা একটি বিষয় বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন , কিংবা আদৌ জানেন কিনা সন্দেহ যে এই দুই রমণী পাহাড় ছেড়ে চলে আসার পরে দু'এক বছর যখন তাদের দৌলতাবাদের গোপন আস্তানায় রাখা হয়েছিল তখন তারা ছিল খোদ মালিক কাসেমের তত্ত্বাবধানে। উচ্চবংশীয় মালিক কাসেম তাদের তখন অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে সব রকমের আদব কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিল। ফলে প্রথম দর্শনেই তাদের চারজনের সঙ্গে কথা বলে সুলতান মোহিত হয়েছিলেন।

রেহানাকে দেখে সুলতানের মন ভরে ওঠে। তার ভেতরে আজ যেন তিনি হিমালয়ের স্নিগ্ধতার পরশ অনুভব করেন। তার কথার আরও উন্নতি হয়েছে।

-- তোমাদের দু'জনকে দেখে এখনো নাম গুলিয়ে ফেলি। আসলে তোমাদের পৃথকভাবে ভাবতে ইচ্ছা করেনা। অথচ তুমি নিশ্চয় রেহানা।

--হ্যাঁ মেহেরবান।

--আমারই দেওয়া নাম ভুলে যাই। ইচ্ছা থাকলেও কতটুকুই বা আসতে পারি তোমাদের কাছে।

-- তাতে কি? যতটুকু আসেন, তাতেই আমরা কৃতার্থ।

--এত অল্পে?

--হ্যাঁ সুলতান।

--ওকে ডাকবে এখানে একবার?

--আপনার মর্জি।

--রাজিয়াকে ডাকলে তোমার কি ভাল লাগবে?

-- আমরা পাহাড়ের মেয়ে। সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে আমাদের সুখ হয় বেশী।

--সুন্দর বলেছ। আচ্ছা আমি কেন তোমার কাছে এসেছি আজ বলতো?

-- আনন্দ পেতে।

-- সে তো নিশ্চয়। দুঃখ পেতে কেউ আসে নাকি ? সে কথা নয়। অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।

--মনের মধ্যে অনেক দুঃখ, অনেক জ্বালা জমা রয়েছে , তারই কোনটি আপনাকে বিচলিত করেছে। তাই ভুলতে এসেছেন।

সুলতান অবাক বিস্ময়ে নন্দার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। পরে বলেন--কি করে জানলে?

--একথা জানতে হয় না সুলতান। আমাদের দেশের সব মেয়েরাই জানে। ওদেশের

পুরুষদের কত পরিশ্রম করতে হয়, কত কষ্ট করতে হয়। তাদের তাজা রাখা তো মেয়েদেরই কাজ।

-- কী সরল ব্যাখ্যা। আর কত বড় সত্য। আচ্ছা আমাকে তোমার কেমন বলে মনে হয়?

--আপনি এতবড় দেশের সুলতান। আপনাকে কেমন মনে হবে আবার? কারও মনে হওয়াতে আপনার কিছু এসে যায় না। আমি অতি ক্ষুদ্র। আপনাকে বিচার করব কি করে?

--তবু তোমাদের অন্য দুই সখীদের দেখেছি । তারা কাসেমকে পেয়ে কত সুখী। তাকে কত ভালবাসে তারা। দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল, আবার দুঃখও হয়েছিল।

--কেন সুলতান? দুঃখ কেন?

--ওভাবে কেউ যদি আমাকে ভালবাসত।

--কেউ আপনাকে কখনো ভালবাসেনি?

সুলতান একটু থেমে উদাস হয়ে গিয়ে বলেন-- হ্যাঁ, একজন বেসেছিল বটে। শুধু একজন।

-- সে কোথায়?

-- তোমরা যেমন আমাদের দেশে চলে এসেছ, সে তেমনি তোমাদের দেশের দিকে চলে গিয়েছে।

--আমাদের দেশে? কেন সুলতান? বাধা দিলেন না কেন? হুকুম করলেন না কেন?

--কাকে হুকুম করব রেহানা? তুমি পাগল হলে? সে আমাকে গভীর ভাবে ভালবেসে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। সে আমার আয়ত্তের বাইরে। সে আকাশের চাঁদ। আমি তো মানুষ।

--একমাত্র সে-ই আপনাকে ভালবেসেছিল?

--হ্যাঁ , শুধু সে। আর কেউ নয়। আমার যিনি আসল বেগম তাঁর প্রথম যৌবনের ভালবাসায় উন্মাদনা ছিল। সেটা রক্তমাংসের ভালবাসা।

রেহানা অবাক হয়ে শোনে। তার চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি ঝরে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। বলে-- আপনি বড় দুঃখী।

--হ্যাঁ, রেহানা। তোমাদের দু'জনার একজন অন্তত আমাকে ভালবাস!

--আপনি বিরাট। আপনাকে ভালবাসা কি আমাদের মত সামান্যার পক্ষে সহজ কথা? আপনি যদি আমাদের মত সাধারণ হতেন তাহলে জানি চোখ বুঁজে ভালবেসে ফেলতাম।

--পারবে না তাহলে?

--আমি চেষ্টা করব। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমি বুঝতে পারছি আপনার মনে

অনেক দুঃখ, অনেক জ্বালা। আমি চেষ্টা করব। বোধহয় পারব। আমি যদি না পারি পার্বতী পারবে। আমাদের দু'জনার মধ্যে একজন ঠিক পারবে।

সুলতান দেখলেন, মেয়েটির মধ্যে কোন ভণিতা নেই। সরল এবং স্পষ্ট কথা বলে। তাঁর খুব ভাল লাগল। একটা নতুনত্বের স্বাদ পেলেন তিনি। তাতে মন প্রফুল্ল হল। বুঝলেন এদের কাছে আসা নিরর্থক নয়। তিনি কোনদিন যা করেননি, তাই করলেন। রেহানার পাশে অতি ঘনিষ্ঠভাবে বসে তার দেশের কথা শুনতে চাইলেন। তাদের জীবন যাপনের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা। শুনে মন হালকা হ'ল। বুঝলেন তিনিও আসলে মানুষ। অন্য কিছু নন।

বেশ কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের হঠাৎ একদিন নজরে পড়ে যায় যে তাঁরই প্রায় সমবয়সী উজির মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজের শ্মশ্রু অনেকটাই শ্বেতবর্ণের।

— তুমি বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছ দেখছি উজির।

—বয়স তো হ'ল।

—তুমি প্রকারান্তরে বলতে চাও আমারও বয়স হয়েছে।

—সেই স্পর্ধা আমার কি আছে? আপনি চির-যুবা।

—তোষামোদ তুমি মালিক কাসেমকে হার মানালে।

মালিক কাসেম উপস্থিত ছিল। সে বলে ওঠে —আমি উজির না হতে পারি, তবে আমার বুদ্ধি অপরিণত নয়।

—অর্থাৎ তুমি আমাকে চির-যুবা বলতে না।

—কখনই নয় সুলতান। উজিরের মত আপনার শ্মশ্রু সাদা না হলেও দেখতে আপনাকে আরও বয়স্ক বলে মনে হয়। উজির তো যুবা। মনে কত স্ফূর্তি। এই বয়সে এত স্ফূর্তি কোথা থেকে আসে জানিনা। আল্লার কৃপা বোধহয়।

যারা উপস্থিত ছিল তারা বুঝল সুলতানের বেশী প্রিয়পাত্র রূপে নিজেকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কাসেম মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। সাপের ল্যাজে পা দিয়েছে।

কিন্তু সুলতান কিছুই বললেন না কাসেমকে। তার মুখ বিষণ্ণ দেখাল। তিনি বলেন— কাসেম ঠিক বলেছে। তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ হচ্ছে, আমার জীবন-রস নিঃশেষিত প্রায়, কিন্তু তোমার রসধারা এখনো প্রবাহমান। রহস্যটা কি আইয়াজ? আমি যদি পাপী হই। তুমিও পাপী সন্দেহ নেই।

কথাটা শুনে আইয়াজ মুহূর্তের মধ্যে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কেউ না বুঝলেও সুলতান বুঝলেন তার মুখে এতক্ষণ যে আলো ঝলমল করছিল সহসা তা নির্বাপিত হ'ল।

ধীরে ধীরে সে বলে—আপনি সত্য বলেছেন খোদাবন্দ। আমিও পাপী। দুনিয়ায় কে

নয়? কম বেশী সবাই। আমি পাপের জন্য অনুতপ্ত। আমি আমার সমস্ত পাপের কথা একজনের কাছে অকপটে স্বীকার করি। সেই একজন অদৃশ্য কেউ নয়। সেই একজন আমার মত রক্তমাংসের এক মানবী, যে আমাকে ভালবেসেছে। হয়ত এই জন্যই আমার পাপের উত্তাপ অসহনীয় হয়ে ওঠেনা। আপনাকে প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে ভালবাসার নারীর নিশ্চয় অভাব নেই। তাঁর কাছে আপনার সমস্ত ভাল সমস্ত ক্লেদের কথা উজাড় করে বলেছেন কিনা জানি না।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে এবারেও সুলতান কিছু বলেন না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যান। সবাই বুঝল, সত্যই সুলতান দেশের ভারের সঙ্গে বয়সের ভারও আজকাল অনুভব করতে শুরু করেছেন। আজকের মত তাঁকে আগে কখনো এমন শান্ত হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়নি। আজ তাঁর অধীনস্থ দুই কর্মচারী যেভাবে তাঁর কথার জবাব দিল কিছুদনি আগে হলেও ঝড় বয়ে যেত। দু'জনার গর্দান যেত কিনা বলা যায় না, তবে তারা উভয়েই রাজধানী থেকে কোন সুদুর সীমান্ত অঞ্চলে স্থানান্তরিত হ'ত, সপরিবারে।

সুলতানকে ওভাবে নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে দেখে মালিক কাসেমের প্রাণ কাঁদে। সে সত্যই সুলতানকে নিবিড়ভাবে চেনে।

সে বলে– গোস্তকী মাপ করবেন খোদাবন্দ। ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলেছিলাম। আসলে এই বিশাল দেশের সব চেয়ে গুরু দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তাই আপনাকে অমন দেখ য়। আপনি প্রাজ্ঞ। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এই সংসারে যাদেব ওপর কোন দায়িত্ব নেই আচাব ব্যবহারে কথায় বার্তায় তারা বালক থেকে যায়। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রায় একই বয়সের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পদে কাজ করলে সেই পদ অনুযায়ী তাদের গাম্ভীর্য, তাদের চালচলন তৈরী হয়। সবচেয়ে নিম্নতম পদের নোকরি যার তাকে সবচেয়ে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়।

সুলতান বলেন– এত কথার প্রয়োজন ছিল না কাসেম। তোমার ওপর আমি বিরক্ত হইনি।

– আমি কিন্তু সত্য ভেবে বলেছি।

সেই সময় একজন প্রহরী এসে উজিরকে বলে যে দৌলতাবাদ থেকে এক ব্যক্তি তার তরুণ পুত্রকে নিয়ে এসেছে সে সুলতানের দর্শনপ্রার্থী।

কথাটা সুলতানকে বলা হয়। লোকটা দৌলতাবাদ থেকে এসেছে শুনে কৌতুহলী হয়ে তিনি ডেকে পাঠান।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি এসে সুলতানকে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সুলতান লক্ষ্য করেন লোকটি বেশ সপ্রতিভ। তার পুত্রটিও এক কথায় সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান।

– কি চাই তোমার?

-- মেহেরবান, এককালে আপনি আমাকে চিনতেন। ওয়ারঙ্গল অবরোধের সময় আমি নিয়মিত দিল্লীর ডাক আপনার হাতে পৌঁছে দিতাম।

-- তাই নাকি? খুশী হলাম শুনে। আজ কেন এসেছ?

—আমার তখনো সাদি হয়নি। একটি মেয়ের সঙ্গে সাদি ঠিক ছিল। আপনার একজন সেনাধ্যক্ষ এক সন্ধ্যায় আমার বিবিব মাকে হত্যা করেছিল। সে আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে ভাগ্যক্রমে আমি আপনার ডাক পৌঁছে দিতে এই পথে আসছিলাম। আমি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করি। তার নাম ছিল মালিক কিববিয়া।

-- হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার নাম?

—হাসান।

—দৌলতাবাদে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে?

—হ্যাঁ হুজুর। সেখানে আমি যথেষ্ট উন্নতি করেছি কিছুদিনের মধ্যে। কোতোয়ালের পদ পাওয়ার কথা হচ্ছে।

—তোমার উন্নতি হওয়ার কথা। আজ কেন এসেছ?

—আমার এই পুত্রটির জন্য আপনার কাছে এসেছি।

— কেন?

—এ যুদ্ধবিদ্যা শিখতে চায়। শহবে বসে থেকে অন্য কোন কাজ এর পছন্দ নয়।

—বেশ তো।

—এর উচ্চাশা যাতে পূর্ণ হয়, সেজন্য আপনার কাছে এসেছি।

—যোগ্যতা থাকলে উচ্চাশা অবশ্য পূর্ণ হবে। এখানে রেখে যেতে পারবে?

— পারব মেহেরবান।

— রেখে যাও। ব্যবস্থা হবে।

সাধারণ একজন কর্মচারী হাসান। তার সঙ্গেও সুলতানের অমন মোলায়েম ব্যবহার দেখে সবার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পেল। তারা ভাবে সলতান নিশ্চয় সম্প্রতি কোন আঘাত পেয়েছেন। তাই এই পরিবর্তন।

সুলতান অনুভব করেন তাঁব চলাফেরায আগের ক্ষিপ্রতার সামান্য ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে কাউকে এটা বুঝতে দেন না, দিতে চান না। তাহলে কানাঘুযো শুরু হয়ে যাবে যে সুলতান অশক্ত হয়ে পড়েছেন। শাসনকার্য চালাতেও অপারগ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রীরা নুতনত্বের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠবে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘোঁট পাকাতে শুরু করবে। একটা ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠবে। আর তাঁর প্রিয় পুত্রকে কোনমতে সেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার করে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

ভাবতে আঁৎকে ওঠেন সুলতান। সেই চিন্তা মাথায় এলে রাতে স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই স্বপ্নবড় ভয়ংকর। দেখতে পান তিনি পথ চলেছেন। সেই পথের পাশের একটি বিরাট বৃক্ষ উৎপাটিত হয়ে তাঁর ওপর এসে পড়ে। তিনি তার নীচে চাপা পড়ে যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করছেন, হাত পা তাঁর অবশ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। সেই সময় দেখতে পান পুত্র ফিরোজ নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরে। তিনি চিৎকার করে ওঠেন—" ফিরোজ আমাকে বাঁচাও । আমি মরে যাচ্ছি।" ফিরোজ তাঁর চিৎকারে একটুও বিচলিত না হয়ে বলে— " এখানে তো লোক বেশী নেই। ডেকে পাঠাচ্ছি।" সুলতান বলে ওঠেন— " অতক্ষণ বাঁচব না।" ফিরোজ বলে— " অধৈর্য হবেন না। আমি একা তো গাছটাকে ওঠাতে পারব না। শান্ত হয়ে একটু সহ্য করুন।"

সে রাতেও নিদ্রাভঙ্গের আগে একটা কাতরোক্তি নির্গত হয় তাঁর কণ্ঠ থেকে। দরবিগলিত স্বেদ প্রবাহে কামিজ সিক্ত। চেয়ে দেখেন করাচিলের সুন্দরী পার্বতী তাঁর শিয়রে বসে ব্যজন করছে। নিশুতি রাত। গ্রীষ্মের দিল্লী তাপদগ্ধ। সুলতান শুয়েছিলেন হারেমের শীর্ষে তাঁর জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত গ্রীষ্মাবাসে। সেটি বৃহৎ একটি কক্ষ যার কোন দিকে দেওয়াল নেই। মাথার ওপরে শুধু আচ্ছাদন। মুক্ত হাওয়া খেলা করে সেখানে। পার্বতীকে সেখানে আসতে বলেছিলেন শয়নের পূর্বে। নন্দা আর নেই। দু'বছর পূর্বে কয়েকদিনের অসুখে তার মৃত্যু হয়েছে। সুলতান নিজ হস্তে তার চিকিৎসা করেও বাঁচাতে পারেন নি। নন্দা শেষ দিন অবধি তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে। কোন ঘাটতি থাকলেও সেবার মাধ্যমে সেই অপূর্ণতাকে ভরাট করে দিয়েছিল। পার্বতীও তাই। তার যৌবন এখন অস্তাচলের দিকে খুব সামান্য একটু ঢলে পড়েছে। তার নারীত্ব এখন আরও পরিপূর্ণ। সে সেবাপরায়ণা। তার মমত্ববোধ সুলতানের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁর আসল বেগম এখন শুধু ফিরোজ-জননী। অন্য কোন ভূমিকা থেকে তিনি অনেক আগেই সরে গিয়েছেন। যৌবনও অস্তমিত।

হ্যাঁ, ফিরোজ-জননী বলে তিনি কখনো উপেক্ষিতা হতে পারেন না, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন। নিজের এই অধিকারবোধ তাঁকে দিনের পর দিন আরও উগ্র করে তুলছে। অনেকক্ষেত্রে অবুঝও। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য অনেক দিন গত। আজকাল প্রতিটি বাক্য জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন। ফলে একটু উত্তেজিত হলে স্বরভঙ্গ হয়। মিষ্টত্ব বলে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

নিদ্রাভঙ্গের পরে বাকী রাতটুকু জেগে কাটিয়ে দেন সুলতান পার্বতীর কোলে মাথা রেখে। তারপর অতি প্রত্যুষে, আলো ফোটেনি তখনো, তিনি ধীরে ধীরে ওপর থেকে নেমে হারেমের দরদালান অতিক্রম করে নিজের কক্ষের দিকে যাওয়ার সময় দেখেন তাঁর বেগম সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রীতিমত চমকে ওঠেন সুলতান।

তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন— ঘুম হয়নি?

— হবেনা কেন? তোমার হয়েছিল?

— যেমন হয়।

— দেখে তো মনে হচ্ছে না। তবে আজ আমি তোমাকে ধরব বলে জেগে বসে আছি। ভেতরে আসবে?

— নিশ্চয়।

সুলতান চিন্তান্বিত অবস্থায় বেগমকে অনুসরণ করে কক্ষে প্রবেশ করেন। বেগম সাহেবা তাঁকে পালঙ্কে বসতে অনুরোধ করেন। নিজে অদূরে একটি আসন গ্রহণ করেন। তারপর সুলতানকে হেসে বলেন— সত্যিই তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

— গরম ছিল খুব। তার ওপর দুঃস্বপ্ন।

— ও তো এখনো যুবতী। দুঃস্বপ্নের অবকাশ পেলে কোথায়? আর পুরুষের যৌবন তো মনে হয় অনন্ত।

— দুঃস্বপ্ন বয়সের বাছ-বিচার করে না। যৌবনেরও নয়।

— তোমার হিমালয় কন্যা এখনো স্নিগ্ধ শীতল মোহময়। তাই না?

— কেন ডেকে আনলে?

বেগমসাহেবা সোজা প্রশ্ন করেন— তুমি কি ফিরোজকে নিজের মত স্বাধীনভাবে কিছু করতে দেবে না?

— একথা উঠছে কেন?

— সুলতানজাদারা সাধারণত বড় বড় পদে থাকে। কোন রাজ্যের শাসনকর্তা কিংবা অন্য কোন উচ্চ পদে। অথচ ফিরোজকে তুমি রেখেছ তোমার নিজের ছায়ার নীচে। কেন?

—এ কি তোমার নিজের কথা? নাকি ফিরোজ বলেছে তোমাকে?

— ফিরোজ আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে সন্তুষ্ট হয়। এটা আমার নিজের কথা। ওকে কি তুমি পঙ্গু করে রাখতে চাও?

—আমি উঠি। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে।

— আমার কথার জবাব পেলাম না।

— তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নেই। দু'একদিনের মধ্যে জানতে পারবে।

— এখানে ঘুমিয়ে নিতে পার।

—আমি?

— কেন? বিপদে পড়বে?

—চলি।

দু'দিন পরে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দরবারে ঘোষণা করলেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ফিরোজ তামাম হিন্দুস্থানের সুলতান হবে। তাই সে এখন থেকে সিপাহশালার পদ পেল। তাছাড়া রাজস্ব বিষয়ে সব কিছু সে দেখাশোনা করবে।

সুলতানের এই ঘোষণা আকস্মিক । তাই আমীর ওমরাহেরা বিস্মিত হ'ল। তবে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল। কারণ সুলতানের এই ঘোষণা বহু-প্রতীক্ষিত। ফিরোজকে তারা ভালভাবে চেনে। সুলতান হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্যতা তার রয়েছে। পিতার মত খেয়ালী আদৌ নয় সে। তার পিতার কারও কথা ভালভাবে শেষপর্যন্ত শোনার নেই । ফিরোজ অমন নয়। সে প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি কথা ধৈর্য সহকারে শোনে। সবাইকে সমান গুরুত্ব দেয়। পিতার মত প্রতিভাবান সে কখনো নয়। কিন্তু একজন উঁচুদরের সুলতান হওয়ার সব যোগ্যতা তার রয়েছে। সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অথচ আত্মম্ভরিতা তেমন নেই। প্রতিটি ব্যক্তির পরামর্শ সে সাগ্রহে শোনে। কাউকে তুচ্ছ বলে ভাবেনা।

মালিক কাসেম দুই করাচিল বিবিকে নিয়ে দিব্য সুখে দিন কাটাচ্ছে। তারও বয়স কম হ'ল না। তবে বিবাহিত জীবনে কখনো দুঃখ পায়নি। দুই পত্নীর মধ্যে কোন ঈর্ষা নেই, কোন প্রতিযোগিতা নেই। সুন্দর ভাগাভাগি করে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। উভয়েরই সন্তান হয়েছে। একজনের কন্যা। কন্যাই বড়। সম্প্রতি তার সাদিও হয়েছে। পুত্র ছোট। তার মুখে হিমালয়ের মানুষের আদল। কাসেমের পুত্রের মুখ দেখতে খুব ভাল লাগে। কন্যাকেও ভালবাসে খুব। কন্যা তার নিজের মায়ের মত দেখতে হয়েছে। তাকে দেখলে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু পুত্রের মধ্যে সে দেখতে পায় হিমালয়কে। এই হিমালয় তাকে উপহার দিয়েছে দুই সরল সহজ বিবিকে। দুই জনে তার জীবনকে করে রেখেছে মধুময়। এই বয়সেও তাদের চটপটে চলন, হাসিখুশী ভাব দেখলে মনে হয় বয়স তাদের এক জায়গায় এসে থেমে রয়েছে। সেই যেদিন সুলতানের অনুমতি নিয়ে ওদের দু'জনাকে ঘরে এনে তুলেছিল তাদের বয়স তারপর যেন বাড়েনি। অথচ সে নিজে দিন দিন রীতিমত প্রৌঢ় হয়ে পড়েছে। তার এই মনোভাব নিয়ে দুই বিবি তার সঙ্গে খুব হাসি ঠাট্টা করে।

তারা দু'জনা মাঝে মাঝে অপর দুই সঙ্গিনী, যারা সুলতানের হারেমে থাকে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। কাসেমকে অনেক কষ্টে সুলতানের অনুমতি আদায় করতে হ'ত। তারা বছরে দু'একবার দেখা না করে থাকতে পারত না। এক সঙ্গে বসে চারজনে মিলে আগেকার নানা কথা বলত। সব কথাই ফেলে আসা মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে। তারা কাঁদত তাদের আত্মীয়স্বজনের কথা ভেবে। তারা কাঁদত ছোট ছোট ভাইবোনেদের কথা ভেবে। তারা কত বড় হয়েছে,

কেমন আছে কে জানে। যেমন কাঁদত, তেমনি হাসতও তারা ব্যক্তিগত জীবনের কৌতুক কাহিনী একে ওকে শুনিয়ে। এইভা‍ে চলতে চলতে একদিন-নন্দা একেবারেই চলে গেল। সেই দিন থেকে তাদের বিচ্ছেদ। নন্দার মৃত্যুতে তারা তিনজনই আকুল হয়ে কেঁদেছিল।

এরপর কাসেমের দুই পত্নী আর হারেমে যেতে চায় না। দু'একবার প্রশ্ন করেও সদুত্তর পায়নি। হয়ত তাদের ধারণা ছিল একসঙ্গে যেমন তারাদেশ ছেড়ে এসেছিল, তেমনি একসঙ্গে তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু নন্দার মৃত্যু তাদের সেই কল্পনা ভেঙে দিয়েছে। কারণ তারা বুঝে গিয়েছে-ওপারে যাওয়ার সময় কেউ সঙ্গিনীকে ডেকে নিয়ে যায় না। একাই চলে যায় স্বার্থপরের মত। সুতরাং কি হবে এইভাবে মিলে মিশে মায়া বাড়িয়ে। যেতে তো হবে একাই।

কিন্তু মালিক কাসেম তাদের একদিন এসে জানায় যে তাদের সখী পার্বতী সুলতানের হারেমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। শুনে তাদের বুকে কেঁপে ওঠে। পার্বতীও শেষে পালিয়ে যাবে?

সুলতান আগেই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। তাবা পরদিন অপরাহ্নে প্রাসাদের হারেমে গিয়ে উপস্থিত হন। আগে যতবার হারেমে এসেছে তারা অবাক বিস্ময়ে আশেপাশের সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখেছে ততবার। কত প্রাচুর্য চারদিকে। মালিক কাসেম কম অবস্থাপন্ন নয়। কিন্তু সুলতানের হারেমের তুলনায় তাদের গৃহ অতি নগন্য। তাছাড়া প্রতিবার তারা এসে দেখেছে তাদের দুই সখীর ফাইফরমাশ খাটার জন্য কতগুলো বাঁদী সর্বক্ষণ নিযুক্ত রয়েছে। সখীদের সামান্য ইঙ্গিতে তারা কখনো শরবত, কখনো বাদাম পেস্তা কিংবা অন্য কোন মেওয়া নিয়ে আসছে। কখনো সুন্দর সোনার জবির ঝালর দেওযা পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। সে এক ইলাহী কাণ্ড।

এবাবে এসেই প্রথমে তাদরে মনে হ'ল, নন্দা আর তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই। ওদের চারজনের মধ্যে নন্দা ছিল সবচেয়ে বেশী কৌতুক প্রিয়। মজার মজাব কথা বলতে তার জুড়ি ছিল না। একবার নাকি মাঝরাতে সুলতান অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন তার কথা শুনে। ওভাবে তাঁকে জীবনে কেউ আগে কিংবা পরে হাসতে দেখেনি। একবার হারেমে গিয়ে ওরা দেখল নন্দা তার কক্ষে নেই। তাদের সঙ্গে পার্বতীও খুঁজতে শুরু করল, কিন্তু কোন হদিশ পেল না । শেষে নন্দার বাঁদীদের জিজ্ঞাসা করা হয়। বাঁদীরা কথার উত্তর দিতে চায় না। পার্বতী খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলে যে সুলতানকে বলে দেবে। তখন তারা বিনীত ভাবে জানায় যে নন্দার মানা আছে। কিছুতেই খুঁজে না পেয়ে তারা যখন পার্বতীর ঘরের দিকে রওনা হয় তখন বাঁদীদের মধ্যে একজন বলে ওঠে— "একি রে চলে যাচ্ছিস তোরা?" ওরা চমকে ওঠে। নন্দা বাঁদী সেজে ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এই রকম কত মজা যে সে করত তার

ঠিক নেই। তার কথা বড় বেশী মনে পড়ে ওদের তিনজনার।

এখন আবার পার্বতী অসুস্থ। ওরা দু'জনা তার কক্ষে প্রবেশ করে। শয্যায় শুয়ে ছিল পার্বতী। সে তাদের বসতে বলে।

— কেমন আছিস তুই! তোর নামটা যেন কি?

— রাজিয়া। ভয় নেই , আমি নন্দা নই যে তোদের ছেড়ে পালিয়ে যাব। তবে মরতে পারলে বড় ভাল হত। বাঁচার আর ইচ্ছা নেই আমার।

ওরা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চায়। কিছু বুঝতে পারে না। একথা সে কেন বলছে? সুলতান কি কোনরকম দুর্ব্যবহার করেছেন? তাই বা হবে কি করে! তিনিই তো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাসেমকে বলেছেন, তাদের দুজনাকে পাঠিয়ে দিতে।

ওরা দু'জনা পার্বতীর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলে— সুলতান নিজে আমাদের এখানে আসতে বলেছেন। তিনি অতি মহৎ।

— হ্যাঁ, তাঁর মহত্বের সীমা নেই। তিনি যে কত মহৎ বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি পারলাম না তাঁর মহত্বের মর্যাদা দিতে। আমি অভিশপ্ত।

— একথা বলতে নেই। এখন তুই অসুস্থ। অত উত্তেজিত হোসনে। সুলতান এত ভাল, আর তুই মরতে চাইছিস? তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

পার্বতী কেঁদে উঠে বলে — না না, আমি পাগল নই। আমি জানি সুলতান আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু তাই বলে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করার সামর্থ আমার থাকবে না কেন? তিনি আমাকে সুযোগ দিলেন, অথচ আমি সেই সুযোগ ধরে রাখতে পারলাম না।

— আমরা তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা। তোর কথা পাগলের প্রলাপ বলেই তো মনে হচ্ছে। স্পষ্ট করে বল্।

কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কেঁদে নিয়ে পার্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার গর্ভে এসেছিল। রাখতে পারলাম না।

ওরা দু'জনা স্তম্ভিত হয়ে যায়। পার্বতীর ক্রন্দন ওদের কর্ণগোচর হয় না। অনেকক্ষণ পরে ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞাসা করে— কি করে হ'ল?

—পড়ে গিয়েছিলাম।

দু'জনা একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। ভর্ৎসনা করে বলে —এত বাঁদী আশেপাশে সব সময় ঘুরঘুর করছে, তবু এই কাণ্ড ঘটতে দিলি? সর্বক্ষণের জন্য সঙ্গে একজনকে রাখতে পারলি না হতভাগী?

— স্নান করতে গিয়েছিলাম—

তাকে থামিয়ে দিয়ে ওদের একজন বলে— তাতে কি ? এক পা-ও একা একা যাওয়া ঠিক হয়নি। উঃ তোর কথা শুনে আমারই মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোর তো

হবেই।

অপরজন বলে— চুপ কর। যা তা বলিস না। আমার ধারণা অত ভেঙে পড়ার কারণ ঘটেনি। তার চেয়ে তুই বরং সুলতানের কাছে সন্তানহারার যে মর্মবেদনা অনুভব করছিস সেটা বারবার প্রকাশ কর। তোর এখন অনেক দিন বাকী। হতাশ হোস না। যথেষ্ট আশা রয়েছে। সুলতানকে তোর সমব্যথী করে নে।

— তা কি সম্ভব? উনি পুরুষ।

— পুরুষ হলেও উনি মানুষ। চোখের জল মুছে ফেল। অত করুণ চেহারা নিয়ে থাকলে উনি আর একদম আসবেন না। আবার হাসিখুশী হয়ে যা। আবার তোর সেই মিষ্টি কণ্ঠের গান শোনা। দেখিস আবার তোর কপাল খুলবে । এই স্তোক বাক্যের যথার্থতা থাকুক বা না থাকুক রাজিয়া শান্ত হ'ল। সে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

দোয়াবের বিদ্রোহ যেন তুষের আগুন। হামেশাই ধিকিধিকি জ্বলে। মাঝে মাঝে নতুন দাহ্য পদার্থ পেয়ে দপ করে জ্বলে ওঠে। আবার সেটি পুড়ে গেলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। দোয়াব পুরোপুরি শান্ত হয়েছে এবং সেখানকার রাজপুতরা নিশ্চিন্তে সুখে কালাতিপাত করছে স্বপ্নেও সেকথা ভাবা যায় না। তাই সুলতান কখনো নিজে যান কখনো বিশ্বস্ত কাউকে পাঠান সেখানে। কখনো কঠোর হতে হয়, কখনো মাথায় হাত বোলাতে হয়। কিন্তু স্থায়ী কিছুই হয় না।

সেবারে সুলতান দোয়াবে গিয়ে পরিস্থিতি সামলে রাজধানীতে ফিরে এসে শুনলেন মেবারে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তাঁকে জব্দ করার জন্য যেন সারা দেশ উঠে পড়ে লেগেছে। যাদের বিশ্বাস করে এককালে এক একটি অঞ্চলের শাসনকার্যের ভার দিয়েছিলেন তারাই বিদ্রোহ করছে। মেবারেও সেইরকম। তিনি সঙ্কল্প নিলেন এমন শাস্তি দেবেন বিদ্রোহী এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের যাতে ভবিষ্যতে কেউ কখনো মাথা চাড়া দেওয়ার দুঃসাহসে দেখাতে না পারে। তিনি বুঝলেন কয়েকদিনের মধ্যে আবার তৈরী হতে হবে । বহুদিন আগে একবার মেবারে গিয়েছিলেন, আর যান নি। এবারে যাবেন এবং কিছুদিন থাকবেন। কিন্তু সোজা সেখানে যাবেন না। তার আগে একবার দৌলতাবাদে যেতে হবে। সেখানে কাজকর্ম কেমন চলছে দেখবেন। মনে মনে ইচ্ছা আছে তাঁর বাল্যকালের গৃহশিক্ষক কুতলকখাঁকে দৌলতাবাদের উজির করে দক্ষিণাঞ্চল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। বয়স কম হ'ল না, এখন টানাপোড়েনের মধ্যে সব সময় থাকতে ইচ্ছা হয় না। মনে মনে স্বীকার করলেন দিল্লীকে তার আবহমান কালের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা অত সহজ নয়।

দোয়াব থেকে ফিরে দু'দিন একা একা থাকলেন। ফিরোজের মা একবার দেখা করতে চেয়েছিলেন। গরজ দেখান নি তিনি। গেলেই একথা সেকথার পর কিছু কটু

উক্তির উদগীরণ এই বয়সে সহ্য হয় না। কিন্তু একা আর কিভাবে কাটানো যায়। তিনি গেলেন রাজিয়ার কক্ষে। গিয়েই রাজিয়ার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যে, তার আগ্রহ এবং সেবায় তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভাবলেন , এ যেন চির নতুন , হিমালয়ের মতই । এর যৌবনও হয়ত অবিনশ্বর। অথচ ভালভাবে জানেন , একটি সন্তান হারিয়ে এ কিরকম কাতর হয়ে পড়েছিল।

— কেমন আছ রাজিয়া?

—ভাল আছি সুলতান।

সত্যই ভাল আছে রাজিয়া। দৌলতাবাদে প্রথম যেদিন দেখেছিলেন, সেইদিনের মতই সজীব এবং সতেজ।

—ভাল লাগল শুনে।

সুলতান জানেন, রাজিয়া হাবে ভাবে অনেক জানিয়েছে যে সে আর একটি সন্তান চায়। মনে মনে ভাবেন, মন্দ কি ? একটা নতুনত্ব তো বটে। তাঁর বয়স হলেও তিনি বৃদ্ধ নন। নারীর সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট হন আগের মতই।.

— একা একা কি কর?

— আপনার প্রতীক্ষায় বসে থাকি।

— গান গাও না?

— হ্যাঁ, কিন্তু আপনার তো সহস্র গায়িকা আছে, নর্তকী আছে। আমার গান কি ভাল লাগবে?

—ওরা তো শুধু গান গায়। আর কিছু নয়। কিন্তু তুমি তো শুধু গান গাও না, তুমি অনেক কিছু দাও আমাকে। তোমাব কথা স্বতন্ত্র। তুমি আমাকে একটি উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলে।

রাজিয়া সব ভুলে গিয়ে সুলতানের কোলের ওপর এলিযে পড়ে বলে— আমি আর একটি উপহার দিতে চাই। আপনি দয়া করুন।

— দয়া বলছ কেন? তুমি তো অন্যায় কিছু বলছ না। তোমার মত সুন্দরী সন্তানহীনা থাকবে ভাবতে কষ্ট হয়।

রাজিয়া পুলকিত হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করতে পারেনি সুলতান তাব অনুরোধে এভাবে সায় দেবেন।

সুলতান ভাবেন, তিনি দৌলতাবাদের দিকে যাওয়ার সময় রাজিয়াকে সঙ্গিনী করে নিয়ে গেলে কেমন হয়। সেখান থেকে মেবার অভিযানেও না হয় তাকে সঙ্গে রাখবেন।

—আমি আবার দৌলতাবাদের দিকে যাচ্ছি রাজিয়া। ওখান থেকে মেবার হয়ে ফিবতে অনেক দিন কেটে যাবে।

— অত দিন?

—তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

রাজিয়ার মন নেচে ওঠে। সে সংযত কণ্ঠে বলে— আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে?

— তোমার কষ্ট হবে না?

—আমরা কষ্ট সহিষ্ণু। তাছাড়া আপনি সঙ্গে থাকলে, শত কষ্টেও সুখের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকব।

—- তাহলে বল যে তুমি আমাকে ভালবাস।

— প্রথম সন্তান যখন গর্ভে এল, তখন প্রথম অনুভব করি আপনাকে আমি ভালবাসি।

সুলতানের মন অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে। তিনি বলেন— এতদিন বলনি তো?

— একথা যে বলতে হয়, আমার জানা ছিল না সুলতান।

সুলতানের মনে হয় তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন? এতদিন পরে জীবনের প্রায় অপরাহ্নে এসে নারীর প্রেমের জন্য এত লালায়িত কেন? তিনি জানেন, এই রোগ তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেদিন করাচিলের দুই রমনীর মুখমণ্ডলে মালিক কাসেমকে স্বামী রূপে পাবে জেনে ভালবাসার এক অনির্বচনীয় দ্যুতি প্রকাশ পেতে দেখেছিলেন দৌলতাবাদে। প্রেমের প্রকাশে রমনীর রূপ অমন স্বর্গীয় হয়ে ওঠে তিনি জানতেন না। তিনি বুঝতে পারেন ফিরোজ জননীর মধ্যে ভালবাসার এই রূপ তিনি কখনো দেখতে পাননি। পেয়েও হারানোর ভয় না থাকলে বোধহয় প্রেমের সার্থক প্রকাশ ঘটেনা। কিংবা দয়িতকে পাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে নেই সেখানে হঠাৎ পেয়ে গেলে অমন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তিনি কিছু সঠিকভাবে জানেন না। রাজধানীতে এই মুহূর্তে এমন কোন দার্শনিক নেই, যার কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যাবে।

দার্শনিক না থাকলেও বিজ্ঞ সুশিক্ষিত এবং মার্জিত ব্যক্তির অভাব অবশ্য নেই। তেমন মানুষেরা পাশে না থাকলে তিনি স্বস্তি পান না। দিল্লীতে এখন আছেন ইবন বতুতা এবং বারাণী। দুজনাই বিজ্ঞ এবং ইতিহাসবেত্তা। তাঁরা হয়ত নারীর প্রেম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারবেন না, তবে অন্য অনেক বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। ইবন বতুতাকে এবারে কিছু দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে মেবার অভিযানের আগে।

পরদিন দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি ইবন বতুতাকে খবর পাঠালেন। দরবার বসলে তিনি ঘোষণা করেন, দু'একদিনের মধ্যে মেবারের দিকে যাত্রা করবেন। তবে দৌলতাবাদ হয়ে মেবারে যাবেন। দৌলতাবাদ থেকে কিছু সৈন্য সংগহ করতে হবে। দিল্লীকে অরক্ষিত রাখা চলবে না।

· ইবন বতুতা দেখলেন, সুলতান অনেক কিছু বলছেন অথচ তাঁর নাম উল্লেখ করছেন না। তাহলে ডেকে পাঠালেন কেন? ভাবেন, অপেক্ষা করে দেখা যাক। নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করাও বিপদ। কোন্ খেয়ালে কি আদেশ করবেন ঠিক নেই। সুলতান

যে তাঁকে দরবারে উপস্থিত থাকতে বলেছেন, বারাণী সেকথা জানেন। তিনি বতুতার পাশে গিয়ে বসেছেন। বতুতার কানে কানে বললেন— বোধহয় ভুলে গিয়েছেন তোমার কথা। নিজে আর খুচিয়ে দিও না।

সেই সময় সুলতানের দৃষ্টি পড়ে দু'জনার ওপর। তিনি ডেকে ওঠেন— ইবন বতুতা।

— খোদাবন্দ।

— আমি চলে যাচ্ছি বেশ কিছুদিনের জন্য। আপনাকে একটা কাজের ভার দিয়ে যেতে চাই।

—আমি প্রস্তুত।

— আপনি আগামী কাল থেকে এই শহরের কাজীর পদ গ্রহণ করুন। আমার মনে হয় এতে আপনার বিদ্যাচর্চার খুব বেশী ব্যাঘাত ঘটবে না। ঘটবে কি?

ইবন বতুতার মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখা যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর সেটা কাটিয়ে উঠে সুলতানকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেন— মনে হয় তেমন অসুবিধা হবে না। এ তো কোতোয়ালের কাজ নয়।

ইবন বতুতার উত্তর শুনে বারাণী চমকে ওঠেন। ভাবেন, পাগল হ'ল নাকি বতুতা? তিনি আশঙ্কিত হয়ে সুলতানের পরবর্তী হুকুমের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর ভয় হয় সুলতান এবারে হয়ত বলবেন— বতুতা আপনাকে দিল্লীর কোতোয়ালের পদটা দেওয়া হ'ল। কাজীর পদটা দেওয়া হল বারাণীকে।

ভাগ্য ভাল যে বারাণীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়নি। সুলতান নানা কারণে খুব চিন্তান্বিত বলে মনে হল। তিনি বতুতার উক্তি সহজভাবে নিলেন। তবু বতুতা সম্বন্ধে যখন কিছু বলেছেন, তখন বারাণী সম্বন্ধেও বলবেন, এটা জানা কথা। বরাবর তাই হয়ে এসেছে।

সুলতান বলেন— বারাণী আপনাকেও একটা কাজ দেব। এবারে এবং এর পরের সব অভিযানে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি লক্ষ্য করেছি অনেক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে আপনি বেশ সাহায্য করতে পারেন। তাছাড়া পরামর্শদাতা হিসাবে আপনি দক্ষ। ইবন বতুতা সঙ্গে থাকলেও ভাল হ'ত। কিন্তু আপাতত, তিনি ধকল সহ্য করার মত অবস্থায় নেই। থাকলে ওঁকেও সঙ্গে নিতাম।

বারাণী ভাবেন, মন্দকি? আরও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ মিলে গেল। লেখা সমৃদ্ধ হবে এতে।

দরবার শেষ হওয়ার মুহূর্তে মালিক কাসেমকে তিনি ডেকে বলেন—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

অনেকদিন পরে দৌলতাবাসে এসে সুলতান বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন। তিনি শুনেছেন, দিল্লী এবং দৌলতাবাদের অধিবাসীদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়বস্তু হল রাজধানী হিসাবে কার গুরুত্ব বেশী। সাধারণত সুলতান যেখানে বাস করেন সেই স্থান সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পায়। এতদিন দৌলতাবাদ যেন মন-মরা হয়ে পড়ে ছিল। সুলতানের আগমনে তার ধমনীতে উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ বইতে শুরু করেছে। সুলতানের কাছে অনেকে আর্জি জানাতে শুরু করে তিনি যেন এখানে বরাবর থেকে যান। নিজের সৃষ্টির প্রতি মহম্মদ বিন তুঘলকের বিরাট আকর্ষণ। অথচ তিনি গভীর ভাবে ভেবে দেখেছেন দৌলতাবাদ কখনো দিল্লীর বিকল্প হতে পারে না। তাই তিনি কাউকে নিরাশ না করলেও সদুত্তর দিতে পারেন না। যদি সম্ভব হ'ত তিনি নিজে কখনো এই দৌলতাবাদ পরিত্যাগ করতেন না। একটা গভীর মায়া জন্মেছে নগরীর প্রতি। এখানে ওই যে ক্ষুদ্র পাহাড়টি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে সেই এক-প্রকোষ্ঠের পাষাণ গৃহে চন্দনার সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তা কি ভুলবার? পাহাড়টিকে দেখে মনে হচ্ছে সেই রাতের পর থেকে যেন পৃথিবীর মানুষের কাছে সেটি পরিত্যক্ত। তাই আজ অমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওটিকে।

মালিক কাসেম এখানে এসে কেমন যেন অন্যমনস্ক। সুলতানের সব আদেশ যথাযথ পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কোন প্রাণ নেই। ঠিক যন্ত্রের মত।

সুলতান তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন— তোমার কি হয়েছে কাসেম?

কাসেম থতমত খেয়ে বলে— কিছু হয়নি খোদাবন্দ।

—মনটা কি দিল্লীতে ফেলে রেখে এসেছ? অনেক দিন তো হ'ল, এখনো এই অবস্থা?

— না হুজুর, তা নয়।

সুলতান আর কিছু বলেন না। কাসেমের মন উদাস হতেই পারে। তাছাড়া এখানেই সে করাচিলের চার উদ্ভিন্ন যৌবনা কুমারীকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছিল। তার মনে কি ওদের প্রতি কোন দুর্বলতা জন্মায়নি? মানুষের চিত্ত যেমন সবল তেমনি দুর্বল। দুটোরই পরাকাষ্ঠা দেখা যেতে পারে মানুষের মধ্যে। সবলতা দুর্বলতাকে জয় করতে সাহায্য করে। কাসেম নিশ্চয় সেদিক দিয়ে খুব সবল। কিন্তু এখানে সে তো আর রাজিয়ার মত কাউকে সঙ্গে করে আনতে পারেনি। তাই উন্মনা হয়ে পড়ছে।

মেবার অভিযানের জন্য সৈন্য সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। এবারে ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এবারে এদিকে অনাবৃষ্টির জন্য মানুষের হাতে কাজ নেই। তাই তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দলে দলে এগিয়ে আসছে। কিছুদিন পরে খবর আসতে থাকে জলাভাবে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে খুব। তারপরই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে এই রোগাক্রান্তের

সংখ্যা বাড়তে থাকে। দীঘি পুষ্করিণী কূপ খানা এমন কি নদীতেও জল নেই। মানুষ জঘন্য নোংরা জলও সাগ্রহে পান করছে। ক্ষেতে ফসল হয়নি বলে বনজঙ্গল থেকে জানা অজানা গাছের পাতা সিদ্ধ করে খাচ্ছে। ফলে মারাত্মক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে দলে দলে মরতে থাকে। সুলতান তুঘলক বিচলিত হয়ে ওঠেন। ওদিকে মেবারে বিদ্রোহ। গুজরাটেও শান্তির পরিবেশ ভীষণভাবে বিঘ্নিত। এদিকে এই মড়ক আর দুর্ভিক্ষ। সুলতান কিছুটা হতাশ। হতাশ তিনি সাধারণত হন না কখনো। কিন্তু এবারে দৌলতাবাদে আসার পর থেকে তাঁর নিজের শরীরও ভাল যাচ্ছে না। পেটে মাঝে মাঝে একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন। নিজে চিকিৎসক হয়েও সেই যন্ত্রণার কারণ বুঝে উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝে শরীরের উত্তাপ বেড়ে যায়। নাড়ি চঞ্চল হয়। নিজের মনেই ভাবেন, শরীরে ঘুণ ধরেছে। কাঠে ঘুণ ধরলে সেই কাঠের অবক্ষয় ঘটতে থাকে, খুব ধীরে ধীরে। ভেঙে পড়তে অনেক দিন লেগে যায়। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে কতদিন লাগবে তিনি জানেন না। কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। তবে অবক্ষয় যে চলতে থাকবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষ এসে দৌলতাবাদে ভীড় করতে থাকে। তারা শুনেছে সুলতান রয়েছেন এখানে। তিনি তাদের ক্ষুধার অন্ন নিশ্চয় যোগাবেন। কিন্তু কতটুকু সামর্থ তাঁর? জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন মানুষদের দেখে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এতদিনে উপলব্ধি করেন প্রকৃত ক্ষমতা তাঁর কিছুই নেই। মানুষের এতবড় হাঁ-মুখ পূর্ণ করতে তিনি অপারগ। তিনি অসহায়। সারা তেলেঙ্গানায় এই একই দৃশ্য। তিনি অসুস্থ শরীরেও সঙ্গী নিয়ে ছদ্মবেশে সব ঘুরে ঘুরে দেখেন। পথে ঘাটে মৃতের ছড়াছড়ি। কোথাও শিশু মৃতা মায়ের শুষ্ক বুকে মুখ দিয়ে মরে রয়েছে কোথাও দলে দলে শকুনের ভীড়। তাদের বড়াখানা। কোথাও জীবিত মানুষের দল পশুর পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। সন্তানকে কোন সহৃদয় ব্যক্তি হয়ত সামান্য খাদ্য দিয়েছে, তার মা নিমেষে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে। কঙ্কালসার সন্তান তাই দেখে কাঁদতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সব দেখে সুলতানের পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। এ কি দৃশ্য! এই যখন দেশের অবস্থা, তিনি তখন কিসের সুলতান? সহ্য করতে না পেরে মৃতের স্তূপের কাছ থেকে প্রাসাদে ফিরে এসে বারাণীকে ডেকে পাঠান।

— কি করা যায় বারাণী।

— এখন আর কিছু করা যাবে না খোদাবন্দ। তবে ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকে কয়েকটা পন্থা গ্রহণ করতে হবে। দিল্লীতে শস্যভাণ্ডার রয়েছে, এখানে নেই। এখানে কয়েকটি জায়গায় শস্যভাণ্ডার নির্মাণ করতে হবে। তেলেঙ্গানার অসুবিধা হল অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টি দুটোরই প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই কৃষি পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন।

আপনি কয়েকজন অভিজ্ঞের ওপর সেই ভার দিন। এখন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। অনর্থক আকুল না হয়ে মনকে শক্ত করুন।

— আমি আর ভাবতে পারছি না।

একেতে অসুস্থ শরীর, তবে ওপরে দুশ্চিন্তায় সুলতান আরও কাহিল হয়ে পড়েন। তিনি বুঝলেন, এইভাবে চলতে দিলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়বে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে নিজস্ব একটা খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে নিলেন। ঠিক করলেন, তালিকার বাইরের কোন খাদ্য তিনি আর গ্রহণ করবেন না।

এখানে রাজিয়া সুলতানকে নিজের মত করে কাছে পায়। সুলতানের শরীরের জন্য তার দুশ্চিন্তা হয়। সুলতানের সেবার ভার অনেকটা নিজের হাতে তুলে নেয়। একটা ওষুধের অভাব সে বড় বেশী অনুভব করে। করাচিলে পাথর হয়ে যাওয়া এক ধরণের উদ্ভিদের পাতা আর ফল গুঁড়ো করে জল দিয়ে খেলে এই ধরণের অসুখ সেরে যায়। কিন্তু সেই পাতা পাবে কোথায়? তার মাকে ওপর থেকে নেমে আসা এক সন্ন্যাসী চিনিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ও মায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল। সন্ন্যাসী মাকে বলেছিলেন, এক দুর্লভ গাছের পাতা এটি। সেই গাছ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল যখন তখন ঈশ্বর তাদের পাথর করে দিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা পাথর হয়ে হিমালয়ের বুকে পড়ে রয়েছে, যাতে মানুষের উপকারে লাগে। প্রকৃত গুণী ছাড়া এর সন্ধান কেউ জানে না। সন্নাসী মায়ের সেবায় তুষ্ট হয়ে মাকে বলে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, কোথাও এই রোগের কথা শুনতে পেলে সেখানে যেতে হবে কেউ না ডাকলেও। রোগীকে ওষুধ দিতে হবে। যদি কখনো যেতে ইচ্ছা না হয় তাহলে পরে মায়ের হাতের ওষুধে আর কাজে লাগবে না। ওষুধের দ্রব্যগুণও থাকবে না মা দিলে। তাই মা প্রতিটি জায়গায় যেত। মাকে সবাই চিনত সেজন্য। দু'তিনদিনের পাহাড় ডিঙিয়েও লোকে আসত। মা পার্বতীকে শিখিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু এখানে সেই পাথর হয়ে যাওয়া পাতা আর ফল কোথায়? তাই পার্বতী অসহায়। হিমালয়ের বুকে অন্য অজস্র রকমের গাছগাছড়া, তৃণগুল্ম এমনকি জীব জন্তুও পাথর হয়ে পড়ে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু এই পাতা এই ফল একেবারে স্বতন্ত্র।

এত কিছুর মধ্যে রাজিয়া একদিন বুঝতে পারে যে সে অন্তরাপত্যা। এক স্বর্গীয় আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। স্বামীকে এখনই বলবে কি বলবে না বুঝতে পারে না। মেবার অভিযানে তোড়জোড় চলছে। শুধু দুর্ভিক্ষের জন্য বোধহয় রয়েছে। তাছাড়া সুলতান অসুস্থ। অসুস্থ না হলে তেলেঙ্গানার দুর্ভিক্ষ তাঁর অভিযানের পথে বাধা হতো না। তেমন হলে সুলতানের সঙ্গিনী হতো সে এই অবস্থাতেও। মেবারের বিদ্রোহ দমনে কত দিন আর সময় লাগত। তারপরে তো দিল্লী। দশমাসের আগে দিল্লী পৌঁছে যেতে পারত। এবারে তাকে অনেক সাবধানে থাকতে হবে। বাঁদীরা হবে তার সর্বক্ষণের

সঙ্গী। একবার মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছে। সেই ভুল জীবনে দ্বিতীয়বার কখনো হবে না। জীবনকে মরুভূমি করে তোলার সাধ্য নেই তার।

সুলতানের অসুস্থতা হ্রাস পেলেও তিনি খুব দুর্বল। ওদিকে মেবারের আগুন ভালভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। বিলম্ব করা অসম্ভব। সুলতান তাঁর গৃহশিক্ষককে ডেকে পাঠালেন।

কতুলক খাঁ এলে তিনি বলেন— আপনি দৌলতাবাদের উজির হলেও মেবারের বিদ্রোহ দমনের ভার আপনার ওপর দিলাম। আপনার ওপর ভরসা রাখতে পারি। আমি নিজে যেতে পারলে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার ওপর এত পরিশ্রমসাধ্য ভার দিতাম না।

— তাতে কি হয়েছে। আমি এতে গর্বিত। কবে রওনা হব?

—পরশু। ইতিমধ্যে আমি একটু শক্তি পেলে ওখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

— না সুলতান, আপনাকে যেতে হবে না। আপনি বরং সুস্থ বোধ করলে দিল্লীতে ফিরে যান। অনেক দিন দিল্লীতে অনুপস্থিত রয়েছেন আপনি।

— ঠিক বলেছেন। আপনি সঙ্গে কাকে কাকে নেবেন। নিজে নির্বাচন করে নিন। তবে বারাণী আর কাসেম বাদে।

— না, বারাণী জ্ঞানী ব্যক্তি। ওঁকে আমার দরকার নেই। মালিক কাসেম অবশ্য যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তবে আপনার বাহিনীতে দক্ষ ব্যক্তির অভাব তো নেই। সঙ্গী হিসাবে কাসেম অবশ্য চমৎকার।

কুতলক খাঁ বিদায় নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে সুলতান একটু সুস্থবোধ করেন। তিনি ভাবেন, এইবার দিল্লী রওনা হবেন। এতদিন পরে অনুভব করেন, দৌলতাবাদের ওপর যত মায়া থাকুক না কেন, দিল্লী তাঁকে কেন যেন বড় বেশী টানে। দৌলতাবাদে থেকেও মনে হচ্ছে তিনি যেন প্রবাসে পড়ে রয়েছেন। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারেন না। পিতামাতার সমাধিস্থল রয়েছে বলে কি? কিংবা ফিরোজ রয়েছে বলে? না, তা ঠিক নয় । হয়ত পরিচিত আমীরদের সবাইকে ছেড়ে রয়েছেন বলে অমন মনে হচ্ছে। ঠিক মত দরবারে বসতে পারছেন না বলেও হতে পারে। সবচেয়ে যাদের অভাব তিনি খুব বেশী অনুভব করেন, সেটি হল বিদেশ থেকে আগত পর্যটক আর বিজ্ঞদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। এখানে বিদেশী পর্যটকেরা বড় একটা আসে না। অথচ যে দেশেরই হোক না কেন, তারা একবার করে অন্তত দিল্লী ঘুরে যায়। তাদের সঙ্গে আলাপ করে, কথা বলে সমৃদ্ধ হওয়া যায়। তাদের ডেকে এনে দরবারে বসালে কর্মচারীবৃন্দ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারে। তিনি জানেন, সবাই তাঁকে এই বলে

দোষারোপ করে যে তিনি বিদেশী সম্বন্ধে অন্ধ। তাদের মধ্যে কোন মন্দ দেখতে পান না। দেশের সৈয়দ সুন্নি সুফীদের চেয়ে তাদের প্রতি তিনি অনেক বেশী সম্মান প্রদর্শন করেন। এ তো পরীক্ষিত সত্য। সুলতান নিজে সেকথা মনে মনে স্বীকারও করেন। তাঁর কেন যেন মনে হয়, দেশের তথাকথিত অনেক বিদ্যাবিশারদদের বাইরের চটকের প্রতি বেশী ঝোঁক। আসলে তারা কতটা খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। ধর্মবিশারদদের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের মধ্যে অনেক গোঁড়ামীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিদেশের বিজ্ঞরা অকৃত্রিম। ক্ষমতার কেন্দ্রভূমির কাছাকাছি থেকে, ক্ষমতাবানদের শরীরের স্পর্শ পেয়ে পেয়ে এদেশের বিদগ্ধজনের মন কৃত্রিমতার সঙ্গে সঙ্গে কুটিলতার ভরে গিয়েছে। বিদেশীরা অমন নয়। তাঁরা বন থেকে চয়ন করে আনা সতেজ অনাঘ্রাত পুষ্পের মত। সুলতানের হৃদয় তাই তাঁদের প্রতি সহজেই অনুরক্ত হয়ে পড়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। শকটের ব্যবস্থা করতে বলেন। রাজিয়া নিশ্চিন্ত হয়। আর কিছুদিন দেরী হলে তার অসুবিধা হ'ত। সুলতান এখনো জানেন না। তবে এবারে তাঁকে বলতে হবে।

যাত্রার আগের দিন রাজিয়া প্রকাশ করে যে সে গর্ভবতী। সুলতান শুনে বিস্মিত হন। জিজ্ঞাসা করেন— কতদিন?

— দুই মাস।

— এতদিন বলনি তো!

— আপনি অসুস্থ ছিলেন। তাছাড়া আপনার মেবারে যাওয়ার কথা ছিল। জানতে পারলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। সেই ভয়ে বলিনি।

সুলতান মৃদু হাসেন। ভাবেন, মন্দ কি? প্রৌঢ় বয়সে সন্তানের মুখ দেখা যাবে। দিল্লীর বেগমের কথা স্বতঃই মনে হয়। ঈর্ষা তাঁর হবেই। তবে ভীত হবেন না তিনি। নবজাতক পুত্রসন্তান হলেও সে ফিরোজের স্থান দখল করতে পারবে না একথা তাঁর জানা।

গুজরাটে তাঘি বড় বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করছে। মানুষটার গুণ রয়েছে যথেষ্ট। সে যুদ্ধ নিপুণ। শাসনকার্য বিষয়েও বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। সহসা তার মধ্যে উচ্চাশার কীট নড়েচড়ে উঠেছে। সে অনেক বেশী ক্ষমতার আকাঙ্খা করে। তার কাজকর্মের মধ্যে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। হাবভাব দেখে মনে হয় সে স্বাধীনতা ঘোষণা করে গুজরাট এবং সিন্ধু প্রদেশের সুলতান হতে চায়। সুলতান বুঝতে পারেন তাঘিকে এখনই শায়েস্তা না করলে বড় বেশী আসকারা পেয়ে যাবে। তখন সামলানো মুশকিল হবে। তিনি তাতার মালিককে গুজরাটে প্রেরণ করেন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

তাতার মালিক গুজরাটে যাওয়ার আগে সুলতানের নিকট বিদায় নিতে এলে মহম্মদ বিন তুঘলক তাকে বলেন— তাঘি সম্বন্ধে যতটুকু জানি, সে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। সে অসাধারণ সমর-কুশলী। তুমি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে বশে রাখার চেষ্টা করবে। কখনো বিনা করাণে তাকে বিরক্ত করবে না। বুদ্ধি করে চলতে পারলে সে তোমার কাজে লাগবে।

— আপনার হুকুম আমি যথাযথ পালন করব মেহেরবান।

সদিচ্ছা নিশ্চয় ছিল তাতার মালিকের । কিন্তু মানুষের স্বভাব তার সদিচ্ছাকে চিরকাল অতিক্রম করে যায়। এমন মানুষ আঙুলে গোনা যায় যে তার মনোবলের দ্বারা প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে। তাতারের মনে অত জোর নেই। গুজরাটে যাত্রার সময় তার কানে গিয়েছিল, তাঘির দুটি দ্রব্য রয়েছে যা স্বয়ং সুলতানের নেই। একটি হ'ল তার আরবী ঘোড়া, যার নাম তুফান । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গায়ে সূর্যের আলো পড়লে ঠিকরে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তুফান হ'ল তাঘির প্রাণ। আর একজন রয়েছে তাকেও প্রাণ কিংবা প্রাণের চেয়েও বেশী বলা যায়। সে হল তাঘির প্রেয়সী জামিলা। হিন্দুস্থানের সুলতানের হারেমে তো এখন নারীর সংখ্যা বলতে গেলে শূন্য। অন্যান্য আমীর ওমরাহ কিংবা হিন্দু রাজন্যবর্গের অন্তঃপুরেও জামিলার মত রূপসীর সন্ধান মেলা ভার। তার রূপ নিয়ে গর্ব করার কথা তাঘির মনে কখনো উদয় হয় নি। অন্য কোন রূপবতীর সঙ্গে তুলনা করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই। সে জামিলার রূপের মোহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে সব সময় । আর ভাবে, জামিলার যৌবন নিশ্চয় চিরকালের। এই রূপ কখনো বিনষ্ট হওয়ার জন্য সৃষ্ট হয়নি।

তাতার মালিক গুজরাটের শাসনকর্তা হয়ে এসে তাঘিকে ডেকে পাঠান। তাঘি সঙ্গে সঙ্গে এল। তাতার মালিক তার দিকে দুদণ্ড চেয়ে থাকে। চমৎকার দেখতে। দেহে একটুকু বাড়তি মেদ নেই। ছিপছিপে গড়ন । দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসা, আয়ত দুই চোখ। এমন সুপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাতার মালিক তার মধ্যে কোনরকম আত্মম্ভরিতার প্রকাশ দেখতে পেল না। তবে কি দিল্লীতে যে সমস্ত খবর গিয়ে পৌছায় সব সত্য নয়?

সে সোজা তাঘিকে প্রশ্ন করে— দিল্লীতে তোমার সম্বন্ধে নানা কথা রটে কেন?

তাঘি বিস্মিত হয়ে বলে— রটে নাকি ? জানিনা তো।

— তোমার কি ধারণা এই রটনা ঈর্ষা প্রসূত ?

— এখনো আমি কোনরকম ধারণা করিনি, কারণ কথাটা আজ প্রথম আপনার কাছে শুনলাম।

তাতার মালিক উত্তরের মধ্যে কোনরকম অসৌজন্য প্রকাশ পেতে না দেখলেও, একটা প্রচ্ছন্ন উপেক্ষার আঁচ অনুভব করতে পারে। এতে তার মনের মধ্যে উষ্ণতার

সঞ্চার হয়। শত হলেও সে এখানে এসেছে তাঘির উপরওয়ালা রূপে।

তাতার বলে— এখানে আমাকে না পাঠালেও চলত। কিন্তু সুলতানের কাছে খবর পৌচেছে এখানে কিছু লোক বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে তোমার কিছু জানা আছে?

— আমার অন্তত জানা নেই। আপনি বরং অন্যদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

তাতার মালিক তাঘির সঙ্গে যত কথা বলছে ততই তার ভেতরটা তেতে উঠছে। তাঘির হাবভাব সব কিছুই অত্যন্ত সংযত। তবু সামান্য কোন ভঙ্গী কিংবা সামান্য কোন কথার ধরণে সে তাতারকে ক্রমাগত তাচ্ছিল্য করে চলেছে।

আসলে তাঘি ভালভাবে জানে, সে যাতে বাড়তে না পারে সেই জন্য সুলতান তাতারকে পাঠিয়েছেন তাকে সংযত রাখতে। তাই মনে মনে সে ক্ষেপে আছে। তবে বাইরে যাতে তার প্রকাশ না ঘটে সেই সম্বন্ধে খুব সচেতন রয়েছে সে। তাতার মালিকের চরিত্র তার অজানা নয়। সুনাম নেই একটুও। নারী মাংসলোলুপ। কোন সুন্দরীর কথা কানে গেলেই সম্ভব হলে অন্যের হারেম থেকে তাকে তুলে আনার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তার জন্য বে-ইজ্জত কম হয়নি। তবু শিক্ষা হয় না। সে নিশ্চয় জামিলার কথা শুনেছে। অবশ্য জামিলা ছাড়াও তার হারেমে আরও কয়েকজন প্রকৃত সুন্দরী রয়েছে। তাদের কিন্তু সে জোর করে আনেনি। বরং তারা নাকি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছে। নিজেরাই এই কথা বলে তারা। পুরুষের আবার রূপ। রূপ বলতে কি বোঝে ওরাই জানে। কিন্তু জামিলার কথা স্বতন্ত্র। তাতার মালিক কবে সেদিকে নেকনজর দেবে সেকথা ভেবে একটু চিন্তান্বিত হয় তাঘি।

কয়েকদিন পরে তাঘি তার প্রিয় অশ্ব তুফানের পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে তাতার মালিকের গৃহে প্রবেশ করতেই সে বলে— তোমার তাজী বেশ চমৎকার।

— হ্যাঁ।

— ওটা আমাকে দিও।

— ওকে আমি ছাড়তে পারব না। ভাল দেখে অন্য একটা আপনার জন্যে এনে দেব। তাজী-ই দেব। এটি আমার বহুদিনের সাথী।

— আমার ওটা খুব পছন্দ।

তাঘি বুঝল এখানে আর থাকা চলবে না সম্ভবত। সে নিম্ন কণ্ঠে বলে— দু'চারদিন সময় দিন।

— দু'চার দিন কেন?

— মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

—বেশ , তারপরে দিয়ে যেও। ওটা আমার অবশ্য চাই।

তাঘি বুঝতে পারে লোকটা প্রকৃত অর্থে শয়তান। সুলতান তাকে এখানে পাঠিয়েছেন শান্তি রক্ষার জন্য। কিন্তু সে এখানে এসেছে তাকে উত্যক্ত করতে। সুতরাং অশান্তির সৃষ্টি হতে বাধ্য।

চারদিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতার আবার তাকে তলব পাঠায়। সে তুফানের সওয়ার হয়ে আবার যায় দেখা করতে। তবে ইতিমধ্যে সে মনস্থির করে ফেলেছে তাতারকে আর তোয়াজ করবে না। তার সারা জীবনের স্বপ্ন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। সেই পথেই সে চলবে এবার থেকে কোন দ্বিধা না রেখে।

তাতার মালিক তাকে দেখে হেসে বলে— মনস্থির করেছ তাহলে। আচ্ছা, জামিলা কে বলতে পার?

— কোন অশ্বের নাম কি?

— না না, পশু নয়, মানুষ। মানুষ বললেও সব বলা হয় না। বলতে পার, মানবী। তাতেও সব বলা হয় না। বলতে পার অপরূপা সুন্দরী এক নারীর নাম।

— থাকতে পারে, কোথাও না কোথাও।

— অর্থাৎ তুমি চেনো না?

— আমি চিনলে আপনার কি লাভ?

— ওটি যে আমার চাই। অশ্ব আর ওই জিনিষে আমার বড্ড সখ।

— খুব ভাল কথা। ডাঙায় থেকে হারামের সঙ্গে বিবাদ কে করতে চায়।

— কি বললে?

— বলছি, পৃথিবীটা হারামে ভর্তি। এখানে নিজের মত সুখে শান্তিতে কেউ বাস করতে চাইলেও হারাম এসে ঢুঁ-মারে। তার চেয়ে খালি হাত-পা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা ভাল। আপনার কি মত ?

— জামিলাকে চাই।

—আমি কাল সকালে এসে দিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তাঘি তার দলবলকে আগে থেকে তৈরী রেখেছিল। সেইদিনই গভীর রাতে সে হারেমের সবাইকে নিয়ে গুজরাট সীমান্ত পার হয়ে সিন্ধুর তাত্তাহ্ শহরের দিকে এগিয়ে যায়। সুলতানের সঙ্গে কোনরকম আপোষ নয় আর। শুধু সংঘর্ষ। নিজের যেটুকু সামর্থ রয়েছে তাই দিয়ে ওদের অতিষ্ঠ করে তুলবে। গুজরাট আর সিন্ধুতে আগুন জ্বালাবে। তাজী আর জামিলার সখ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে তাতার মালিকের। তাঘিকে সে চিনতে পারেনি।

পুত্র সন্তানের জন্ম দিল রাজিয়া। নাম রাখা হ'ল মামুদ। সুলতান বা রাজপুত রাজাদের পুত্র জন্মগ্রহণের বার্তা সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিকে যেমন ছড়িয়ে যায় তেমন কিছু

হ'ল না। কোন আনন্দোৎসবও নয়। হারেমে অনাড়ম্বরে একটি নবজাতক পৃথিবীর আলো প্রথম দেখল. দেখল তার মায়ের মুখ। এই টুকুই। কারণ দেশের যা পরিস্থিতি তাতে সুলতানের এদিকে মনোনিবেশ করার উপায় নেই। তাছাড়া এ তো তাঁর প্রথম জীবনের খানদান বংশের বেগমের গর্ভজাত নয়। এর মায়ের বসবাস হারেমে হলেও আসল বেগমদের মত অতটা উঁচুতে উঠতে পারে না। তবে পুত্রসন্তান অবশ্যই সুলতানের। সেই বিচারে নবজাতকের একটা অধিকার নিশ্চয় রয়েছে। সুলতান পুত্রকে দেখতে এসেছিলেন মাত্র একবার । দেখে হিসাব কষে নিলেন, তাঁর আয়ু যদি খুব দীর্ঘ হয় তাহলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় এর বয়স হবে খুব বেশী হলে পনেরো ষোলো বৎসর। শরীরের যা অবস্থা তার চেয়ে বেশী তাঁর পরমায়ু রয়েছে বলে মনে হয় না। তবে পৃথিবীতে সব কিছুই ঘটে। নব্বই বছরও বাঁচতে পারেন তিনি।

সুলতান পুত্রকে দেখে রাজিযার মুখের দিকে একবার চেয়েছিলেন। সেই মুখে গর্বের হাসি। সুলতানের সেই হাসিকে নিষ্প্রভ করে দেওয়ার ইচ্ছা হ'ল না। তিনি অব্যক্ত ভাষায় এবং মুখের হাসিতে তাকে উৎসাহিত করে কক্ষ ত্যাগ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনে এই প্রথম অনুভব করলেন যে তাঁর শেষ আশ্রয়ের জন্য একটি সমাধিস্থল নির্মাণ করতে হবে। আর দেরী নয়। একদিন গিয়ে দেখে এসেছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন এবং তাঁর প্রিয় বেগম মাখদুমা-ই-জাহাঁ পাশাপাশি কেমন শান্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। তাঁরও অমন একটি শান্তির আশ্রয় প্রয়োজন। বেগমপুরী মসজিদের আজান হয়ত শুনতে পাওয়া যাবে না সেখান থেকে, তবু বৎসরান্তে সবেবরাতের রাতে কেউ না কেউ কি শামা জ্বালিয়ে রেখে আসবে না?

তাঁর আদেশে সমাধিস্থল নির্মাণ শুরু হয়ে গেল। এ সমাধিস্থল বড় না হলেও ওপরে একটি সুন্দর গম্বুজ থাকবে। তার রঙ হবে রক্তরাঙা। লাল গম্বুজ । সুলতান মাঝে মাঝে গিয়ে সমাধিস্থলের অগ্রগতিকে দেখে আসেন। মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। এতদিন পরে তিনি নিশ্চিন্ত হন। কে না গড়েছে তার নিজের সমাধিস্থল? এমনকি কয়েকমাসের সুলতান খুসরব খাঁ বাদ যায়নি। খুসরবের এই একটি বিষয়ে দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে। লালগম্বুজ শেষ হতে না হতে গুজরাট থেকে বিপদ সঙ্কেত আসে। তাঘি ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সুলতানের সৈন্যসামন্ত আর পেরে উঠছে না।

মহম্মদ বিন তুঘলক দাঁতে দাঁত চেপে ওপর দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বলে ওঠেন— আমাকে একবার আগের শক্তি ফিরিয়ে দাও।

শরীর আগের চেয়ে সুস্থ হলেও তিনি একটি জিনিষ হারিয়ে ফেলেছেন। কোনো কর্মের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তাঁর আগের চেয়ে অনেক শ্লথ। আগে নিমেষের মধ্যে যেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, এখন পারেন না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে অযথা অনেক সময়ের অপচয় হয়। তিনি জানেন এটা খুব খারাপ। তবু উপায় নেই।

অথচ তাঁকে যেতে হবে। নিজেই যাবেন। তাঘির শেষ দেখতে হবে। সঙ্গে নেবেন পুত্র ফিরোজকে। সে সাবালক হয়েছে অথচ দেশের সীমান্ত অঞ্চল দেখেনি। একবার দেখে আসুক। এবারে সবাইকে সঙ্গে নেবেন। দিল্লীতে থাকবে শুধু বড় একদল সৈন্য এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকবে উজির আহমেদ বিন আইয়াজ। লোকটাকে তিনি ফেলতে পারেন না। অপরাধ সে করেছে। অপরাধ করেছে জীবনের প্রথম দিকে। কিন্তু একমাত্র তাকেই চোখ বুঁজে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা মূলত সৎ। তবু সাময়িক কোন অনিবার্য কারণে এবং প্রলোভনে তার পদস্খলন হয়েছিল। তাঁর নিজেরও কি হয়নি? যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয় পৃথিবীতে তিনি সব চাইতে কাদের বিশ্বাস করেন, তিনজনের কথা মনে হবে তাঁর। মালিক কাসেম, রাজিয়া এবং মালিক আহমেদ বিন আইয়াজ। ফিরোজ স্থান পেলেও তাদের আগে কখনই নয়।

যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে ভগিনী খুদাবন্দজাদা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। সুলতান একটু বিস্মিত হন। কারণ খুদাবন্দজাদা বহুদিন থেকে তাঁকে এড়িয়ে চলে। তার ধারণা, তার স্বামী এবং পুত্র তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদ পায়নি। নিজের ধারণা দিয়ে সে নিজে থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। কে যে কতবড় এলেমদার এতদিন দেখে দেখে তাঁর জানা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মানুষ চিনতে তাঁর বেশী সময় লাগে না।

ভ্রাতাকে নিভৃতে পেয়ে খোদাবন্দজাদা নিকটে এসে বলে— বেশ সুন্দর হয়েছে কিন্তু দেখতে।

— কে?

— তোমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। মামুদ।

— দেখে এলে নাকি?

— হ্যাঁ, মোহর দিয়ে দেখে এলাম।

—হঠাৎ? এত ঘটা কেন?

— সুলতানের পুত্র বলে কথা। মসনদের দাবীদার তো বটে।

— ওসব কথা বলে না। ওতে মহলে অশান্তির সৃষ্টি হয়। মানুষের মন বড় নোংরা।

— এতদিন পরে তাহলে জ্ঞানটা হয়েছে সুলতানের।

মহম্মদ বিন তুঘলক বুঝতে পারেন, তাঁর ভগিনী ভ্রাতার প্রতি অন্তরের টানে দেখা করতে আসেননি। সেই টান অবশ্য প্রত্যাশাও করেন না তিনি। স্বামীকে উজির করাতে অতীতে অনেক জল ঘোলা করেছে সে। না পেরে ক্ষিপ্ত হয়েছে। শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দিয়েছিল। সবাইকে বলে বেড়াত তার কাছে তার ভ্রাতা মৃত। এতদিন পরে আবার এসেছে। ভ্রাতৃপ্রেমে আকুল হয়ে কখনোই নয়। সুলতান মনস্থির করে নেন নিজের থেকে একটা কথাও বলবেন না।

— শুনলাম গুজরাট যাচ্ছ।

—হ্যাঁ।

— তোমার ওই পাহাড়ী বেগম বলল, তোমার শরীর ভাল নেই বিশেষ। তাকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হ'ল।

— বোধহয় আমার জন্যে ভাবে।

— ভাববেই তো। নিজের স্বার্থের জন্য ভাবতে হয়। তার ভাগ্য যে তোমার পরমায়ুর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো।

—হ্যাঁ। তবে ওই যে বললে পাহাড়ী বেগম। ওদের স্বভাবে স্বার্থচিন্তা আগে ঠাঁই পায় না।

খোদাবন্দজাদা খিঁকখিঁক করে হেসে ওঠে বিশ্রী ভাবে। শৈশবে ওর হাসি কত মিষ্টি শোনাত। ওর ওই হাসি শোনার জন্য কত সময় মজার কথা বলতেন তিনি।

হাসি থামিয়ে খোদাবন্দজাদা বলে— বিশ্বাস করতে বলছ?

— সেটা তোমার অভিরুচি। যাহোক, এত ভণিতার প্রয়োজন নেই। বলতো কি জন্যে এসেছ এতদিন পরে?

— দাওয়ার মালিক নামে আমার একমাত্র পুত্র রয়েছে, তার কথা কি তোমার স্মরণে আছে?

—তাকে ভুলে যাওয়ার সাধ্য কোথায়? সেই পাত্রই সে নয়। আমাকে জব্দ করার জন্য দক্ষিণে হিন্দুদের বিজয়নগর রাজ্য স্থাপনে যথেষ্ট মদত দিয়েছে।

— চিরকাল লোকের কথায় বিশ্বাস করে, আর নিজের খেয়ালে চলে ফল কি হ'ল?

— তুঘলক বংশ পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। একটা ইতিহাস সৃষ্টি হ'ল।

খুদাবন্দজাদার মুখ লাল হয়ে ওঠে ক্রোধে। তবু সে সামলাতে চেষ্টা করে। তার সম্মুখের ব্যক্তিটি তার সহোদর ভ্রাতা হলেও হিন্দুস্থানের সুলতান। এই সুলতান অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী হলেও সাংঘাতিক খেয়ালী। নিজের ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে যদি সুলতানের ক্রোধ উৎপাদন করে বসে তাহলে তার স্বামী এবং পুত্র উভয়ের জীবন অবধি বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

খুদাবন্দজাদা নম্রস্বরে বলে— আমার মাথা সব সময় কেমন যেন হয়ে থাকে। কিছু মনে করো না। আমি বলতে এসেছি দাওয়ারকে এদিকে কোথাও নিয়ে এস। আমার ইচ্ছা সে তোমার কাছাকাছি থাকুক।

সুলতান ভাবেন, নিজের পুত্রেরাও বিশ্বাসযোগ্য হয়না। তাহলে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের ওভাবে মৃত্যু হত না। ভগিনীর পুত্রেরা চিরকাল অনেক বেশী মারাত্মক হয়। তবু সোজাসুজি অস্বীকার করেন না তিনি। বলেন—এখন এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ নেই। ক'দিন গুজরাটে যাচ্ছি। ফিরে এলে আমাকে মনে করিয়ে দিও।

তাঘিকে দমন করতে হলে মহারাষ্ট্রের কথা মাথায় রাখতে হয়। কারণ তাঘির কৌশল হ'ল. পরাজিত হলে কিংবা বেকায়দায় পড়লে মহারাষ্ট্রের মণ্ডলপত্রি রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুলতান সেই রাজ্যের রাজার সঙ্গে সর্বপ্রথম যোগাযোগ করেন। এখানে পুত্র ফিরোজ ছাড়াও সুলতানের সঙ্গে অধিকাংশ সেনাধ্যক্ষ রয়েছে। তারা একদিন মণ্ডলপত্রির রাজাকে অনুরোধ করে তিনি যেন একবার সুলতানের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাজা অনুরোধ রক্ষা করেন এবং সুলতানকে কথা দেন যে ভবিষ্যতে তাঘি কিংবা তার দলের কোন লোক তাঁর রাজ্যে আশ্রয় পাবে না। যদি তারা দুর্বিনীত হয় তাহলে তাদের মরতে হবে। সুলতান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন রাজার কথায় এবং ব্যবহারে।

সুলতান সৈন্যদের একটু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য পাটানে ছাউনি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দৌলতাবাদ থেকে দুঃসংবাদ এসে পৌছোয়। সেখানে হাসান কাংকু নামে একজন ইমাদ-উল-মুল্‌ককে হত্যা করে তার অনুগতদের সাহায্যে নিজেই সুলতান হয়ে বসেছে। সুলতানের কর্মচারী যারা ছিল, যেমন কেরামউদ্দিন এবং মালিক জৌহর সবাই ভয়ে দৌলতাবাদ ছেড়ে পালিয়েছে। শুনে সুলতান অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি দিল্লীতে দ্রুত বার্তা পাঠান আহমেদ আইয়াজের নিকট। সে যেন মালিক গজনবী, আমীর কুবতাঘ এবং আমীর মাহানকে নিয়ে অবিলম্বে পাটান অভিমুখে রওনা হয়। তারা এখানে এলে দৌলতাবাদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আইয়াজ দিল্লী থেকে গজনবীদের নিয়ে পাটানে এসে পৌছোয়। সুলতান তাদের নিয়ে দরবারে বসেন। আইয়াজ এখানে এসে সুলতানের স্বাস্থ্য দেখে চমকে ওঠে। এত অবনতি হয়েছে স্বাস্থ্যের? কি করে তিনি অশ্ব চালনা করছেন বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁকে বারবার সিন্ধুর তাত্তায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। এভাবে চললে বেশীদিন বাঁচবেন না কখনো। সুলতানকে একথা না বলে তাঁর পুত্র ফিরোজকে সে বলে। ফিরোজকে সে পুত্রের মত স্নেহ করে।

ফিরোজ বলে— আমি অনেকবার বলেছি বিশ্রাম নিতে। না শুনলে কি করব?

-- তবু যদি কেউ পারে সে শুধু তুমি।

বিরক্ত ফিরোজ বলে— বললাম তো, অনেক চেষ্টা করেছি। বলেছি উনি এক জায়গায় থেকে বিশ্রাম নিন, আমরা ওঁর নির্দেশ মত সব কাজ করে দেব। তোয়াক্কা করেন না আমাদের কথা।

আইয়াজ লক্ষ্য করে ফিরোজ পিতার প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নয়। বরং একটা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছে। এটা ভাল লক্ষণ নয়।

তবু আইয়াজ বলে— একমাত্র তুমিই পার। আর একবার বলে দেখ। ওঁকে বাঁচাতে

এটুকু করলে বোধহয় ভাল হবে।

ফিরোজ ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—বরং আপনি চেষ্টা করে দেখুন। উনি আর কোনদিনই কিছু করতে পারবেন না।

ফিরোজের মন্তব্য আইয়াজের ভাল লাগে না। তার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরও প্রিয় পুত্র ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ফিরোজও কি একই পথে চলতে চায়? আপাত দৃষ্টিতে তেমন মনে হয় না। মহম্মদ বিন তুঘলককে দেখে কি কখনো তেমন মনে হয়েছে? তবে তাঁর একজন মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজ ছিল। আইয়াজের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ভাবে আর একবার যদি জীবনকে গোড়া থেকে শুরু করা যেত তাহলে পরিচ্ছন্নভাবে শেষ করতে পারত। কেন যেন তার মনে হয় তার নিজের জীবনের শেষটাও ভয়াবহভাবে শেষ হবে।

দরবারে সুলতান একটা কিছু বলতে শুরু করলে ফিরোজ চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বলে-- আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই আগে।

সুলতান বাধা পেয়ে বিরক্ত হন। তবু বলেন-- বল।

— আপনি যুদ্ধ বিষয়ে যে নির্দেশ দেবেন আমরা মাথা পেতে নেব। তবে একটা বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে চাই।

— কোন বিষয়ে?

— আপনাকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। আপনি নিজে যে সব কাজ করতেন সেগুলো আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।

সুলতান কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরে বসে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলেন— না, তা হয় না।

— কেন হয় না?

ফিরোজের এই ধরণের প্রশ্নে উপস্থিত আমীর ওমরাহ সবাই চমকে ওঠে। সুলতানের বয়স বেড়েছে বটে, স্বাস্থ্যও মোটে সুবিধার নয়, তবু তিনি সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক। তাঁর কথার ওপর কথা বলার দুঃসাহস এ পর্যন্ত কারও হয়নি। যদি তিনি মনে করেন, তাঁর সম্মানে আঘাত লেগেছে, তাহলে ফিরোজ নিজ পুত্র বলে তাকে রেয়াত করবেন না।

পুত্রের উদ্ধত প্রশ্নে মুহূর্তের জন্য তাঁর মস্তিষ্কে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হলেও ছড়িয়ে পড়তে পারল না। পুত্রের দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। ভাবেন ফিরোজ অন্তত তাঁকে হত্যা করার কোন চক্রান্ত করছে বলে মনে হচ্ছে না এখনো। ফিরোজ তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলছে।

সুলতান শান্ত কণ্ঠে তাকে বলেন— তোমার কথায় অবশ্যই যুক্তি রয়েছে। কিন্তু আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি ওই বোদপাকে স্বহস্তে দমন করব। নইলে তোমরা

যখন সবাই রয়েছ বিশ্রাম নিতে আমার কোন বাধা ছিল না।

এরপরে সুলতান সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এদিকে তাঘি ওদিকে কাংকু। এই দুই সমস্যা এখন তাঁদের সামনে। কাংকুর বিরুদ্ধে কাকে পাঠানো হবে এবং সে কত সৈন্য নেবে সব ঠিক হয়।

সবাই বুঝতে পারে সুলতানের মধ্যে একটা পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে এবং গুরুত্ব দিতে আগে কখনো দেখা যেত না।

দরবার শেষে আইয়াজ বিদায় নেওয়ার পূর্বে সুলতানের কাছে গিয়ে বলে—একটি পত্র রয়েছে।

— আমার ?

— হ্যাঁ।

— কে দিয়েছে?

— মামুদের গর্ভধারিনী।

সুলতান রীতিমত বিস্মিত হন। মালিক কাসেম করাচিলের সুন্দীরদের এদেশী কথা বলতে শিখিয়েছিল বটে, কিন্তু সে কি তাদের লিখতে পড়তেও শিখিয়েছিল? মনে নেই তাঁর।

পত্রটি সাগ্রহে হাতে নিয়ে আইয়াজকে বিদায় দিয়ে মালেক কাসেমকে ডেকে পাঠান তিনি। ইতিমধ্যে পত্রটি পড়তে থাকেন। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে ঝরঝরে লেখা। মুগ্ধ হন। আরও মুগ্ধ হন রাজিয়ার অকৃত্রিম মনের প্রকাশ দেখে। তার পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে তাঁর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা আর উৎকণ্ঠা। অল্প বয়সের উন্মাদনা পত্রে নেই, থাকার কথাও নয়। কারণ রাজিয়ারও বয়স হয়েছে। কিন্তু তবু সুলতানের জন্য তার কত দুশ্চিন্তা । বারবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। নিজের পুত্রের কথা একটি মাত্র ছত্রে শেষ করেছে। পুত্রও এখানে গৌণ। এক স্বর্গীয় স্পর্শে সুলতানের মন ভরে ওঠে। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন ক্ষণিকের জন্য।

সেই সময় মালিক কাসেম প্রবেশ করে। অন্যমনা সুলতানকে ডাকতে তার ইচ্ছা হয় না। সে জানে ওই টুকুই তাঁর মানসিক বিশ্রাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাকে ডাকতেই হয়।

— খোদাবন্দ্।

সুলতান যেন জেগে ওঠেন। — ও কাসেম? কিছু দরকার আছে?

— না খোদাবন্দ, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

— ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা কাসেম তোমার বেগমেরা লেখাপড়া জানে?

— জানে সুলতান।

— সাদির পরে শিখিয়েছ?

না খোদাবন্দ, আগেই শিখিয়েছি। চারজনে একসঙ্গে শিখতেন।

তোমার তুলনা নেই কাসেম। তুমি বোধহয় আমার কাছে উপযুক্ত মর্যাদা পেলে না।

—ও কথা বলবেন না মেহেরবান। আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। মানুষে যা আশা করে তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি।

— রাজিয়া পত্র দিয়েছে।

কাসেমের মুখ ঝলমল করে ওঠে।

পত্রটি এগিয়ে ধরে সুলতান বলেন— পড়।

— না সুলতান। আপনার ব্যক্তিগত চিঠি। না, আমি জানি উনি কি লিখতে পারেন।

— কি করে জানলে?

— ওঁদের চারজনের মনই একরকম।

কৌতুক করে সুলতান প্রশ্ন করেন— কি লিখেছে বলতো?

— উনি আপনার শরীরের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, তবু আপনাকে ফিরে যেতে বলেন নি। উনি জানেন ওঁর অধিকারের সীমা কতটুকু।

— ঠিক বলেছ কাসেম। তুমি ওদের মন চেনো। আমি বুঝতে পারি তোমার ভালবাসাও অনেক গভীর। তোমার বাকী জীবন যেন সুখের হয়।

কয়েকদিন পরে দিল্লী থেকে খবর আসে সুলতানের মুষ্ঠিমেয় অকৃত্রিম কয়েকজন দোস্তের অন্যতম উজির, মালিক কবীরের মৃত্যু হয়েছে। উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সুলতানের অতি ঘনিষ্ঠ হয়েও কখনো নিজেকে জাহির করেন নি। চিরকাল অন্তরালে থেকে কাজ করে গিয়েছেন। যাদের ওপর সুলতান একান্তভাবে বিশ্বাস করতে পারতেন উনি তাঁদের মধ্যে প্রধানতম। অথচ অতি বিশ্বস্তের ফর্দ তৈরী করতে গেলে ওঁর নাম সেই তালিকায় থাকে না। ভুলে যান। সুলতানের সঙ্গে এতই একাত্ম ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সুলতান ভালরকম আঘাত পান এবং বোঝা গেল তিনি রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বুঝলেন, দিল্লী এখন কাণ্ডারীহীন অবস্থায় রয়েছে। তাই উজির আহমেদ বিন আইয়াজ আর মালিক মকবুলকে আবার দিল্লীতে ফেরৎ পাঠালেন।

নানান দিক থেকে দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে সুলতান তাঁর বিজ্ঞ সহচর ইতিহাসবেত্তা বারাণীকে প্রশ্ন করেন— এখন উপায় কি বারাণী। কি করতে বল আমাকে?

বারাণী সঙ্গে সঙ্গে বলে— পুত্র ফিরোজের হাতে সব সিছু সমর্পণ করে মসনদ ত্যাগ করুন। সব বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে যান।

পরামর্শ সঠিক হলেও বাস্তব জগতে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের পক্ষে তো নয়-ই।

মহরম এসে যায়। সেই সঙ্গে অসময়ে বৃষ্টি হতে শুরু করে অবিরল ধারায়। মহরম মাসে সুলতান রোজা পালন করেন। অসুস্থ শরীরে রোজা পালন খুব কষ্ট সাধ্য হয়ে ওঠে। তবু তিনি রোজা ভাঙলেন না। সেই অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যে তাঘিকে ধাওয়া করতে থাকেন। একবার তাঘি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছিল। তিনি আর একটু ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যেতে পারলে তাকে ধরে ফেলাতেন। কিন্তু তাঁর শ্লথগতির জন্য সৈন্যদলও দ্রুত গতিতে যেতে পারল না। তাঘি মুঠো থেকে ফস্‌কে গেল। তাঁর এই অবুঝ জিদ দেখে ফিরোজ অসন্তুষ্ট হয়ে পাটানে চলে গেল। পিতার সংস্পর্শ তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে আজকাল। স্বাস্থ্যের যত অবনতি হচ্ছে ততই বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে।

উনি আজকাল অনেক সময় যেন ঘোরের মধ্যে থাকেন। জাগ্রত অবস্থাতেও স্বপ্ন দেখে চলেন। অতীতের বহু স্মৃতি ছবির মত তাঁর সামনে ভেসে ভেসে ওঠে। তাঁর পার্শ্বচরেরা অনেক সময় তাঁকে আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে দেখে। হাসতে দেখে। ক্রুদ্ধ হতেও দেখে। তিনি যদি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন, তাহলে পুত্র ফিরোজকে রাগ করে তাঁকে ছেড়ে যেতে দেখে ব্যথিত হতেন। ফিরোজ বিদায় নিতে এলেও কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। বরং হাসতে থাকেন।

ফিরোজ অবাক হয়ে ভাবে, সুলতান বোধহয় বুঝতে পারেননি যে সে চলে যাচ্ছে। সে একটু জোর দিয়ে আবার বলে— আপনার সঙ্গে আমি থাকতে চাই না। তাই পাটানে চলে যাচ্ছি।

— তাই নাকি? বেশ তো, খুব ভাল কথা। ওদিকে তাঘি গেলে তাড়িয়ে দিও।

ফিরোজ রেগে পিতার শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। সে যদি সুলতানকে সুলতান না ভেবে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে দেখত তাহলে সহজে বুঝতে পারত তার পিতা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সুলতানরা সাধারণ নন বলে তাঁদের দিকে সাধারণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে না কেউ। মহম্মদ বিন তুঘলক তো এমনিতেই অসাধারণ। তাঁর মুখের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে কেউ কোনদিন সহজভাবে কথা বলতে সাহসী হয়েছে কিনা সন্দেহ। সবাই তো আর রাজিয়া নয় যে সুলতানকে মানুষ ভাববে। রাজিয়া তাকে মানুষ বলে ভাবে বলেই তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছে।

সুলতানের অবস্থার ক্রমাবনতি হলেও তাঘির পিছু ছাড়েন নি। ওদিকে বৃষ্টিও অবিকল ধারায় হয়ে চলেছে মাঝে মধ্যে। এদিকে এত বৃষ্টি অতি বৃদ্ধেরাও জীবনে দেখেনি।

এরই মধ্যে রোজা চালিয়ে যাচ্ছেন সুলতান। তাঁকে অনেক অনুরোধ করা হয়েছে রোজা ভাঙতে। তিনি অনড়।

মহরমের দশম দিনে সুলতান বললেন— আমার জন্যে মাছ আন। আমি মাছ খেয়ে রোজা খুলব।

সুলতানের এই অবস্থা দেখে মালিক কাসেম সর্বদা তাঁর পাশে থাকে। সে সুলতানের আদেশ শুনে মৎস সংগ্রহের জন্য চারদিকে লোক পাঠায়। মাছ এনে কাসেম নিজে দাঁড়িয়ে সেই মাছের কালিয়া তৈরী করিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সুলতানের সামনে এনে রাখে।

সুলতানের মুখে হাসি ফোটে মাছ দেখে। কাসেম ভীত হয়ে লক্ষ্য করে সেই হাসি একেবারে শিশুর হাসি। তার মধ্যে কোনরকম মালিন্যের ছিটে ফোঁটা নেই।

— আপনার ভাল লেগেছে মেহেরবান?

— খুব ভাল লেগেছে। আবার কালকে দেবে?

সুলতান খুব কমই খেয়েছেন। তবু কাসেম বলে -- হ্যাঁ খোদাবন্দ্ নিশ্চয় কালকে খাবেন। এবারে একটু বিশ্রাম করুন।

মালিক কাসেম ভাবে, সুলতানের পক্ষে আর অশ্বারোহণ সম্ভব হবে না। কারণ তাঁর মস্তিষ্কও সুস্থ নয়। সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে তাত্তাহ্ নগরে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করে। সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ফিরোজকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

সুলতান আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তিনি দেখেন একটি টিলার পাশে অনেক রঙ-বেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট একটি মেয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলে— আমাকে একটা প্রজাপতি ধরে দাও না।

সুলতান তাকে চিনতে পারেন। আনন্দে তাঁর হৃদয় নেচে ওঠে। তিনি বলেন--- লায়লা! কোথায় ছিলে এতদিন। আমি তোমাকে কত খুঁজেছি।

— আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমায় দেখতাম। তোমার আমার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল?

— হ্যাঁ লায়লা।

— দাও না একটা প্রজাপতি ধরে।

— ধরতে নেই। ওদের খুব কষ্ট হয়।

— তাহলে আমি চলে যাব।

— না, না যেও না। আমি ধরে দিচ্ছি।

সুলতান ছুটে গিয়ে একটা প্রজাপতি ধরে ফেলেন। লায়লা তাই দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। ধরা পড়ে গিয়ে প্রজাপতি খুব ছটফট করতে থাকে। এমন করে কেউ তাকে বন্দী করেনি, কষ্ট দেয়নি।

সুলতানের কেমন রাগ হয়। বলে ওঠেন— এই চুপ কর। লায়লা তোকে চাইছে।

প্রজাপতি তবু ছটফট করে। সুলতান বলে ওঠেন— তবে রে।

তিনি সহসা তাকে দুই করতলের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলেন।

লায়লার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়। সে বলে ওঠে— তুমি এত নরম, আবার এত

নিষ্ঠুর!

সুলতান চমকে ওঠেন। মালিক কাসেম দেখে তিনি চোখ মেলেছেন। তাঁর চক্ষু দ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ। তিনি কাসেমকে দেখে চিনতে পারেন না। আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলে ওঠেন। তারপর আবার চোখ বন্ধ করেন।

উপসংহার

মহরম শেষ হওয়ার সাত দিন পরে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হয়। তাঁর শবদেহ প্রেরণ করা হয় দিল্লীতে। গুজরাট আর সিন্ধুপ্রদেশ থেকে অনেক দিন কোন সংবাদ না পেয়ে উজির আহমেদ বিন আইয়াজ এবং অন্যান্য ওমরাহেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

সেই সময় তুন্, নামে আইয়াজেরই এক ক্রীতদাস, যাকে পাটানে সুলতানের ছাউনিতে রেখে আসা হয়েছিল, সে সেই ছাউনি থেকে দিল্লীতে পালিয়ে এল। এসে সে বলল সুলতানের মৃত্যু হয়েছে। সে আরও খবর দিল সুলতানের সৈন্যরা মোঙ্গলীয় শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে পর্যুদস্ত। অনেক বড় বড় সেনাধ্যক্ষ নিহত।

আইয়াজ পাগলের মত প্রশ্ন করে— সুলতানজাদী কোথায়। ফিরোজ?

তুন্ বলে— বলতে পারি না। খুব সম্ভব তিনিও বেঁচে নেই।

ক্রীতদাসের মুখে এই সংবাদ শুনে উজির মালেক আহমেদ বিন আইয়াজ যারপরনাই বিচলিত হয়ে পড়ে। সে উপস্থিত অন্যান্য ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে মসনদ শূন্য রাখা চলবে না। মহম্মদ বিন তুঘলকের ভাই কিংবা তাদের পুত্র বা ভগিনীর পুত্র রয়েছে। যে কেউ এসে মসনদে বসার জন্য আক্রমণ চালাতে পারে। ফিরোজ বেঁচে থাকলে এতদিনে একটা খবর পাঠাত। তাই সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র চার বছরের শিশু মামুদকে সুলতান বলে ঘোষণা করল। উপাধি হ'ল সুলতান গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ্।

সংবাদটা খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফিরোজ সেই সময় দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে। খবরটা তার কানেও পৌঁছোল। মাথায় তার আগুন জ্বলল। যে ব্যক্তিকে বরাবর সে শ্রদ্ধা করত, তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়। বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। সে পিতার শবদেহ আগেই দিল্লীতে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিল। যদিও সেই শবদেহ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সেটি পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে শৃগাল কুকুর শকুনির ভক্ষ্য বস্তু 'লেও তার কিছুমাত্র এসে যেত না। কারণ পিতার প্রতি শেষের দিকে তার এতটুকু শ্রদ্ধা বা মমত্ববোধ ছিল না। তাকেও উস্‌কানি দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। এক

এক সময় মনেও হয়েছে সুলতানকে শেষ করে দিতে। কিন্তু যে মানুষটা আর বেশীদিন নেই, তার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ কি ? তাই বিরত থেকেছে।

ওদিকে আইয়াজ জানতে পারে তুন্-এর খবর একেবারে ভুল। ফিরোজ জীবিত রয়েছে এবং সে ঝড়ের গতিতে দিল্লী অভিমুখে এগিয়ে আসছে। তার বুক কেঁপে ওঠে। বহুদিন পরে নিজেকে বড অসহায় বোধ হয়। সে মারাত্মক ভুল করে বসে আছে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে এই ভুল উদ্দেশ্যবিহীন। এই দায়িত্ব অন্য কোন আমীর নিতে চাইবে না। কারণ একমাত্র সে-ই উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। বরাবর সে ফিরোজকে পুত্রবৎ দেখে এসেছেন। ফিরোজেরও একথা অজানা নয়। কিন্তু এখন নিশ্চয় তার পরামর্শদাতার অন্ত নেই। তারা তো মানবে না। মামুদকে মসনদ থেকে সরিয়ে ফিরোজের জন্য অপেক্ষা করলেও তারা বিশ্বাস করবে না।

আইয়াজ সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লীতে পৌছোনোর আগেই সে পথিমধ্যে ফিরোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা কববে। সে বুঝিয়ে বলবে, কোন্ পরিস্থিতিতে সে ওই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। ফিরোজ নিশ্চয বুঝবে। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে কোনদিন অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাযনি।

এদিকে ফিরোজ এসে পৌছনোর আগে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃতদেহ এসে পৌছে গেল দিল্লীতে। আশা করা গিয়েছিল, তাঁর নিজের তৈরী সমাধিস্থল লাল গম্বুজে তাঁকে সমাহিত কবা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হ'ল না। ফিরোজের কড়া নির্দেশ ছিল মহম্মদ বিন তুঘলকের স্থান হবে তাঁর পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কবরের পাশে। তাই হ'ল।

দিল্লী নগরীতে প্রবেশের পূর্বেই পথিমধ্যে ফিরোজ শাহকে অভ্যর্থনা জানায় মালিকজাদা আহমেদ বিন আইয়াজ।

সে অভিবাদন জানিয়ে বলে— সুলতান, মসনদ আপনার অপেক্ষায় শূন্য রয়েছে।

— সেকি ! সুলতান মামুদ গিয়সউদ্দিন শাহ কোথায় গেল?

— যাতে কেউ কোনরকম ঝামেলার সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য সাময়িকভাবে একটা ব্যব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ফলে কেউ আর কিছু বলতে পারেনি। অন্য উপায় ছিল না। কারণ আমি একটি মারাত্মক ভ্রমাত্মক সংবাদ পেয়েছিলাম।

— আমাব মৃত্যু?

— হ্যাঁ সুলতান।

— ভবিষ্যতের সবাই জানবে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরে মামুদ দিল্লীর মসনদে বসেছিল।

— কেউ জানবে না।

— আপনি বললে তো হবে না। তাছাড়া সে ছেড়ে দেবে কেন?

— সে তো শিশু মাত্র। তার গর্ভধারিনী নিজে থেকেই তাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি চান না এই নিয়ে কোন রক্তপাত ঘটুক।

— বটে।

— আপনার প্রতি আমার স্নেহ চিরকালের। আপনি মসনদে বসলে আমার চেয়ে বেশি আনন্দিত কেউ হবে না।

— তবু কাজটা কি ভাল করেছিলেন? মহম্মদ বিন তুঘলকের পরে কে মসনদ বসেছিল? এক কথায় তার উত্তর হবে তাঁর কনিষ্ঠতম পুত্র মামুদ।

আইয়াজ নতুন সুলতানকে অনেকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে। তবু ঠিক বোঝাতে পারে না। তার অস্বস্তি বাড়ে।

সেই অস্বস্তির পরিসমাপ্তি ঘটে পরদিনই তার শিরঃচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

আবুল মুজাফফর ফিরোজ শাহ আস্-সুলতানী মসনদে পাকাপাকি ভাবে উপবিষ্ট হলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক নিশ্চেষ্ট পড়ে রইলেন পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এবং মাতা মখদুমা-ই-জাঁহার পাশে। এই তিনজনের সমাধি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রইল। শুধু একজন বোরখা পরহিতা রমনী সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিনের পর দিন হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে মহম্মদ বিন তুঘলকের সমাধিমূলে স্থাপন করে নীরবে বহুক্ষণ বসে থাকতেন। সেই রমনী শেষের দিকে নুব্জ হয়ে পড়েছিলেন। কোনরকমে তবু আসতেন এক পা এক পা করে। চিরাগ বাতি হাত দিয়ে আড়াল করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। শেষের দিকে। তারপর একদিন তাঁর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সমাধি ডুবে রইল অন্ধকারে।

ইতিহাসের গতি তবু রয়েছে অটুট।

— ঃ —